



HSC 2026 Bangla 2nd paper Final Suggestion

লিখিত প্রশ্ন

(১)

(ক) উদাহরণসহ বাংলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লেখো।

উত্তরঃ বাংলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম :

১. শব্দের আদ্য 'অ'-এর পরে ই/ঈ/উ/ঊ-কার থাকলে 'অ'-এর উচ্চারণ 'ও'-এর মতো হয়। যেমন- অভিধান (ওভিধান), অতীত (ওতিত), অভিমান (ওভিমান)।
২. শব্দের আদ্য 'অ'-এর পরে 'য' (্য)-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে 'অ'-এর উচ্চারণ 'ও'-এর মতো হয়। যেমন- অদ্য (ওদো), অন্য (ওনো), গদ্য (গোদো)।
৩. এ-কার যুক্ত একাক্ষর ধাতুর সঙ্গে আ-প্রত্যয় যুক্ত হলে 'এ-কার' উচ্চারণ এ্যা-এর মতো হয়। যেমন- ঠেলা (ঠ্যালা), বেলা (ব্যালা), মেলা (ম্যালা)।
৪. শব্দের আদ্য ব্যঞ্জনবর্ণে 'ম'-ফলা যুক্ত হলে সেই 'ম' উচ্চারিত হয় না। যেমন- স্মরণ (শরোন), স্মারক (শাঁরক), শ্মশান (শশান)।
৫. শব্দের আদিতে 'ব'-ফলা থাকলে 'ব'-ফলার কোনো উচ্চারণ হয় না। যেমন- স্বাগত (শাগতো), দ্বিতীয় (দিতিয়ো), স্বদেশ (শদেশ)।

অথবা

(খ) নিচের যেকোনো পাঁচটি শব্দের উচ্চারণ লেখো :

- উত্তরঃ
- শিক্ষা [শিক্ক্যা]
 - সম্মান [শ'ómman]
 - বিজ্ঞান [বিগ্গ্যান]
 - ভাষ্য [ভাশশ]
 - একত্র [একোত্র]

বাংলা শব্দের সঠিক উচ্চারণ লিখন বাংলা ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শব্দের উচ্চারণ লেখার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়:

- **অ-ধ্বনির উচ্চারণ:** শব্দের আদিতে 'অ' থাকলে তা সাধারণত বিবৃত (যেমন: অলস [অলস]) বা সংবৃত (যেমন: অতি [ওতি]) হতে পারে, যা শব্দের গঠন ও পরের স্বরধ্বনির উপর নির্ভরশীল। সংযুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্বে 'অ' থাকলে প্রায়শই সংবৃত হয়।
- **এ-ধ্বনির উচ্চারণ:** 'এ' ধ্বনি শব্দের আদিতে থাকলে তা সংবৃত (যেমন: এমন [এমন]) বা বিবৃত (যেমন: এক [এ্যাক]) হতে পারে। বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে এর উচ্চারণ ভিন্ন হতে পারে।
- **য-ফলার উচ্চারণ:** য-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ কখনো দ্বিত্ব হয়, কখনো 'এ' কারের মতো উচ্চারিত হয়, আবার কখনো এটি উহ্য থাকে। যেমন: 'গদ্য' [গদ্যো], 'ব্যথা' [ব্য্যাথা], 'গণ্য' [গন্নো]।

- **ব-ফলার উচ্চারণ:** শব্দের আদিতে ব-ফলা থাকলে তার উচ্চারণ উহ্য থাকে, যেমন: 'স্বাগত' [শাগোতো]। কিন্তু শব্দের মধ্যে বা শেষে থাকলে কখনো কখনো এটি দ্বিত্ব উচ্চারণ সৃষ্টি করে, যেমন: 'বিশ্বাস' [বিশ্বশাস]।
- **ম-ফলার উচ্চারণ:** ম-ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে অনুস্বার ধ্বনির মতো উচ্চারণ হতে পারে, যেমন: 'স্মরণ' [শঁরণ]।
- **শ্বাসাঘাত:** বাংলা উচ্চারণে শ্বাসাঘাত (stress) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাধারণত শব্দের আদিস্বর বা প্রথম সিলেবলে শ্বাসাঘাত পড়ে।

সঠিক উচ্চারণ বাংলা ভাষার শ্রুতিমাধুর্য রক্ষা করে এবং প্রমিত বাচনিক রূপ গঠনে সহায়তা করে।

বিদ্বান

উত্তরঃ বিদ্বান = বিদ্বান্

প্রধান

উত্তরঃ প্রধান = প্রোধান্

যুগ্ম

উত্তরঃ যুগ্ম = জুগ্মো

কর্ম

উত্তরঃ কর্ম = কর্মো

ধার্য

উত্তরঃ ধার্য = ধার্জো

পুণ্য

উত্তরঃ পুণ্য = পুণ্নো

বিশ্ব

উত্তরঃ বিশ্ব = বিশ্-শো

ঐচ্ছিক

উত্তরঃ ঐচ্ছিক = ওইচ্ছিক্

(১১)

(ক) ডেঙ্গু থেকে পরিত্রাণের উপায় সম্পর্কে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা করো।

উত্তরঃ ডেঙ্গু থেকে পরিত্রাণের উপায় সম্পর্কে দুই বন্ধু—সাকিব ও তামিমের মধ্যে একটি সংলাপ নিচে দেওয়া হলো:

সাকিব: শুভ সকাল তামিম! কেমন আছিস?

তামিম: শুভ সকাল। ভালো আছি, কিন্তু মনটা একটু খারাপ। আমাদের এলাকার বেশ কয়েকজন ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

সাকিব: হ্যাঁ, ইদানীং ডেঙ্গুর প্রকোপ খুব বেড়ে গেছে। এই রোগটি এডিস মশার কামড়ের মাধ্যমে ছড়ায়। আমাদের এখনই সচেতন হওয়া উচিত।

তামিম: একদম ঠিক বলেছিস। কিন্তু এই মরণব্যাদি ডেঙ্গু থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় কী?

সাকিব: ডেঙ্গু থেকে বাঁচার প্রধান উপায় হলো এডিস মশার বংশবৃদ্ধি রোধ করা। এই মশা সাধারণত পরিষ্কার ও স্থবির পানিতে ডিম পাড়ে। তাই আমাদের ঘরের ভেতরে ও আশেপাশে কোথাও যেন পানি জমে না থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

তামিম: ও আচ্ছা! ফুলের টব, ভাঙা প্লাস্টিকের বোতল, ডাবের খোসা কিংবা পরিত্যক্ত টায়ারে যে পানি জমে থাকে, সেগুলোর কথা বলছিস?

সাকিব: হ্যাঁ, ঠিক তাই। এই সমস্ত পাত্রে ৩ দিনের বেশি পানি জমে থাকতে দেওয়া যাবে না। বাড়ির ছাদ, এয়ার কন্ডিশনার কিংবা রেফ্রিজারেটরের নিচের জমানো পানি নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে।

তামিম: মশার কামড় থেকে বাঁচার জন্য আমাদের কী করা উচিত?

সাকিব: দিনের বেলা বা রাতে, ঘুমানোর সময় অবশ্যই মশারি ব্যবহার করতে হবে। কারণ এডিস মশা সাধারণত ভোরে এবং সন্ধ্যায় বেশি কামড়ায়। এছাড়া শরীর ভালোভাবে ঢেকে রাখে এমন পোশাক পরা এবং মশা তাড়ানোর ক্রিম বা লোশন ব্যবহার করা যেতে পারে।

তামিম: আর ঘরের ভেতরে মশার উপদ্রব কমানোর কোনো উপায় আছে কি?

সাকিব: জানলা-দরজায় নেট বা মশারির জাল ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া নিয়মিত মশক নিধনের স্প্রে বা কয়েল ব্যবহার করা জরুরি। তবে সবচেয়ে বড় কথা হলো, আমাদের চারপাশ সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

তামিম: আমাদের এলাকার মানুষদের সচেতন করার জন্য কি আমরা কোনো উদ্যোগ নিতে পারি?

সাকিব: অবশ্যই! আমরা বন্ধুরা মিলে একটি সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন করতে পারি। সবাইকে জমে থাকা পানি পরিষ্কার করার অনুরোধ করতে পারি এবং লিফলেট বিতরণ করতে পারি।

তামিম: খুব ভালো প্রস্তাব সাকিব। আগামীকাল থেকেই আমরা এই কাজ শুরু করব। তথ্যগুলো জানানোর জন্য তোকে অনেক ধন্যবাদ।

সাকিব: তোকেও ধন্যবাদ তামিম। সবাই সচেতন হলেই আমরা ডেঙ্গুমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে পারব। ভালো থাকিস।

অথবা

(খ) তোমার দেখা 'একটি শীতের সকাল' শিরোনামে একটি খুদেগল্প লেখো।

উত্তরঃ কুয়াশার ঘন চাদর মুড়ি দিয়ে গল্পটার শুরু। পৌষের সেই সকালে চারপাশ এতটাই ঝাপসা ছিল যে, সামনের আমগাছটাও দেখা যাচ্ছিল না। বিছানা ছেড়ে উঠতে মন চাইছিল না, কিন্তু মায়ের হাতের ভাপা পিঠার সুবাস আমাকে রান্নাঘরে টেনে নিয়ে গেল।

মাটির উনুন থেকে তখন গরম ধোঁয়া উড়ছে। চুলার পাশে বসে আগুন পোহাতে পোহাতে গরম পিঠায় প্রথম কামড় দেওয়া—সে এক স্বর্গীয় অনুভূতি। পিঠার মিষ্টি গুড় আর নারকেলের স্বাদ যেন মুহূর্তেই শরীরে উষ্ণতা এনে দিল।

একটু পরে রোদ উঠল। কুয়াশা ভেদ করে আসা সেই মিষ্টি রোদকে মনে হচ্ছিল সোনার গুঁড়ো। উঠোনের ঘাসের ডগায় জমে থাকা শিশিরবিন্দুগুলো রোদের আলোয় মুক্তোর মতো চকচক করে উঠল।

আমি চাদরটা গায়ে জড়িয়ে বাইরে বের হলাম। দেখলাম, মেঠো পথ বেয়ে গাছেরা মাটির কলসি কাঁধে নিয়ে টাটকা খেজুরের রস বিক্রি করতে যাচ্ছে। দূরে ধানক্ষেতের ওপর অলসভাবে ভাসছে হালকা কুয়াশার ভেলা। শীতের সেই শান্ত, স্নিগ্ধ সকালটি আমার হৃদয়ে এক গভীর প্রশান্তি বিলিয়ে দিল, যা আজও আমার স্মৃতিতে অমলিন।

(১০)

(ক) সারমর্ম লেখো :

নদী আর কালগতি একই সমান;

অস্থির প্রবাহে করে উভয়ে প্রয়াণ।

ধীরে ধীরে নীরব গমনে গত হয়;

কিবা ধনে, কিবা স্তবনে ক্ষণেক না রয়।

উভয়েই গত হলে আর নাহি ফিরে,

দুস্তর সাগর শেষে গ্রাসে উভয়েরে।

বিফলে বহে না নদী যথা নদী ভরা,
নানা শস্য শিরোরত্নে হাস্যময়ী ধরা।
কিন্তু কাল, সদাত্মা ক্ষেত্রে শোভাকর,
উপেক্ষায় রেখে যায় মরু ঘোরতর।

উত্তরঃ সারমর্ম : সময় ও নদী উভয়েই গতিশীল এবং একবার গেলে আর ফেরে না। তবে নদী তার গতিপথে রেখে যায় ফসলের সম্ভার-প্রাণের সজীবতা। কিন্তু সময় উপেক্ষিত হলে জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অথবা

(খ) ভাবসম্প্রসারণ করো :

ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমার চাঁদ যেন বলসানো রুটি।

উত্তরঃ ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়; পূর্ণিমা-চাঁদ যেন বলসানো রুটি।

ভাব-সম্প্রসারণ : ক্ষুধার্ত মানুষের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ক্ষুন্নিবৃত্তি। সব কিছুর মধ্যেই সে ক্ষুধা নিবৃত্তির কথা ভাবে। তখন কোনো কিছু সুন্দর কি অসুন্দর, তা তাকে ভাবায় না।

প্রত্যেক মানুষের বেঁচে থাকার জন্য কতগুলো মৌলিক চাহিদা রয়েছে। খাদ্য হলো এর মধ্যে প্রধান মৌলিক চাহিদা। খাদ্য ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। মানুষের শরীরে তৈরি হওয়া এই খাদ্যের চাহিদারই অপর নাম ক্ষুধা। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য মানুষ সব কিছু করতে পারে। মানুষ যে দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে, তার পেছনে এই ক্ষুন্নিবৃত্তিই মূল চালিকাশক্তি। ক্ষুধা নিবৃত্তি হওয়ার পরেই মানুষ অন্যান্য মৌলিক চাহিদার কথা ভাবে। বাসস্থানের কথা ভাবে, পোশাকের কথা ভাবে, স্বাস্থ্যের কথা ভাবে। সুন্দর-অসুন্দরের কথা ভাবে একেবারে শেষ পর্যায়। তাই ক্ষুধা যখন মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, তখন সৌন্দর্যের মূল্য তার কাছে থাকে না। একজন সুখী মানুষের কাছে পৃথিবীকে সুন্দর মনে হতে পারে। কিন্তু ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে তা নাও হতে পারে। অতীতে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। হাজার হাজার মানুষ না খেয়ে মারা যেত। সামান্য দুটো রুটির জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষকে সারাদিন পরিশ্রম করতে হতো। সেই দুর্ভিক্ষে একজন শ্রমজীবীর কাছে পূর্ণিমার চাঁদ বড়ো জোর একখানা বলসানো রুটির মতো মনে হবে, সেটাই স্বাভাবিক।

ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে পৃথিবীর সৌন্দর্য কোনো তাৎপর্য বহন করে না। ক্ষুধা নিবারণের জন্য তার সবচেয়ে আগে দরকার খাদ্য। গদ্যের কাঠিন্যটুকু সে ভালো উপলব্ধি করতে পারে; কাব্যের কোমলতা তার কাছে অর্থহীন।

(৯)

(ক) সম্প্রতি তোমার পড়া কোনো বই সম্পর্কে বন্ধুকে একটি বৈদ্যুতিন পত্র প্রেরণ করো।

উত্তরঃ প্রতি: abir.khan@email.com

Cc:

Bcc:

বিষয়: সম্প্রতি পড়া একটি চমৎকার বইয়ের অভিজ্ঞতা

প্রিয় আবিব,

আমার আন্তরিক ভালোবাসা নিস। আশা করি তুমি ভালো আছিস। অনেক দিন তোর সাথে সরাসরি যোগাযোগ হয়নি, তাই ভাবলাম আজ ইমেইলের মাধ্যমেই একটু আড্ডা দেওয়া যাক।

মূলত আজ তোকে একটি বিশেষ কারণে এই বৈদ্যুতিন পত্রটি লিখছি। সম্প্রতি আমি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' বইটি পড়ে শেষ করেছি। বইটি পড়ার পর থেকেই এর রেশ আমার মনে এমনভাবে লেগে আছে যে, ভাবলাম তোর সাথে অভিজ্ঞতাটা ভাগ করে নিই।

বইটি গ্রামীণ বাংলার এক অতি সাধারণ অথচ অপরূপ জীবনযাত্রার চিত্র তুলে ধরে। এর মূল চরিত্র অপু ও তার দিদি দুর্গার শৈশব, তাদের সহজ-সরল আনন্দ, চঞ্চলতা এবং দারিদ্র্যের সাথে পরিবারের লড়াইয়ের গল্প

আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। প্রকৃতির এত নিখুঁত এবং জীবন্ত বর্ণনা লেখক দিয়েছেন, যা পড়তে পড়তে মনে হয় আমি নিজেই সেই নিশ্চিন্দপুর গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বিশেষ করে অপু ও দুর্গার প্রথম রেলগাড়ি দেখার উদ্দীপনা কিংবা কাশবনের মধ্য দিয়ে ছুটে চলার দৃশ্যগুলো অসাধারণ। গ্রামীণ জীবনের সুখ-দুঃখ এবং মানুষের ভেতরের চিরন্তন আবেগগুলোকে যেভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তা সত্যিই অতুলনীয়।

তুই তো বই পড়তে ভালোবাসিস, তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই বইটি তোকেও দারুণভাবে মুগ্ধ করবে। সময় সুযোগ করে তুই অবশ্যই বইটি পড়ে ফেলিস।

আজ আর বাড়ালাম না। তোর বাড়ির সবাইকে আমার প্রণাম ও শ্রদ্ধা জানাস। তুই কেমন আছিস এবং তোর দিনকাল কেমন কাটছে, জানিয়ে দ্রুত উত্তর দিস। ভালো থাকিস।

তোর প্রিয় বন্ধু,

নিলয়

অথবা

(খ) ব্যাংক অফিসার পদে নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র লেখো।

উত্তরঃ তারিখ: ১২ জুন, ২০২৬

বরাবর,

ব্যবস্থাপনা পরিচালক / প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

[ব্যাংকের নাম, যেমন: জনতা ব্যাংক পিএলসি / এবিসি ব্যাংক লিমিটেড]

প্রধান কার্যালয়, [ব্যাংকের ঠিকানা, যেমন: মতিঝিল, ঢাকা]।

বিষয়: 'অফিসার' পদে নিয়োগের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, গত [বিজ্ঞপ্তির তারিখ, যেমন: ১০ জুন, ২০২৬] তারিখে দৈনিক [পত্রিকার নাম] পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, আপনার ব্যাংকে কিছু সংখ্যক 'অফিসার' নিয়োগ করা হবে। আমি উক্ত পদের একজন আগ্রহী প্রার্থী হিসেবে নিচে আমার প্রয়োজনীয় তথ্য ও জীবনবৃত্তান্ত পেশ করছি:

আবেদনকারীর জীবনবৃত্তান্ত:

১. নাম: [আপনার পূর্ণ নাম]
২. পিতার নাম: [পিতার নাম]
৩. মাতার নাম: [মাতার নাম]
৪. বর্তমান ঠিকানা: [বর্তমান ঠিকানা]
৫. স্থায়ী ঠিকানা: [স্থায়ী ঠিকানা]
৬. জন্ম তারিখ: [আপনার জন্ম তারিখ]
৭. জাতীয়তা: বাংলাদেশী
৮. ধর্ম: [আপনার ধর্ম]
৯. শিক্ষাগত যোগ্যতা:

পরীক্ষার নাম	পাসের সন	বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়	প্রাপ্ত জিপিএ/বিভাগ
এম.বি.এ / স্নাতকোত্তর	[বছর]	[বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম]	[জিপিএ/শ্রেণী]
বিবিএ / স্নাতক (সম্মান)	[বছর]	[বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম]	[জিপিএ/শ্রেণী]
এইচ.এস.সি	[বছর]	[বোর্ডের নাম]	[জিপিএ]
এস.এস.সি	[বছর]	[বোর্ডের নাম]	[জিপিএ]

১০. অতিরিক্ত যোগ্যতা (যদি থাকে): কম্পিউটার চালনা (MS Office, Internet Browsing) এবং ইংরেজিতে ভালো যোগাযোগের দক্ষতা।

অতএব, মহোদয়ের নিকট বিনীত প্রার্থনা এই যে, আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে আমাকে উক্ত পদের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দানে বাধিত করবেন।

বিনীত,

[আপনার স্বাক্ষর]

([আপনার নাম])

মোবাইল নম্বর: [আপনার ফোন নম্বর]

ইমেইল: [আপনার ইমেইল আইডি]

সংযুক্তিসমূহ:

১. সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের সত্যায়িত অনুলিপি।
২. নাগরিকত্ব ও চারিত্রিক সনদপত্র।
৩. সদ্য তোলা ৩ কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি।
৪. ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার (বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী প্রযোজ্য হলে)।

(৮)

(ক) ট্রেন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বিষয়ে একটি দিনলিপি রচনা করো।

উত্তরঃ ১২ জুন, ২০২৬

রাত ১০:১৫

রাজশাহী

প্রিয় ডায়েরি,

আজকের দিনটি আমার জীবনের অন্যতম সেরা এবং স্মরণীয় একটি দিন হয়ে থাকবে। আজ আমি প্রথমবারের মতো ঢাকা থেকে রাজশাহী পর্যন্ত ট্রেনে ভ্রমণ করলাম। ট্রেনের চাকার সেই চেনা 'ঝকঝক' শব্দ আর জানালার বাইরে ছুটে চলা সবুজ প্রকৃতির মায়া এখনো যেন আমার চোখে-মুখে লেগে আছে।

সকাল সাড়ে সাতটার দিকে আমরা কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছাই। স্টেশনের চিরচেনা ব্যস্ততা, কুলিদের আনাগোনা আর যাত্রীদের কোলাহলে চারপাশ মুখরিত ছিল। আমাদের ট্রেন 'সিক্সসিটি এক্সপ্রেস' ঠিক আটটায় প্ল্যাটফর্ম ছাড়ে। ট্রেনটি যখন ধীরে ধীরে গতি বাড়াতে শুরু করল, আমার মনের ভেতর এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ জেগে উঠল।

আমি জানালার পাশের সিটটি পেয়েছিলাম, যা আমার আনন্দকে দ্বিগুণ করে দেয়। শহর ছাড়িয়ে ট্রেন যখন গ্রামীণ জনপদের বুক চিরে ছুটে চলতে লাগল, তখন বাইরের দৃশ্যগুলো যেন জীবন্ত ছবির মতো মনে হচ্ছিল। দিগন্তজোড়া সবুজ ধানের ক্ষেত, ছোট ছোট নদী, আর পুকুরে গ্রামের শিশুদের গোসল করার দৃশ্য দেখে চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছিল। ট্রেনের হালকা দুলুনিতে এক ধরণের অদ্ভুত প্রশান্তি ছিল।

যাত্রাপথের আরেকটি চমৎকার দিক ছিল ট্রেনের ভেতরের পরিবেশ। হকারদের বিচিত্র সুরে ‘চা-গরম’, ‘ঝালমুড়ি’ কিংবা ‘বই-ম্যাগাজিন’ বিক্রির ডাক ট্রেনের পরিবেশকে বেশ প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। সহযাত্রীদের সাথে টুকটাক আলাপচারিতা আর গল্পে সময় কীভাবে কেটে গেল টেরই পাইনি। দুপুরের দিকে ট্রেন যখন বিখ্যাত যমুনা সেতু পার হচ্ছিল, সেই বিশাল জলরাশির ওপর দিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল এক কথায় রোমাঞ্চকর!

বিকেলের মৃদু আলোয় ট্রেন যখন রাজশাহী স্টেশনে এসে থামল, তখন মনের ভেতর এক ধরণের ভালো লাগা আর কিছুটা ক্লান্তি—দুটোই ভর করেছিল। তবে এই যাত্রার প্রতিটি মুহূর্ত আমার স্মৃতিতে অমলিন থাকবে। বাস বা অন্য যানবাহনের চেয়ে ট্রেন ভ্রমণ যে কতটা আরামদায়ক এবং উপভোগ্য, তা আজ নিজে না চড়লে হয়তো কখনোই বুঝতে পারতাম না।

আজ এখানেই শেষ করছি। শুভ রাত্রি।

অথবা

(খ) সড়ক দুর্ঘটনা বেড়ে যাওয়ার কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

উত্তরঃ লেখক তার নিজের কল্পনাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগিয়ে কোনো মননশীল ভাব কিংবা তথ্য বা তত্ত্ব উপযুক্ত ভাষার মাধ্যমে যুক্তি পরম্পরায় উপস্থাপনের মাধ্যমে যে নাতিদীর্ঘ সাহিত্য রচনা করেন তাকে প্রবন্ধ রচনা বলে। এর সাধারণত তিনটি অংশ থাকে। যথা:

০১। ভূমিকা: ভূমিকা হচ্ছে প্রবন্ধের প্রারম্ভিক অংশ যেখানে লেখার মূল বিষয়গত ভাবের প্রতিফলন ঘটে। ভূমিকা যত আকর্ষণীয় হবে রচনাটিও পাঠকের কাছে ততো হৃদয়গ্রাহী হবে। ভূমিকাতে অপ্রাসঙ্গিক ও অনাবশ্যিক বিষয়ের অবতারণা করা উচিত নয়।

০২। মূল অংশ: এ অংশে প্রবন্ধের মূল বক্তব্য উপস্থাপিত হবে। পরিবেশনের আগে বিষয়টিকে প্রয়োজনীয় সংকেত (Points) এ ভাগ করে নিতে হবে। সংকেতের বিস্তারিত কতখানি হবে তা ভাব প্রকাশের পূর্ণতার ওপর নির্ভরশীল। এর আয়তনগত কোনো নির্দিষ্ট পরিমাপ নেই।

০৩। উপসংহার: এটি প্রবন্ধের সিদ্ধান্তমূলক বা সমাপ্তিসূচক অংশ। এখানে লেখক তার আলোচনার সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং তার নিজস্ব অভিমত বা আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন।

(৭)

(ক) যেকোনো দশটি শব্দের পারিভাষিক রূপ লেখো :

অথবা

Goodwill

উত্তরঃ Goodwill = সুনাম

Measure

উত্তরঃ Measure = পরিমাপ, মাপ বা মাপজোখ।

Obligatory

উত্তরঃ Obligatory = বাধ্যতামূলক বা আবশ্যিক।

Pay-bill

উত্তরঃ Pay-bill = বেতন-বিল

Year

উত্তরঃ Year = বছর বা সাল ।

Book

উত্তরঃ Book = গ্রন্থ

Virus

উত্তরঃ Virus = বিষাক্ত

Thesis

উত্তরঃ Thesis = গবেষণা-সার, অভিসন্দর্ভ

Transparency

উত্তরঃ Transparency = স্বচ্ছতা

Parole

উত্তরঃ Parole = শর্তসাপেক্ষ মুক্তি বা সাময়িক মুক্তি ।

Quaue

উত্তরঃ Queue = সারি

Nursery

উত্তরঃ Nursery = শিশুশালা

Lien

উত্তরঃ Lien = পূর্বস্বত্ব

Donation

উত্তরঃ Donation = দান

(খ) নিচের অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ করো :

The most common causes of deforestation are cutting and burning the forestland. Though the forestlands are cut and burnt for the sake of agriculture and habitant, it has a negative effect on environment. The removal of trees causes the birds and other animals living on them to leave the place. It also causes serious damage to the soil, as trees give protection to soil as well. In the end, the soil gets sediment in the river bed and causes frequent floods.

উত্তরঃ বন উজাড় হওয়ার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কারণ হলো বনভূমি কাটা এবং পুড়িয়ে ফেলা।। যদিও কৃষি ও বসতির জন্য বনভূমি কাটা ও পুড়িয়ে ফেলা হয়, এর ফলে পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। গাছপালা অপসারণের ফলে সেখানে বসবাসকারী পাখি ও অন্যান্য প্রাণীদের স্থান' ত্যাগ করতে হয়। এটি মাটিরও মারাত্মক ক্ষতি করে, কারণ গাছ মাটির সুরক্ষা দেয়। শেষ পর্যন্ত মাটি নদীর তলদেশে পলি হিসেবে জমা হয় এবং ঘন ঘন বন্যার সৃষ্টি করে।

(ঙ)

(ক) যেকোনো পাঁচটি বাক্য শুদ্ধ করে লেখো :

অথবা

(i) দৈন্যতা কোনোকালেই প্রশংসনীয় নয়।

উত্তরঃ দৈন্যতা কোনোকালেই প্রশংসনীয় নয়। = দৈন্য/দীনতা কোনোকালেই প্রশংসনীয় নয়।

(ii) শুধু মাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না।

উত্তরঃ শুধুমাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না। = শুধু/মাত্র গায়ের জোরে কাজ হয় না।

(iii) সুশিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

উত্তরঃ সুশিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

(iv) সাবধান পূর্বক চলবে।

উত্তরঃ সাবধান পূর্বক চলবে। = সাবধানে চলবে।

(v) তাহারা সবাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।

উত্তরঃ তাহারা সবাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। = তারা সবাই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।

(vi) অশ্রুজলে বুক ভেসে গেল।

উত্তরঃ অশ্রুজলে বুক ভেসে গেল। = চোখের জলে/অশ্রুতে বুক ভেসে গেল।

(vii) মহারাজা সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন।

উত্তরঃ মহারাজা সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। = মহারাজ সভাকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

(viii) অপমান হবার ভয় নেই।

উত্তরঃ অপমান হবার ভয় নেই। = আপমানিত হবার ভয় নেই।

(খ) নিচের অনুচ্ছেদের অপপ্রয়োগগুলো শুদ্ধ করো :

এমন লজ্জাকর ব্যাপার কখনো দেখি নাই। ছেলেটি বংশের মাথায় চুনকালি দিয়েছে। ওর মা-বাবার আর বাঁচার স্বাদ নেই। তারা খুবই অপমান হয়েছে। সবাই ওকে সচ্চরিত্রবান মনে করতো।

উত্তরঃ এমন লজ্জাকর ব্যাপার কখনো দেখিনি। ছেলেটি বংশে মুখে চুনকালি দিয়েছে। ওর বাবা-মায়ের আর বাঁচার সাধ নেই তারা খুবই অপমানিত হয়েছেন। সবাই ওকে চরিত্রবান মনে করত।

(৫)

(ক) বাক্য কাকে বলে? গঠন অনুসারে বাক্য কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ আলোচনা করো।

উত্তরঃ এক বা একাধিক পদের (বিভক্তিয়ুক্ত শব্দ) সমন্বয়ে যখন বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়, তখন তাকে বাক্য বলে। যেমন: বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র।

এখানে 'বাংলাদেশ', 'একটি', 'স্বাধীন', 'সার্বভৌম', 'রাষ্ট্র'- এ পাঁচটি পদ মিলে একটি সম্পূর্ণ মনের ভাব প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং এটি একটি বাক্য। গঠন অনুসারে বাক্যের প্রকারভেদ: গঠন অনুসারে বাক্য তিন প্রকার। যথা :

ক. সরল বাক্য;

খ. জটিল বাক্য;

গ. যৌগিক বাক্য।

ক. সরল বাক্য: যে বাক্যে একটি মাত্র কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন: ছেলেটি দৌড়াচ্ছে। এখানে 'ছেলেটি' উদ্দেশ্য এবং 'দৌড়াচ্ছে' বিধেয়।

খ. জটিল বাক্য: যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্যের সঙ্গে এক বা একাধিক আশ্রিত খণ্ড বাক্য পরস্পর সাপেক্ষভাবে যুক্ত থাকে, তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে। যেমন: আশ্রিত খণ্ড বাক্য প্রধান খণ্ডবাক্য যে পরিশ্রম করে সেই সুখ লাভকরে।

গ. যৌগিক বাক্য: পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা জটিল বাক্য সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন: কঠোর পরিশ্রম করব তবুও ভিক্ষা করব না।

অথবা

(খ) নির্দেশ অনুসারে যেকোনো পাঁচটি বাক্যের বাক্যান্তর করো:

উত্তরঃ বাক্যান্তর (Sentence Transformation)

বাক্যান্তর হলো কোনো বাক্যের অর্থ অপরিবর্তিত রেখে তার গঠনগত রূপ পরিবর্তন করা। বাংলা দ্বিতীয় পত্রে এটি ব্যাকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা শিক্ষার্থীদের ভাষাজ্ঞান ও বাক্যগঠনের দক্ষতা বৃদ্ধি করে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একই বক্তব্যকে বিভিন্ন ধরনের বাক্য কাঠামোর সাহায্যে প্রকাশ করা যায়, যা লেখায় বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি আনে।

সাধারণত, বাক্যান্তরের ক্ষেত্রে নির্দেশ অনুসারে একটি বাক্যকে অন্য একটি নির্দিষ্ট ধরনের বাক্যে রূপান্তরিত করতে হয়। এর প্রধান কিছু প্রকারভেদ নিচে উল্লেখ করা হলো:

■ **সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্যের রূপান্তর:** একটি সরল বাক্যকে জটিল বা যৌগিক বাক্যে এবং জটিল/যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে রূপান্তর।

■ **অর্থানুসারে বাক্যের রূপান্তর:** যেমন – হাঁ-বোধক বাক্যকে না-বোধক বাক্যে, প্রশ্নবোধক বাক্যকে নির্দেশক বাক্যে, অনুজ্ঞাসূচক বাক্যকে বিবৃতিমূলক বাক্যে ইত্যাদি পরিবর্তন।

■ **বাচ্য পরিবর্তন:** কর্তৃবাচ্যকে কর্মবাচ্যে বা ভাববাচ্যে রূপান্তর।

এই প্রক্রিয়ায় শুধুমাত্র বাক্যের বাহ্যিক রূপ পরিবর্তিত হয়, কিন্তু মূল ভাব বা অর্থের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। শিক্ষার্থীদের নির্ভুলভাবে বাক্যান্তরের জন্য প্রতিটি বাক্যের গঠনগত বৈশিষ্ট্য এবং রূপান্তরের নিয়মাবলী সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা অপরিহার্য।

(i) সদা সত্য কথা বলা উচিত।

উত্তরঃ সদা সত্য কথা বলা উচিত। = সদা সত্য কথা বলবে।

(ii) ওকে চেনাই যায় না।

উত্তরঃ ওকে চেনাই যায় না। = ওকে চেনাই দায়।

(iii) মানুষের তৈরি দুর্যোগেও অনেক ক্ষতি করে।

উত্তরঃ মানুষের তৈরি দুর্যোগেও অনেক ক্ষতি করে। = মানুষের তৈরি দুর্যোগেও কম ক্ষতি করে না।

(vi) জীবে দয়া করা উচিত।

উত্তরঃ জীবে দয়া করা উচিত। = জীবে দয়া কর।

(v) ত্যাগের এ মহিমা অপূর্ব।

উত্তরঃ ত্যাগের এই মহিমা অপূর্ব। = কী অপূর্ব ত্যাগের মহিমা!

(vi) তুমি যা বললে তা অসত্য।

উত্তরঃ তুমি যা বললে তা অসত্য। = তোমার বলা কথাটা অসত্য।

(vii) তিনি দরিদ্র কিন্তু সৎ।

উত্তরঃ তিনি দরিদ্র কিন্তু সৎ। = যদিও তিনি দরিদ্র, তবুও তিনি সৎ।

(viii) তুমি দীর্ঘজীবী হও।

উত্তরঃ তুমি দীর্ঘজীবী হও। = তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

(8)

(ক) 'উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে'-আলোচনা করো।

উত্তরঃ উপসর্গ শব্দটির অর্থ হলো উপসৃষ্টি বা নতুন সৃষ্টি। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত যে সকল অব্যয় জাতীয় বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি কোনো ধাতু বা শব্দের পূর্বে বসে ঐ ধাতু বা শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটাতে পারে তাদেরকে উপসর্গ বলে। নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করতে পারলেও উপসর্গের নিজস্ব পূর্ণাঙ্গ অর্থ নেই। এজন্য এদের অর্থ প্রকাশের ক্ষমতা তথা অর্থবাচকতা নেই। কিন্তু এরা অন্য ধাতু বা শব্দের অর্থকে প্রভাবিত করতে পারে। তাই এদের অর্থের রেশ তথা অর্থদ্যোতকতা আছে।

যেমন: 'হার' একটি ধাতু। এর পূর্বে 'উপ', 'পরি', 'অনা', 'প্র', 'বি' প্রভৃতি উপসর্গ যুক্ত হয়ে যথাক্রমে

- উপ হার = উপহার:
- পরি+হার= পরিহার
- অন্য + হার = অনাহার:
- প্র + হার = প্রহার এবং
- বি+হার= বিহার

নামক নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করতে পেরেছে। লক্ষ করলে দেখা যায় যে, এখানে ব্যবহৃত উপসর্গগুলোর ('উপ', 'পরি', 'অনা', 'প্র', 'বি') নিজস্ব কোনো অর্থ নেই; কিন্তু এগুলো 'হার' ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়ে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করেছে। তাই এ কথা প্রমাণিত যে, উপসর্গের অর্থবাচকতা না থাকলেও অর্থদ্যোতকতা আছে।

অথবা

(খ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করো: (যেকোনো পাঁচটি)

উত্তরঃ প্রশ্নপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী যেকোনো পাঁচটি সমাসবদ্ধ পদের ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করতে হবে।

বাংলা ব্যাকরণে সমাস একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা একাধিক পদকে একপদে পরিণত করে বাক্যকে সংক্ষিপ্ত ও শ্রুতিমধুর করে তোলে। সমাস শব্দটির অর্থ সংক্ষেপ, মিলন বা একপদীকরণ। পরস্পর অর্থ-সম্পর্কযুক্ত দুই বা ততোধিক পদ এক পদে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকেই সমাস বলে।

যে বাক্যাংশ দ্বারা সমাসবদ্ধ পদটিকে বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা করা হয়, তাকে ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহবাক্য বলে। প্রতিটি সমাসের নিজস্ব গঠন ও অর্থগত বৈশিষ্ট্য থাকে, যা ব্যাসবাক্যের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়। যেমন, 'মৌমাছি' (সমাসবদ্ধ পদ) এর ব্যাসবাক্য হলো 'মধু সংগ্রহকারী মাছি'। এখানে 'মধু সংগ্রহকারী মাছি' হলো ব্যাসবাক্য, যা 'মৌমাছি' পদটির অর্থ প্রকাশ করছে এবং এটি একটি মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস।

সমাস প্রধানত ছয় প্রকারের হয়:

- **দ্বন্দ্ব সমাস:** যে সমাসে প্রতিটি সমস্যমান পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। যেমন: মা-বাবা (মা ও বাবা)।
- **কর্মধারয় সমাস:** বিশেষণ বা বিশেষণভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষ্য বা বিশেষ্যভাবাপন্ন পদের যে সমাস হয়, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন: নীলপদ্ম (নীল যে পদ্ম)।

- **তৎপুরুষ সমাস:** যে সমাসে পূর্ব পদের বিভক্তি লোপ পায় এবং পর পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে, তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: বিপদাপন্ন (বিপদকে আপন্ন)।
 - **বহুব্রীহি সমাস:** যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর কোনোটির অর্থ প্রাধান্য না পেয়ে অন্য কোনো অর্থের প্রাধান্য পায়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন: দশানন (দশ আনন যার)।
 - **অব্যয়ীভাব সমাস:** পূর্ব পদে অব্যয়ের সাথে পর পদের সমাস হয় এবং অব্যয়ের অর্থই প্রাধান্য পায়, তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। যেমন: আমরণ (মরণ পর্যন্ত)।
 - **দ্বিগু সমাস:** সমাহার বা সমষ্টি অর্থে সংখ্যাবাচক পূর্ব পদের সাথে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয়, তাকে দ্বিগু সমাস বলে। যেমন: ত্রিফলা (তিন ফলের সমাহার)।
- শিক্ষার্থীদের এই প্রকারভেদ ও তাদের ব্যাসবাক্য গঠনের নিয়মাবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যিক, কারণ এটি বাংলা ভাষার সঠিক ব্যবহার ও বাক্য গঠনে সহায়তা করে।

অনেক

উত্তরঃ অনেক = ন এক (নঞ তৎপুরুষ সমাস)

আমূল

উত্তরঃ আমূল = মূল পর্যন্ত (অব্যয়ীভাব সমাস)

উপবন

উত্তরঃ উপবন = বনের সদৃশ (অব্যয়ীভাব সমাস)

কালান্তর

উত্তরঃ কালান্তর = অন্য কাল (নিতা সমাস)।

ত্রিফলা

উত্তরঃ ত্রিফলা = তিন ফলের সমাহার দ্বিগু সমাস

নবযৌবন

উত্তরঃ নবযৌবন = নব যে যৌবন (সাধারণ কর্মধারয়)

সেতার

উত্তরঃ সেতার = সে (তিন) তারের সমাহার দ্বিগু সমাস

হিতাহিত

উত্তরঃ হিতাহিত = হিত ও অহিত (দ্বন্দ্ব সমাস)

(৩)

(ক) ক্রিয়া কাকে বলে? উদাহরণসহ ক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করো।

উত্তরঃ যে পদ দিয়ে কোনো কাজ করা, হওয়া ইত্যাদি বোঝায় সেগুলোকে ক্রিয়াপদ বলে। যেমন: লেখে, পড়ে, যায়, খায় ইত্যাদি
অর্থের দিক থেকে ক্রিয়াপদ দুই প্রকার :

১. সমাপিকা ক্রিয়া: যে ক্রিয়াপদের প্রয়োগে বাক্যের অর্থ সবটুকু প্রকাশ পায়, তাকে সমাপিকা ক্রিয়া বলে।
যেমন: ক্লাস শুরু হয়েছে, ফল বেরিয়েছে
২. অসমাপিকা ক্রিয়া: যে ক্রিয়াপদের সাহায্যে বাক্যের অর্থ সবটুকু প্রকাশ হয় না, সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশের জন্য আরও কিছু ক্রিয়ার প্রয়োজন পড়ে, সেগুলোকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। যেমন: পরীক্ষার জন্য তৈরি হয়ে এসো, ভালো ফল হলে সবাই খুশি। এসব বাক্যে 'হয়ে', 'হলে'- এসব ক্রিয়াপদ পর্যন্ত বললে অর্থের সম্পূর্ণ প্রকাশ হয় না। তাই এগুলো অসমাপিকা ক্রিয়াপদ।
গঠনের দিক থেকেও ক্রিয়াপদকে তিন ভাগ করা যায়:
১। মৌলিক ক্রিয়া: যেসব ক্রিয়াপদ মৌলিক ধাতু থেকে গঠিত হয়, তাকে মৌলিক ক্রিয়া বলে। যেমন: সে ভাত খায় (খা+য়)।
২। যৌগিক ক্রিয়া: অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে অন্য কোনো ধাতুযোগে যে ক্রিয়াপদ গঠিত হয়, তাকে যৌগিক ক্রিয়া বলে। যেমন: সে পাস করে গেল।
৩। প্রয়োজক ক্রিয়া: যে ক্রিয়া একজনের প্রয়োজনা বা উদ্যোগে অপরজন কর্তৃক সম্পাদিত হয়, তাকে প্রয়োজক ক্রিয়া বলে। যেমন: শিক্ষক ছাত্রকে পড়ান।
বাক্যে ব্যবহারের সময় ক্রিয়ার কর্ম থাকার না-থাকার দিক থেকে ক্রিয়াপদকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়
১. সক্রমিক ক্রিয়া: যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে, তাকে সক্রমিক ক্রিয়া বলে। যেমন: ছাত্ররা বই পড়ে। এখানে 'পড়ে' ক্রিয়ার কর্ম 'বই'। সে জন্য 'পড়ে' সক্রমিক ক্রিয়া।
২. অক্রমিক ক্রিয়া: যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে না, তাকে অক্রমিক ক্রিয়া বলে। যেমন: সে বাড়ি যায়। এখানে 'যায়' ক্রিয়ার কোনো কর্ম নেই বলে তা অক্রমিক ক্রিয়া। ('বাড়ি' কর্ম নয়, অধিকরণ)
৩. দ্বিকর্মিক ক্রিয়া: যে ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকে, তাকে দ্বিকর্মিক ক্রিয়া বলে। যেমন: শিক্ষক ছাত্রকে অঙ্ক করান। এখানে 'ছাত্রকে' ও 'অঙ্ক'- এই দুটি কর্ম আছে বলে 'করান' ক্রিয়াটি দ্বিকর্মিক ক্রিয়া।

অথবা

(খ) নিম্নরেখা যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ করো :

এগিয়ে চলেছে প্রতিবাদী মিছিল।

উত্তরঃ এগিয়ে চলেছে প্রতিবাদী মিছিল। = বিশেষ্য

পড়ন্ত বিকেলে হাঁটতে ভালো লাগে।

উত্তরঃ পড়ন্ত বিকেলে হাঁটতে ভালো লাগে। = বিশেষণ

অনেকেই ভাতের বদলে রুটি খায়।

উত্তরঃ অনেকেই ভাতের বদলে রুটি খায়। = অনুসর্গ

আজ নয় কাল সে আসবেই।

উত্তরঃ আজ নয় কাল সে আসবেই। = যোজক

পয়লা বৈশাখ বাঙালির উৎসবের দিন।

উত্তরঃ পয়লা বৈশাখ বাঙালির উৎসবের দিন। = পয়লা বৈশাখ (বিশেষ্য)

শাবাশ! দারুণ খেলছে আমাদের ছেলেরা।

উত্তরঃ শাবাশ! দারুণ কাজ করেছে। = আবেগ

চলো কোথাও বেড়াতে যাই।

উত্তরঃ চলো কোথাও একটু ঘুরে আসি। = ক্রিয়াবিশেষণ

অধিক ভোজন অনুচিত।

(২)

(ক) গত্ব বিধান কী? গত্ব বিধানের পাঁচটি নিয়ম লেখো।

উত্তরঃ বাংলা ভাষার শব্দের বানান কোন একক রীতিতে গড়ে ওঠেনি। বাংলা ভাষার নিজের বৈশিষ্ট্যের জন্য কোন কোন বর্ণের সঠিক ব্যবহো উচ্চারণে খুঁজে পাওয়া যায় না। যদি ন উচ্চারণ করা হয় তবে সেটি দন্ত্য- ন হবে নাকি মূর্ধন্য-ণ হবে তা বোঝা যায় না। কিন্তু বানানোর ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যক্ষ করি দন্ত্য- ন ও মূর্ধন্য-ণ এর ব্যবহারের ভিন্নতা রয়েছে।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের বানানে মূর্ধন্য-ণ ব্যবহারের নিয়মকে গত্ব- বিধান বলে। এক কথায় বলা যায়, তৎসম শব্দের বানানে ণ-এর শুদ্ধ ব্যবহারের নিয়মই গত্ব বিধান।

গত্ব বিধানের নিয়ম-

১. ঋ, র, ষ এর পরে ণ হয়। যেমন- ঘৃণা, ঋণ, তৃণ, ঋণ, হরিণ, কৃষ্ণাণ।
২. একই শব্দের মধ্যে ঋ, র, ষ বর্ণের পরে ক-বর্গ (ক, খ, গ, ঘ, ঙ) প-বর্গ (প, ফ, ব, ভ,ম), য, ব,হ অথবা অনুস্বার (০ং) থাকলে তার পরে ণ হয়। যেমন-পূর্বাহ্ন, অপরাহ্ন, দর্পণ, দ্রবণ।
৩. ট-বর্গের (ট,ঠ,ড,ঢ) এর পরে যুক্ত বর্ণে ণ হয়। যেমন- ঘণ্টা, লণ্ঠন, কণ্ঠ, দণ্ড, প্রচণ্ড।
৪. প্র, পরা, নির, পরি এর পর ণ হয়। যেমন- প্রমাণ, পরিণাম, নির্ণয় ইত্যাদি।
৫. পর, পরা, উত্তর, চন্দ্র, রাম, শব্দের পরে অয়ন বা আয়ন শব্দের দন্ত্য-ন হয় মূর্ধন্য-ণ। যেমন- রাম আয়ন রামায়ণ, নর+আয়ন= নারায়ণ, উত্তর+আয়ন = উত্তরায়ণ।

অথবা

(খ) যেকোনো পাঁচটি শব্দের বানান শুদ্ধ করে লেখো :

- উত্তরঃ
১. আকাজ্জা
 ২. প্রতিযোগিতা
 ৩. শ্রদ্ধাঞ্জলি
 ৪. শূন্য
 ৫. মুমূর্ষু

বাংলা বানানে শুদ্ধতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি, বিশেষত উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিভিন্ন নিয়মের সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে বানান ভুল এড়িয়ে চলা সম্ভব। নিচে উপরের শব্দগুলোর শুদ্ধ বানানের পেছনের কিছু নিয়ম দেওয়া হলো:

- **আকাজ্জা:** 'আকাজ্জা' শব্দটি 'আকাজ্জা' নয়, কারণ এখানে 'ঙ' এবং 'ক্ষ' যুক্তবর্ণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলা একাডেমি প্রমিত বানান অনুযায়ী এটি 'আকাজ্জা' হবে।
- **প্রতিযোগিতা:** 'প্রতিযোগিতা' বানানে 'ত' অক্ষরের সঙ্গে হ্রস্ব ই-কার (ি) ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় ভুলবশত দীর্ঘ ঈ-কার (ী) ব্যবহার করা হয়, যা সঠিক নয়। বাংলা ভাষায় দীর্ঘ ঈ-কার যুক্ত শব্দের সংখ্যা কম এবং সাধারণত তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে এটি নির্দিষ্ট কিছু প্রত্যয় বা প্রকৃতিতে দেখা যায়।
- **শ্রদ্ধাঞ্জলি:** 'অঞ্জলি' শব্দের সাথে যুক্ত হয়ে 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' গঠিত হয়। বাংলা একাডেমি প্রমিত বানান অনুযায়ী 'অঞ্জলি', 'আবলি', 'কারাবলি', 'গীতাবলি', 'শ্রেণি', 'তরণি', 'পদাবলি', 'বলি' (sacrifice), 'সরকারি' ইত্যাদি শব্দে হ্রস্ব ই-কার (ি) ব্যবহৃত হয়।

■ শূন্য: 'শূন্য' বানানে দীর্ঘ উ-কার (ূ) ব্যবহৃত হয়। এটি 'শূণ্য' নয়, কারণ 'ণ' এর পরিবর্তে 'ন' ব্যবহৃত হবে এবং 'শ' এর পর দীর্ঘ উ-কার বসবে।

■ মুমূর্ষু: 'মুমূর্ষু' বানানটি একটি জটিল বানান এবং এতে তিনটি উ-কার/উ-কার থাকে। প্রথম 'ম' এর সাথে হ্রস্ব উ-কার (ু), দ্বিতীয় 'ম' এর সাথে দীর্ঘ উ-কার (ূ) এবং 'র্ষ' এর সাথে হ্রস্ব উ-কার (ু) ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, 'মু-মূ-র্ষু'।

এই ধরনের বানান ভুলের প্রধান কারণ হলো দীর্ঘ ই-কার ও হ্রস্ব ই-কার এবং দীর্ঘ উ-কার ও হ্রস্ব উ-কারের প্রয়োগ সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব। প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মাবলী অনুশীলন ও নিয়মিত চর্চার মাধ্যমে এই ভুলগুলো সংশোধন করা সম্ভব।

দারিদ্রতা

উত্তরঃ দারিদ্রতা = দরিদ্রতা/দারিদ্র্য

মন্ত্রিসভা

উত্তরঃ মন্ত্রিসভা = মন্ত্রিসভা

অত্যন্ত

উত্তরঃ অত্যন্ত = অত্যন্ত।

উদীচি

উত্তরঃ উদীচি = উদীচী

মুহূত

উত্তরঃ মুহূর্ত = মুহূর্ত

মনকষ্ট

উত্তরঃ মনকষ্ট = মনঃকষ্ট

প্রতিযোগীতা

উত্তরঃ প্রতিযোগীতা = প্রতিযোগিতা।

সমিচীন

উত্তরঃ সমিচীন = সমীচীন

(১২) যেকোনো এটি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা লেখো :

(ক) অধ্যবসায়

উত্তরঃ **সূচনা** : ব্যর্থতা কেউ চায় না। সবাই সাফল্য খোঁজে। কিন্তু কেউই সব কাজে একবারে সফল হয় না। সফলতার জন্য বারবার চেষ্টা করতে হয়। কোনো কাজে সাফল্য লাভের জন্য বারবার এই চেষ্টার নামই অধ্যবসায়। অধ্যবসায় ছাড়া জীবনে উন্নতি লাভ করা যায় না। অধ্যবসায়ই হচ্ছে মানব সভ্যতার অগ্রগতির চাবিকাঠি।

অধ্যবসায় কী : অধ্যবসায় শব্দের আভিধানিক অর্থ অবিরাম সাধনা, ক্রমাগত চেষ্টা। কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য অবিরাম সাধনা বা ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়াকে বলে অধ্যবসায়। ব্যর্থতায় নিরাশ না হয়ে কঠোর পরিশ্রম আর ধৈর্যের সাথে অতীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর মধ্যেই অধ্যবসায়ের সার্থকতা নিহিত।

অধ্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা : ব্যর্থতাই সফলতার প্রথম সোপান। ব্যর্থতা থেকে সাধনার শুরু, আর সফলতার মাধ্যমে তার শেষ। তাই মানবজীবনে সাধনা বা অধ্যবসায়ের বিকল্প নেই। অধ্যবসায়ী মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে। এমনকি অধ্যবসায়ের গুণেই মানুষ পৃথিবীতে অমরত্ব লাভ করতে পারে। তাই মানবজীবনে অধ্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

ছাত্রজীবনে অধ্যবসায় : ছাত্রজীবনে অধ্যবসায়ের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। ছাত্রজীবনই ভবিষ্যৎ গড়ার উপযুক্ত সময়। এ সময় ব্যর্থ হলে সম্পূর্ণ মানবজীবনই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যে ছাত্র অধ্যবসায়ী, সাফল্য তার হাতের মুঠোয়। অলস ছাত্র-ছাত্রী মেধাবী হলেও পড়াশোনায় কখনো সফল হতে পারে না। কঠোর অধ্যবসায় ছাড়া কোনো কাজেই জয়ী হওয়া যায় না। ছাত্রজীবনেই এই সত্য উপলব্ধি করে নিজেকে অধ্যবসায়ী হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে কবি কালীপ্রসন্ন ঘোষের বিখ্যাত উক্তি :

পারিব না একথাটি বলিও না আর,
কেন পারিবে না তাহা ভাব একবার,
পার কি না পার কর যতন আবার
একবার না পারিলে দেখ শতবার।

অধ্যবসায় ও প্রতিভা : অধ্যবসায় প্রতিভার চেয়ে অনেক বড়। মনীষী ভলতেয়ারের ভাষায়, 'প্রতিভা বলে কোনো কিছু নেই। পরিশ্রম ও সাধনা করে যাও তাহলে প্রতিভাকে অগ্রাহ্য করতে পারবে।' ডালটন বলেছেন, 'লোকে আমাকে প্রতিভাবান বলে; কিন্তু আমি পরিশ্রম ছাড়া আর কিছু জানি না।' বিজ্ঞানী নিউটনের উক্তি, 'আমার আবিষ্কার প্রতিভা-প্রসূত নয়, বহু বছরের অধ্যবসায় ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনার ফল।' এ থেকেই বোঝা যায়, অধ্যবসায় ও পরিশ্রম ছাড়া শুধু প্রতিভার কোনো মূল্য নেই। প্রতিভাবান ব্যক্তির অধ্যবসায় দ্বারাই নিজের কাজকে সুসম্পন্ন করে তোলেন। আবার অধ্যবসায়ের দ্বারা অনেকে প্রতিভাবান হিসেবে সুনাম অর্জন করেন।

অধ্যবসায়ের উদাহরণ : পৃথিবীতে যেসব মনীষী সাফল্যের উচ্চ শিখরে আরোহণ করে অমরত্ব লাভ করেছেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন অধ্যবসায়ী। স্কটল্যান্ডের রাজা রবার্ট ব্রুস ও ফ্রান্সের বিখ্যাত ঐতিহাসিক কার্লাইল অধ্যবসায়ের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। রবার্ট ব্রুস বারবার ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়েও যুদ্ধ-জয়ের আশা ও চেষ্টা ত্যাগ করেন নি। ষষ্ঠবার পরাজিত হয়ে তিনি যুদ্ধ চিন্তায় মগ্ন আছেন, এমন সময় দেখতে পেলেন একটি মাকড়সা বারবার কড়িকাঠে সুতা বাঁধবার চেষ্টা করছে এবং ব্যর্থ হচ্ছে। এইভাবে ছয়বার ব্যর্থ হয়ে সপ্তমবারে মাকড়সাটি সফল হলো। এই দেখে রবার্ট ব্রুসও সপ্তমবার যুদ্ধ করে ইংরেজদের পরাজিত করেন এবং স্কটল্যান্ডের ওপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করেন। মনীষী কার্লাইল তাঁর লেখা ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি এক বন্ধুকে পড়তে দিয়েছিলেন। বন্ধুর বাড়ির কাজের মহিলা সেটিকে বাজে কাগজ ভেবে পুড়িয়ে ফেলেন। কার্লাইল এতে একটুও দমে যান নি। তিনি আবার চেষ্টা করে বইখানা লিখে বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়েছিলেন। সম্রাট নেপোলিয়ান, আব্রাহাম লিঙ্কন, ক্রিস্টোফার কলম্বাস প্রমুখ মনীষীর জীবনও অধ্যবসায়ের এক বিরাট সাক্ষ্য। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অধ্যবসায়ের গুণেই আজ বিশ্ববিখ্যাত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কাজী নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্য অধ্যবসায়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমরা বাঙালিমাত্রই তাঁদের জন্য গর্বিত।

উপসংহার : অধ্যবসায় হচ্ছে জীবনসংগ্রামের মূল প্রেরণা। এ সংগ্রামে সফলতা ও ব্যর্থতা উভয়ই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যবসায়ী মানুষ জীবনের সব ব্যর্থতাকে সাফল্যে পরিণত করতে পারে। তাই নির্দিধায় বলা যায়, জীবনে সাফল্যের জন্য অধ্যবসায়ের বিকল্প নেই।

(খ) আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ও বাংলাদেশ

উত্তরঃ

আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ও বাংলাদেশ

ভূমিকা : বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রযাত্রার যুগ, যার মূলে রয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি। একবিংশ শতাব্দীতে এসে তথ্যপ্রযুক্তি কেবল মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজই করেনি, বরং বিশ্বকে রূপান্তর করেছে একটি 'গ্লোবাল

ভিলেজ' বা বৈশ্বিক গ্রামে। বাংলাদেশও এই প্রযুক্তির জোয়ার থেকে পিছিয়ে নেই। দীর্ঘদিনের অনগ্রসরতা কাটিয়ে বাংলাদেশ আজ তথ্যপ্রযুক্তির মহাসড়কে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

তথ্যপ্রযুক্তি কী? : উপাত্ত বা তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, রূপান্তর এবং তা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিরবচ্ছিন্নভাবে আদান-প্রদান করার সার্বিক প্রক্রিয়াকে তথ্যপ্রযুক্তি (Information Technology) বলা হয়। কম্পিউটার, ইন্টারনেট, স্মার্টফোন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), ক্লাউড কম্পিউটিং এবং টেলিযোগাযোগ হলো আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির প্রধান হাতিয়ার।

বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তির বিবর্তন : বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তির যাত্রা শুরু হয়েছিল গত শতাব্দীর ষাটের দশকে পরমাণু গবেষণায় আইবিএম (IBM) মেইনফ্রেম কম্পিউটার স্থাপনের মাধ্যমে। তবে এর প্রকৃত বিকাশ ঘটে আশির দশকে ব্যক্তিগত কম্পিউটারের (PC) আগমন এবং ১৯৯৫ সালে ইন্টারনেটের বাণিজ্যিক সংযোগ চালুর পর। ২০০৯ সালে ঘোষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' রূপকল্প দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতে একটি যুগান্তকারী বিপ্লব নিয়ে আসে। বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণের লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

বিভিন্ন খাতে তথ্যপ্রযুক্তির অবদান ও প্রয়োগ : বাংলাদেশের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ খাতে তথ্যপ্রযুক্তি এক আমূল পরিবর্তন এনেছে। নিচে প্রধান খাতগুলোর চিত্র তুলে ধরা হলো:

শিক্ষা খাত (E-Learning) : করোনা মহামারির পর থেকে বাংলাদেশে ই-লার্নিং বা অনলাইন শিক্ষার প্রসার ঘটেছে বহুগুণ। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, অনলাইন ক্লাস, এবং ডিজিটাল পাঠ্যপুস্তকের (ই-বুক) মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীরাও মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে।

চিকিৎসা খাত (Telemedicine) : তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে রোগীরা ভিডিও কলের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ বা টেলিমেডিসিন সেবা গ্রহণ করতে পারছেন।

কৃষি খাত (Digital Agriculture) : কৃষকরা এখন ঘরে বসেই বিভিন্ন মোবাইল অ্যাপ এবং কৃষি তথ্য বাতায়ন ব্যবহার করে ফসলের রোগবালাই, আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও সারের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারছেন।

ব্যাংকিং ও ই-কমার্স : মোবাইল ব্যাংকিং (যেমন: বিকাশ, রকেট, নগদ) এবং অনলাইন ব্যাংকিংয়ের ফলে আর্থিক লেনদেন এখন হাতের মুঠোয়। পাশাপাশি ই-কমার্স ওয়েবসাইটের কল্যাণে কেনাকাটা হয়ে উঠেছে অত্যন্ত সহজ ও সময়সাপ্রসায়ী।

প্রশাসনিক সেবা (E-Governance) : সরকারি কাজের স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা বাড়াতে ই-গভর্নেন্স চালু হয়েছে। জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্ম নিবন্ধন, ট্রেনের টিকিট, এবং বিভিন্ন সরকারি ভাতা এখন অনলাইনেই সম্পন্ন হচ্ছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ফ্রিল্যান্সিং

তথ্যপ্রযুক্তি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এক নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে। দেশের তরুণ সমাজের একটি বিশাল অংশ এখন ফ্রিল্যান্সিং বা আউটসোর্সিংয়ের সাথে যুক্ত। সফটওয়্যার তৈরি, গ্রাফিক্স ডিজাইন ও ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে, যা জাতীয় জিডিপিতে (GDP) ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহার ও চ্যালেঞ্জ

যেকোনো প্রযুক্তির ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি কিছু নেতিবাচক দিকও থাকে। বাংলাদেশে তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের সাথে সাথে কিছু চ্যালেঞ্জও তৈরি হয়েছে:

সাইবার অপরাধ বা হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে আর্থিক জালিয়াতি।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব, অপপ্রচার এবং তরুণ প্রজন্মের আসক্তি।

শহর ও গ্রামের মধ্যে ইন্টারনেটের গতি ও মূল্যের বৈষম্য (ডিজিটাল ডিভাইড)।

দক্ষ জনশক্তির অভাব এবং সাইবার নিরাপত্তার দুর্বলতা।

উত্তরণের উপায়

তথ্যপ্রযুক্তির সুফল পুরোপুরি ঘরে তুলতে হলে আমাদের কিছু কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি:

১. প্রত্যন্ত অঞ্চলে সাশ্রয়ী মূল্যে উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবা নিশ্চিত করা।
২. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তি এবং প্রোগ্রামিংকে বাধ্যতামূলক ও প্রায়োগিক করা।
৩. সাইবার নিরাপত্তা আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা এবং আইটি বিশেষজ্ঞদের প্যানেল তৈরি করা।
৪. সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ফ্রিল্যান্সার ও উদ্যোক্তাদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও ঋণের ব্যবস্থা করা।

উপসংহার : আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য একটি আশীর্বাদস্বরূপ। সব বাধা ও চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে সরকার এবং সাধারণ মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ তথ্যপ্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারে সফল হবে। তথ্যপ্রযুক্তির এই সঠিক ও ইতিবাচক প্রয়োগই আগামী দিনে বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ ও আত্মনির্ভরশীল রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে।

(গ) বাংলাদেশের পোশাক শিল্প

উত্তরঃ

বাংলাদেশের পোশাক শিল্প

ভূমিকা

আধুনিক বিশ্বে শিল্পায়নের ধারণা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষের পরিধেয় কাপড়ের উৎপাদন এক সময় শিল্প হিসেবেও পরিচিত ছিল। আজ অনেক দেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে পোশাক শিল্প নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে। এই সম্ভাবনার সংযোজন আমাদের বাংলাদেশেও ঘটেছে। বাংলাদেশ বর্তমানে বিদেশে পোশাক রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। প্রকৃতপক্ষে, পোশাক শিল্প জাতীয় আয়ের প্রায় 64 শতাংশ জোগান দেয়। তাছাড়া এই শিল্প অনেক বেকারের কর্মসংস্থান করেছে। তাদের অধিকাংশই নারী। এর ফলে একদিকে যেমন নারীদের অর্থায়ন ও ক্ষমতায়নের কিছু সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, অন্যদিকে পুরুষের লাঞ্ছনার হাত থেকেও রক্ষা পাচ্ছে। পোশাক শিল্পের উদ্যোক্তাদের দ্বারা শোষিত হলেও সামগ্রিকভাবে এই শিল্প আমাদের দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের অতীত অবস্থা

সুদূর অতীত থেকেই বিশ্ববাজারে বাংলার পোশাক শিল্পের যথেষ্ট চাহিদা ছিল। বিশেষ করে মসলিন ও জামদানি নামক সুস্বাদু কাপড় ছিল বিশ্ব বিখ্যাত। কিন্তু ব্রিটিশদের আগমনে পোশাক শিল্প অনেকাংশে ধ্বংস হয়ে যায়। তারা তাঁতশিল্পকে ধ্বংস করার জন্য নানা পরিকল্পনা করে। কাপড়ের বাজার তৈরির জন্য তারা মেশিনের মাধ্যমে বস্ত্র তৈরি শুরু করে। ফলে এক পর্যায়ে পোশাক শিল্প তার নিজস্ব স্বকীয়তা হারাতে থাকে।

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের বর্তমান অবস্থা

দীর্ঘ যাত্রার পর বাংলাদেশ তার তৈরি পোশাক শিল্পের মাধ্যমে বস্ত্র খাতে তার হারানো গৌরব ফিরে পেতে চাইছে। এই শিল্প দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি উৎসাহব্যঞ্জক অবদান রেখে চলেছে। তবে বস্ত্র খাতের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ কিছু শিল্প পণ্য বিদেশে রপ্তানি শুরু করে। 1977 সালে, বেসরকারী শিল্প উদ্যোক্তাদের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের বিকাশ ঘটে। তখন মাত্র কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল।

1985 সালে তৈরি পোশাক শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটে। শুরুতে 150টি পোশাক কারখানা ছিল। এই সীমিত সংখ্যক কারখানা দিয়ে পোশাক শিল্পের সূচনা হলেও শিল্পপতিরা ধীরে ধীরে কারখানার সংখ্যা ও শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ান। দেশীয় উদ্যোক্তাদের সক্রিয় ভূমিকার কারণে এসব শিল্পের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে তিন হাজারের বেশি। এসব প্রতিষ্ঠানে প্রায় 18 লাখ লোক কর্মসংস্থান করেছে, যার মধ্যে নারী শ্রমিকের সংখ্যা বেশি, প্রায় 85%।

পোশাক শিল্পের ইতিহাস

জীবনধারণের জন্য যেমন খাদ্যের প্রয়োজন, তেমনি সমাজে বসবাসের জন্য মানুষের বস্ত্রের প্রয়োজন। প্রাচীনকালে, লোকেরা লতা, পাতা, বাকল এবং পশুর চামড়া দিয়ে তাদের বস্ত্রের চাহিদা মেটাতে এবং পরবর্তীতে ধীরে ধীরে তন্তু, সুতা এবং কাপড়ের প্রচলন হয়। কবে, কবে এবং কোথায় প্রথম কাপড়ের ব্যবহার শুরু হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও এক সময় মানুষ সুই সুতো দিয়ে সেলাই করে নিজেদের কাপড় তৈরি করত। ধীরে ধীরে মানুষ সেলাই মেশিনের সাহায্যে কাপড় তৈরি করতে থাকে। সেলাই মেশিনের সাহায্যে মানুষের কাপড় সেলাইয়ের ইতিহাস মাত্র 260 বছর আগের গল্প। সেলাই মেশিন উদ্ভাবকদের প্রাচীন ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে ইংল্যান্ডের চার্লস হেডরিক 1755 সালে প্রথম যান্ত্রিক সেলাই মেশিন আবিষ্কার করেন। তারপর সেলাই মেশিন হাতের সেলাইয়ের মতো সেলাই তৈরি করতে পারে। আইজ্যাক মেরিট সিঙ্গার 1851 সালে বাণিজ্যিকভাবে সফল সেলাই মেশিন আবিষ্কার করেছিলেন।

বাংলাদেশের পোশাক শিল্প এবং এর ভবিষ্যৎ

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরু হয় ষাটের দশকে। বর্তমানে এটি বাংলাদেশের বৃহত্তম রপ্তানিমুখী শিল্প। 1960 সালে, বাংলাদেশের প্রথম পোশাক ঢাকার উর্দু রোডে রিয়াজ স্টোর নামে যাত্রা শুরু করে। 1967 সালে, রিয়াজ স্টোরের উৎপাদিত 10,000 পিস শার্ট প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ থেকে দেশের বাইরে (যুক্তরাজ্য) রপ্তানি করা হয়েছিল। এরপর 1973 সালে তিনি রিয়াজ স্টোর" এর নাম পরিবর্তন করে "রিয়াজ গার্মেন্টস" করেন। এছাড়া এ যুগের আরও একটি পোশাকের কথা শোনা যায়, তা হলো 'দেশ গার্মেন্টস'। দেশ গার্মেন্টস তখনকার 100% রপ্তানিমুখী পোশাক ছিল। ৭০ এর দশকের শেষের দিকে এদেশে মাত্র ৯টি রপ্তানিমুখী কোম্পানি ছিল যারা ইউরোপের বাজারে প্রতি বছর ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ব্যবসা করত। সে সময় দেশে বড় ও বিখ্যাত পোশাক কারখানা ছিল ৩টি। সেগুলো হলো- রিয়াজ গার্মেন্টস, প্যারিস গার্মেন্টস, জুয়েল গার্মেন্টস।

পোশাক শিল্পের বাজার

যেকোনো উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পণ্যের বাজার তৈরি করা। তা না হলে পণ্য যতই ভালো হোক না কেন তা কোনো কাজে আসে না। আশার কথা, বাংলাদেশের পোশাক শিল্প বিশ্ববাজারে যথেষ্ট চাহিদা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের তৈরি পোশাকের প্রধান বাজার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চম। কানাডা, ইইসি দেশ, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, বেলজিয়াম এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ ছাড়াও ২৩টি দেশে বাংলাদেশ তার পোশাক রপ্তানি করে। এসব পোশাকের মধ্যে রয়েছে শার্ট, পায়জামা, জিন্স প্যান্ট, জ্যাকেট, ল্যাবরেটরি কোট, গেঞ্জি, সোয়েটার, পুল ওভার, খেলাধুলার পোশাক, নাইট ড্রেস ইত্যাদি। বর্তমানে বাংলাদেশের পোশাকের বাজার বিভিন্ন দেশে বিস্তৃত হচ্ছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পোশাক শিল্পের অবদান

পোশাক শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সুদূরপ্রসারী অবদান রেখে চলেছে। এই সেক্টরের অবদানের প্রধান দিকগুলি নিম্নরূপ:

অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং রপ্তানি বৃদ্ধি

পোশাক শিল্পের বিকাশের সাথে সাথে দেশের রপ্তানি পণ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের দেশের প্রায় শতাধিক বায়িং হাউস পোশাক ক্রয়-বিক্রয়ের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। জাতীয় আয়ের প্রায় ৬৪% আসে এই খাত থেকে। তবে এই আয় নির্ভর করে রপ্তানি বাণিজ্যের ওপর।

বেকার সমস্যা সমাধান

এই শিল্প বেকারত্ব হ্রাস এবং জাতীয় জীবনে স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে কারণ এই খাতে দরিদ্র, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের এক মিলিয়নেরও বেশি নারী শ্রমিককে কর্মসংস্থান করা যেতে পারে।

দ্রুত শিল্পায়ন

পোশাক শিল্প দ্রুত শিল্পায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ফলে এদেশে বিভিন্ন স্পিনিং, উইভিং, নিটিং, ডাইং, ফিনিশিং, প্রিন্টিং ইত্যাদি শিল্প গড়ে উঠছে। এ ছাড়া গার্মেন্টস, জিপার, বাটাম, ব্যাগলা ইত্যাদি শিল্পের প্রসার ঘটছে

পরিবহন এবং পোর্ট ব্যবহার

পোশাক শিল্পের আমদানি-রপ্তানি বন্দর থেকে কারখানায় পরিবহন শিল্পের অগ্রগতি এবং এগুলোর যথাযথ ব্যবহারে নেতৃত্ব দিয়েছে।

অন্যান্য অবদান

পোশাক শিল্পে বিনিয়োগ করে ব্যাংকগুলো লাভবান হচ্ছে। বীমা কোম্পানির প্রিমিয়ামের পরিমাণ বাড়ছে। বাংলাদেশে আসছে নতুন নতুন প্রযুক্তি।

ফ্যাশন শিল্পে সমস্যা

1 জানুয়ারী, 2005 থেকে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) দ্বারা প্রবর্তিত টেক্সটাইল এবং পোশাক সংক্রান্ত চুক্তি কার্যকর হয়। মাল্টিফাইবার অ্যারেঞ্জমেন্ট (MFA) চুক্তি বাতিল করা হয়েছে। ফলে পোশাক শিল্প কোটা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। আসলে কোটামুক্ত বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতার জন্য আমাদের দেশ এখনো প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি তৈরি করতে পারেনি। যেখানে সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, চীন, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ কম খরচে মানসম্মত পোশাক উৎপাদন করছে, সেখানে বাংলাদেশ এখনো অনেক পিছিয়ে। এই পশ্চাৎপদতার মূলে রয়েছে নানা সমস্যা।

পোশাক শিল্পের সম্ভাবনা

বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। তবে আজকের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পকে টিকে থাকতে অনেক দূর যেতে হবে। এর জন্য আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের ISO সার্টিফিকেশন গ্রহণ করা উচিত। ক্রেতারা যেহেতু বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। সর্বোপরি, আমাদের টেক্সটাইল ও পোশাকের মান উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে দাম কমিয়ে চ্যালেঞ্জকে সুযোগ হিসেবে নিতে হবে। সে লক্ষ্যে সরকার, উদ্যোক্তা ও ব্যাংকগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে।

বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের অবস্থান

2021 সালের শেষে, পোশাক রপ্তানিতে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ভিয়েতনামের তুলনায় বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি বেড়েছে 4.72 বিলিয়ন ডলার। এর ফলে পোশাক রপ্তানিতে ভিয়েতনামকে টপকে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। ২০২১ সালে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাজারে ৩ হাজার ৫৮০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। একই সঙ্গে পোশাক শিল্পের বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ভিয়েতনামের রপ্তানি মূল্য ছিল ৩ হাজার। 108 মিলিয়ন ডলার। তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বিশ্বে চীনের অবস্থান প্রথম। আর বাংলাদেশ থেকে এক ধাপ নিচে অর্থাৎ প্রধান প্রতিযোগী দেশ ভিয়েতনাম চলে গেছে তৃতীয় স্থানে।

উপসংহার

মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং দেশের বেকারত্ব সমস্যা সমাধানে পোশাক শিল্পের ভূমিকা অনন্য। 1977 সালে হাতে গোনা কয়েকটি কারখানা নিয়ে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের সূচনা হয়েছিল, আজ এর সংখ্যা কয়েকগুণ বেড়েছে। জাতীয় আয়ের পাঁচ শতাংশের বেশি আসছে এ শিল্প থেকে। তাই এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সব ক্ষেত্রে সরকারি অনুগ্রহ পেলে এই শিল্প আরও সমৃদ্ধ হবে এবং বাংলাদেশের জন্য অসীম সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে। আর পোশাক শিল্প ভবিষ্যতে আরও আধুনিক হয়ে উঠবে।

(ঘ) কর্মমুখী শিক্ষা

উত্তরঃ **সূচনা :** শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ছাড়া জীবন অপূর্ণ। কিন্তু যে শিক্ষা বাস্তব জীবনে কাজে লাগে না, সে শিক্ষা অর্থহীন। এ ধরনের শিক্ষায় পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বোঝা বাড়ে। তাই জীবনভিত্তিক শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। আর জীবনের সাথে সম্পৃক্ত যে শিক্ষা সেটিই কর্মমুখী শিক্ষা। একমাত্র কর্মমুখী শিক্ষাই হচ্ছে আমাদের বাস্তব জীবনের সহায়ক।

কর্মমুখী শিক্ষা কী : কর্মমুখী শিক্ষা হচ্ছে একজন ব্যক্তিকে তার আত্মপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা করার লক্ষ্যে বিশেষ কোনো কর্মে প্রশিক্ষিত করে তোলা। অর্থাৎ যে শিক্ষাব্যবস্থায় মানুষ কোনো একটি বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা লাভ করে এবং শিক্ষা শেষে জীবিকার্জনের যোগ্যতা অর্জন করে, তাকেই কর্মমুখী শিক্ষা বলে। কর্মমুখী শিক্ষাকে কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষাও বলা হয়ে থাকে।

কর্মমুখী শিক্ষার প্রকারভেদ : কর্মমুখী শিক্ষা যান্ত্রিক শিক্ষা নয়। জীবনমুখী শিক্ষার পরিমণ্ডলেই তার অবস্থান। তাই পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক জীবনবোধের আলোকে কর্মমুখী শিক্ষা দুই ভাগে বিভক্ত। একটি হলো উচ্চতর কর্মমুখী শিক্ষা। এটিতে যারা বিজ্ঞান বিষয়ে পারদর্শী তারা - বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ ইত্যাদি স্বাধীন পেশা গ্রহণ করতে পারে। চাকরির আশায় বসে থাকতে হয় না। আরেকটি হলো সাধারণ কর্মমুখী শিক্ষা। এর জন্য কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার দরকার হয় না। প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষাই যথেষ্ট। সাধারণ কর্মমুখী শিক্ষার মধ্যে পড়ে কামার, কুমার, তাঁতি, দর্জি, কলকারখানার কারিগর, মোটরগাড়ি মেরামত, ঘড়ি-রেডিও-টিভি-ফ্রিজ মেরামত, ছাপাখানা ও বাঁধাইয়ের কাজ,

চামড়ার কাজ, গ্রাফিক্স আর্টস, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, মৎস্য চাষ, হাঁস- মুরগি পালন, নার্সারি, ধাত্রীবিদ্যা ইত্যাদি। এ শিক্ষায় শিক্ষিত হলে কারোরই বেঁচে থাকার জন্য ভাবতে হয় না।

কর্মমুখী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা : মানুষের মেধা ও মননকে বিকশিত করার জন্য প্রয়োজন শিক্ষার। তাই মানুষকে সেই শিক্ষাই গ্রহণ করা উচিত, যে শিক্ষা তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনধারার উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। এ দুরবস্থা থেকে মুক্তি পেতে পরিকল্পিত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে জীবন সম্পৃক্ত ও উপার্জনক্ষম কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন জরুরি। কর্মমুখী শিক্ষা আত্মকর্মসংস্থানের নানা সুযোগ সৃষ্টি করে। ব্যক্তিকে স্বাবলম্বী করে তোলে। এ শিক্ষা ব্যক্তি ও দেশকে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি দেয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্যবিমোচনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। কর্মমুখী শিক্ষায় দক্ষ জনশক্তি আমরা বিদেশে পাঠিয়ে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি। বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের দেশেও শিক্ষাকে কর্মমুখী করে তোলা অতীব প্রয়োজন।

কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার : কর্মমুখী শিক্ষার গুরুত্ব আজ সর্বত্র স্বীকৃত। এর মাধ্যমে হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা পেশাগত কাজের যোগ্যতা অর্জন করে এবং দক্ষ কর্মী হিসেবে কর্মক্ষেত্রে যোগ দেয়। কর্মমুখী শিক্ষা প্রসার ও উৎকর্ষ সাধন ব্যতীত কোনো জাতির কৃষি, শিল্প, কল-কারখানা, অন্যান্য উৎপাদন এবং কারিগরি ক্ষেত্রে উন্নতি সম্ভব নয়। বাংলাদেশে কর্মমুখী শিক্ষার ক্ষেত্র ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে। দেশে প্রকৌশল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়; পলিটেকনিক ও ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট; লেদার ও টেক্সটাইল টেকনোলজি কলেজ, গ্রাফিক্স আর্টস কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এগুলো কর্মমুখী শিক্ষা প্রসারে ভূমিকা রাখছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা অপ্রতুল। তাই আমাদের দেশে সরকার ও জনগণের সক্রিয় প্রচেষ্টায় আরও অনেক কর্মমুখী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা দরকার। বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে কর্মমুখী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে স্কুল ও মাদ্রাসায় নবম ও দশম শ্রেণিতে বেসিক ট্রেড কোর্স চালু, কৃষিবিজ্ঞান, শিল্প, সমাজকল্যাণ ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত; পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ডবল শিফট চালু ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

উপসংহার : বাংলাদেশ বিপুল জনসংখ্যার দেশ। কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে এ জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব। দক্ষ জনশক্তি দেশের সম্পদ; উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। তাই আমাদের দেশে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ব্যাপকভাবে কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার ঘটানো দরকার।

(ঙ) যুদ্ধ নয় শান্তি

উত্তরঃ

যুদ্ধ নয় শান্তি

ভূমিকা:

"আর যুদ্ধ নয়, নয়।

আর নয় মায়েদের শিশুদের কান্না

রক্ত কি, ধ্বংস কি, যুদ্ধ আর না, আর না।"

না, বিশ্বের শান্তি প্রিয় মানুষ আর যুদ্ধ চায় না। তবু মানুষকে যুদ্ধের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়। বিগত সাড়ে পাঁচ হাজার বছরে মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে সড়ে চৌদ্দ হাজার যুদ্ধ। বিংশ শতাব্দীর দুটি ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধ বিশ্বের মানুষকে বুঝিয়ে দিয়েছে যুদ্ধ কী? যুদ্ধের ভয়াবহতা কত নির্মম। তাইজে শান্তিকামী মানুষরা প্রতিষ্ঠা করুন জাতিসংঘ নামক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু একাবিংশ শতাব্দীর মানুষ ইরাকের যুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করতেছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পৈশাচিক উল্লাস। শিশুর কান্নায়, নারীর আর্তনাদে, লাশের গন্ধে ইরাকের আকাশ ভারী হয়ে উঠলেও লোভী শৃগালের মতো মার্কিন প্রশাসনের দৃষ্টি এখন তেল সম্পদের দিকে।

প্রাচীন যুদ্ধ: প্রাচীনকালেও পৃথিবীতে যুদ্ধ ছিল। সে সময়কার মহাকাব্যগুলোও যুদ্ধভিত্তিক। যুদ্ধের মাধ্যমেই এক একটি সভ্যতার জন্ম হয়েছে। আমর হোমারের মহাকাব্য 'ইলিয়াড' ও 'ভডিসির' মধ্যে প্রাচীনকালের যুদ্ধের ভয়াবহ বর্ণনা পাই। বর্তমানেও এরই ধারা অব্যাহত রেখে চলছে যুদ্ধ। সভ্যতার ইতিহাস শ্রেণিদ্বন্দ্ব ও শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস। মানবসভ্যতার সেই প্রত্যক্ষ মুহূর্ত থেকেই যুদ্ধ, সংঘর্ষ আর রক্তপাত। তারই মধ্য দিয়ে শক্তিশালীর ঘটেছে উত্তরণ। একের বিনাশে অপরের অস্তিত্ব হয়েছে সুরক্ষিত। আজও মানুষ ভুলতে পারে নি সেই রক্তাক্ত দিনের ভয়ংকর স্মৃতি। প্রাচীন বর্বর যুগের অসভ্য মানুষ আজকের সভ্য মানুষ হয়ে যুদ্ধের নির্মম

অর্থ জেনে গেছে, যুদ্ধ নিয়ে আর নড় নয়, নয় প্রভুত্বের বিস্তারের বিলাসিতা। যুদ্ধ মানে আজ সপ্ততার বিনাশ, যুদ্ধ মানে এখন মানুষের অস্তিত্বের বিলোপ। তবে আজকের মতো পারমাণবিক যুদ্ধ কিংবা আধুনিক সব সমরাজ্ঞ নিয়ে প্রাচীনকালে যুদ্ধ হতো না। মুখের ভেল পল্টানোর সাথে সাথে পাল্টে গেছে মানুষের যুদ্ধ করার উপকরণ সমূহের।

যুদ্ধ কেন হয়?ঃ এক সময় মানুষ যুদ্ধ করতো নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য। হিংস্র জন্তু জানোয়ারের হাত থেকে বাঁচার জন্য মানুষ যুদ্ধ করত। আর এখন মানুষ যুদ্ধ করে নিজের ক্ষমতা আর অস্তিত্বের অস্তিত্ব এবং নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য। পাশাপাশি অন্যকে করংস করার জন্য, অন্যের সম্পদ দখল করার জন্য ও অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্যে মানুষ যুদ্ধ করেছে। এছাড়া সম্প্রসারণশীলতার জন্য ভয়ানক যুদ্ধের উদাহরণ বিশ শতকের দুটি বিশ্বযুদ্ধ। মানুষ হিংসা ঘেঁষ, লোভ লালসার বশবর্তী হয়েও এখন যুদ্ধ করেছে।

যুদ্ধের ফলাফল: যুদ্ধের ফলাফল কখনো ভালো হয় না। যুদ্ধের ফলে অগণিত মানুষ জনপদ ধ্বংসের পাশাপাশি দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি আজ যুদ্ধের ভয়াবহতা ও ধ্বংসলীলা বাড়িয়ে দিয়েছে আধুনিক সমরাজ্ঞ নির্মাণ করে। এজন্য বর্তমানে যুদ্ধবিগ্রহের ক্ষয়ক্ষতি মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী। আর আমেরিকা ও রাশিয়া অনবরত মেতে আছে শক্তির মদমত্তায়। নিজের শক্তির প্রকাশ ও আধিপত্য বিস্তারের জন্য আমেরিকা প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করেছে বিভিন্ন দেশের সাথে। নতুন নতুন মারণাস্ত্র আবিষ্কার ও এর বিস্তারেও নিয়োজিত আছে আমেরিকা। আফগানিস্তানে ও ইরাকে অসংখ্য লোককে মেরে ফেলেছে। জনপদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্থাপত্যশিল্প ধ্বংস করেছে আমেরিকা। এখানে মানবতার চরম অবমূল্যায়ন করেছে আমেরিকা। তেমনি ১৯৭১ সালেও পাকিস্তানীরা ৩০ লাখ মানুষকে হত্য করেছিল। যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞে আজ পুরো সভ্যতা বিপর্যস্ত। যুদ্ধের ধ্বংসলীলায় মানুষের যে ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে তা বর্ণনাতীত।

বিশ্ব পরিস্থিতির পরিবর্তন:

"তাই আমি চেয়ে দেখি প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত ধরে

ধরে দানবের সাথে আজ সংগ্রামের তরে"

- সুকান্ত ভট্টাচার্য

কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী দানবকে রাখবে কে? বর্তমান এককেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্মে পৃথিবী এখন মানুষের হাতের নাগালে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে একসময় সূর্য অস্ত যেত না। কিন্তু আজ সেসবই ইতিহাসমাত্র। বলশেভিক বিপ্লবের দুনিয়া কাঁপানো আওয়াজ একদিন সারা বিশ্বের শোষিত ও নিপীড়িত মানুষকে জাগিয়ে ভুলেছিল মুক্তির আকাঙ্ক্ষায়। কিন্তু অমিত ক্ষমতার অধিকার সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন সে স্বপ্নকে নির্বাসিত করেছে। Time you old Gypsyman-এর মতে, সময় এখন আমেরিকার, বিশ্বের একক ক্ষমতাবাহী শক্তি, দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, শাসিয়ে বেড়াচ্ছে সারা বিশ্বকে। এ মুহূর্তে বিশ্বের সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা এক বিশ্বকেন্দ্রিক। প্রযুক্তির উৎকর্ষে সামরিক ক্ষেত্রেই এসেছে বিরাট পরিবর্তন। তাই আমেরিকার বেড়লিতে সারা বিশ্ব ভয়ে চুপ, প্রতিবাদ করলেই সাদামের মতো টুটি চেপে ধরবে। কিন্তু সভ্যতার রঙ্গমঞ্চে এ প্রেতনৃত্য করে বন্ধ হবে তা কী কেউ জানে?

বিগত যুদ্ধের অভিজ্ঞতা: সভ্যতার চলমানতায় মানুষ আপন ধীশক্তি দিয়ে খুঁজে নিল অজ্ঞাত শক্তির উৎস। ক্রমে সে হয়ে উঠল দানবীয় শক্তির অধিকারী। বিশ শতকে পরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ করল সেই দানবীয় শক্তির তাণ্ডব। জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকির মানুষ আজ ভুলতে পারে না সেই দুঃস্বপ্নের দিনগুলোকে। চোখের পলকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় জনপদ, কলসে যায় মানবতা, শিহরিত হয় গোটা বিশ্ববিবেক। বেদনায় আতর্নাদ করে ওঠে পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষ।

বিগত যুদ্ধের বিভীষিকা: বিশ শতকেই ঘটেছে দুই ভয়াবহ মহাযুদ্ধ প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৫-১৯১৯ এবং ১৯৩৯-১৯৪৫)। এ যুদ্ধ অভীতের সব যুদ্ধকে ছাপিয়ে গেছে। কারণ এর বিস্তৃতি ঘটে গোটা বিশ্বময়। পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো কাঁপিয়ে পড়েছিল এক মরণ-যজ্ঞে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছিল বোমারু বিমান ও আধুনিক সমরাজ্ঞ সজ্জিত যুদ্ধ জাহাজ। নিহত হয়েছিল সামরিক ও অসামরিক স্তরের চার কোটি চৌদ্দো লক্ষ পর্যট্রিশ হাজার মানুষ। বিকলাঙ্গ হয়েছিল আরো দু কোটি মানুষ। সম্পদ ধ্বংস হয়েছিল তিরিশ বিলিয়ন ডলারের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত মানুষের সংখ্যা সর্বকালের রেকর্ড অতিক্রম করেছে। এ যুদ্ধে পাঁচ কোটি চল্লিশ লক্ষ মানুষের প্রাণ সংহার করে। বিকলাঙ্গ করে নয় কোটি মানুষকে। সম্পদ নষ্ট হয় চারশ বিলিয়ন ডলারের।

এ যুদ্ধে মানবসভ্যতার ইতিহাসে ঘণ্যতম আণবিক বোমা ব্যবহৃত হয় ১৯৪৫ সালের ৬ই এবং ৯ই আগস্ট জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে। চোখের পলকে দাউ দাউ আগুনে জ্বলে যায় দুটি সম্পদ সমৃদ্ধ জনপদ। তেজস্ক্রিয় বিষবাস্প ছড়িয়ে পড়ে শহরে গ্রামে। ধ্বংসের প্রলয়ঙ্কর রূপ দেখে শিহরিত হয় বিশ্ববিবেক। আতর্নাদ করে ওঠে পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষ।

অশান্ত বিশ্ব পরিস্থিতি: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ভিয়েতনাম যুদ্ধের দুঃসহ স্মৃতি এখনো মার্কিনীদের মনে কাঁটার মতো বিদ্ধ হয়। পাক-ভারত যুদ্ধ (১৯৬০), ইরান-ইরাক (১৩ বছর ব্যাপী), আফগানিস্তানের ভয়াবহত। আমাদের শান্তিকামী করে তোলে। সোমালিয়ার ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় প্রচণ্ডভাবে বিশ্ববিবেককে নাড়া দেয়। ফিলিস্তিনের প্রতিটি শিশুর অসহায় আতর্নাদ বিশ্ব বিবেককে নাড়া দিলেও শ্যারনের পাষণ হৃদয় এজিদের মতো রক্তের হোলিখেলায় নেচে ওঠে। সারাবিশ্বে চলছে ভয়াবহ এক অশান্ত পরিস্থিতি, মার্কিনি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি গোট পৃথিবীকে গিলে খাবার মতলবে আছে। সম্প্রতি শেষ হলো ইরাক যুদ্ধ। আফগানিস্তানের মাটি ক্লাস্টার বোমার আঘাতে অঙ্গর হয়েছে। লাশের গল্পে শকুনের উল্লাস বেড়েছে। তেমনি ইরাকের জনগনের তথাকথিত মুক্তির স্লোগানে লুটপাট হয়েছে সাড়ে পাঁচ হাজার বছরের সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন, ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে আধুনিক সভ্যতা। আধুনিক প্রযুক্তি মিসাইলের আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়েছে অসহায় শিশুর হাত, বুক ও দেহ। লাশের স্তুপে দাড়িয়ে মার্কিনি ট্যাংক মুক্তির পতাকা উড়িয়েছে। সে পতাকা ইরাকের নয়, মার্কিনের। ইরাক আর ইরাক নেই, নব্য আমেরিকা যেন। ইরাক এখন আমেরিকার নতুন উপনিবেশ।

আধুনিক সমরাজ্ঞের ভয়াবহতাঃ মানবসভ্যতা আজ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশংকায় কম্পমান। সারাবিশ্বে যুদ্ধবাজদের যুদ্ধ প্রস্তুতি সাধারণ নিরীহ মানুষদের আতংকের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। পৃথিবীর শক্তিদর রাষ্ট্রগুলোর হাতে ভয়ানক সব মারণাস্ত্র সারা বিশ্বে মজুদ আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত বিস্ফোরণের চেয়ে দশ হাজার গুণ বেশি বিস্ফোরক। আণবিক বোমার চেয়ে চার প্রজারগুণ শক্তিশালী বোমার সংখ্যা এখন পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার। যুদ্ধ এখন জল ও স্থলের সীমানা ছাড়িয়ে আকাশে, গ্রহে ও উপগ্রহে। রাডারকে ফাঁকি দিয়ে মানুষ এখন উপগ্রহ, স্যাটেলাইটের মাধ্যমে গোয়েন্দাগিরি চালায়। দূরপাল্লার মিসাইল, আণবিক যুদ্ধজাহাজ, ভয়ংকর সব যুদ্ধ বিমান প্রস্তুত সভ্যতাকে ধ্বংসের জন্য। একটি মাত্র সুইচ টিপ দিলে কয়েক হাজার মাইল দূরের একটি সভ্যতা নিমিষেই ধূলিসাৎ হয়ে যেতে পারে।

পারমাণবিক বোমা: আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম ভয়ংকর আবিষ্কার পারমাণবিক অস্ত্র। আর যুদ্ধক্ষেত্রে এই পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার যে কতটা ভয়াবহ, তার প্রমাণ পাওয়া যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিশ বছর পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৪৫ সালের ৬৬৯ আগস্ট জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে পরমাণবিক বোমা বীভৎস আকার ধারণ করে। ভাগনিত মানুষের লাশ ও মানুষের অঙ্গহানি থেকে এটা বোঝা যায়, আজও মানুষ এর প্রভাব বহন করে চলেছে। এরপর থেকে শুরু হয় পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির এক মহা প্রতিযোগিতা।

যুদ্ধ নয় শান্তি: যুদ্ধ কোনো সাধারণ মানুষ কামনা করে না। সাধারণ মানুষ চায় যুদ্ধমুক্ত একটি সুন্দর ও শান্তির স্থান। শান্তি স্থাপনের জন্য তাই আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। অস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা ও অস্ত্রের ব্যবসা প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে। বিজ্ঞানকে যুদ্ধাস্ত্র তৈরিতে ব্যবহার না করে মানুষের কলয়নে নিয়োজিত করতে হবে। বর্ণবিদ্বেষ ও জাতিগত বিদ্বেষ দূর করে আমাদেরকে উদার মনের অধিকারী হতে হবে। পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এখন জাতিসংঘ কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কথা চিন্তা করে যুদ্ধ পরিহার করা উচিত।

যুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান: জাতিসংঘের সহযোগিতায় শান্তিকামী মানুষেরা 'যুদ্ধ নয় শান্তি চাই' স্লোগানে একই পতাকাতলে সমবেত হয়েছে। তাদের সাথে যোগ দিয়ে যুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে বিশ্বখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বিজ্ঞানী ও দার্শনিক। বিশ্ব শান্তির জন্য প্রতিবছর বিশেষ বাড়িকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হচ্ছে। দেশে দেশে ইত্তকের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ জনতার যুদ্ধবিরোধী স্লোগান শান্তির কথা বলে। বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ আবার একই ছায়াতলে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন, বৌমারেটলা আরি ককসে, ম্যাক্সিম গোর্কী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ সোচ্চার নারীঘাতী ও শিশুঘাতী কুৎসিত যুদ্ধের বিরুদ্ধে। শিল্পীর তুলিতে, কবির কবিতায়, গানের সুরে, জীবনের উদ্দামতায় আজ ধ্বনিত হচ্ছে শান্তির বীজমন্ত্র।

বিশ্বশান্তি ও বাংলাদেশ: বাংলাদেশ সবসময়ই মধ্যপন্থী একটি শান্তিকামী দেশ। জাতিসংঘের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ সবসময়ই চেষ্টা করে ঐক্য ও শান্তি ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করার। যুদ্ধ নয় শান্তির এ আন্দোলনে বাংলাদেশের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ নিজেকে জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। বেড়েছে তার কণ্ঠস্বরের মর্যাদা। বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বিবদমান বিশ্বে শান্তি স্থাপনে ছিলেন উৎসাহী। রাষ্ট্রে রাষ্ট্র সহযোগিতা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, শান্তি, মৈত্রী ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা, অন্য রাষ্ট্রের বৈদেশিক বা অভ্যন্তরীণ নীতিতে হস্তক্ষেপ না করা ইত্যাদি হচ্ছে বর্তমানে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি। তাই বিশ্বের কোথাও যুদ্ধের ক্ষীণতম সম্ভাবনা সৃষ্টি হলে বাংলাদেশ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে।

১৯৮৬ সালকে বিশ্ব-শান্তিবর্ষ হিসেবে ঘোষণা: পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা আজ এক উদ্বেগজনক অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। বিশ্ব সামরিক খাতে ব্যয়বরাদ্দ বাড়ছে। অস্ত্র নির্মাণে ঢালাওভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি। এ ছাড়া গোটা বিশ্বে নানারকম সংঘাত, যুদ্ধ, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, অনাহার, রোগভোগ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত মানুষ। তাই জাতিসংঘের মন্ত্রসচিব ১৯৮৬ সালকে ঘোষণা করেছিলেন। আন্তর্জাতিক শান্তিবর্ষ'রূপে। এর ফলে রাষ্ট্রসংঘের সব সদস্যরাষ্ট্র ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনগুলো শান্তির সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পথ নির্দেশ করার সুযোগ পেয়েছে বিশ্ববাসীও জাতিসংঘের এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। সম্প্রতি আমেরিকার দ্বিতীয় বারের মতো ইরাক আক্রমণে বিশ্ব শান্তি আবারও সংকটের মুখে। আফগানিস্তান আক্রমণের মধ্যে দিয়ে সাহাজ্যবাদী এ দেশটির ফ্যাসিবাদী কার্যক্রম শুরু হয়েছে। অন্যান্য দেশগুলো প্রতিবাদ করছেই না বরং নানাভাবে ইন্ধন জোগাচ্ছে। সবচেয়ে শঙ্কার বিষয় খোদ মার্কিনর এ অন্যায় আক্রমণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেও খোদ জাতিসংঘ এবারও কাঠের পুতুলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এসব প্রেক্ষাপটে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় বিশ্ববাসী এর বিরুদ্ধে জোর জনমত গড়ে তুলেছে। কেবল 'শান্তি বর্ষ' ঘোষণা দিয়ে প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এজন্য জাতিসংঘকে নিতে হবে সাহসী ভূমিকা। বিশ্বশান্তি রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত এ প্রতিষ্ঠানটির নিকট সবাই এমনটিই প্রত্যাশা করে।

উপসংহার: যুদ্ধ মানেই ধ্বংস। যুদ্ধ মানেই দুর্ভিক্ষ, উপবাস, মৃত্যু। যুদ্ধ মানেই রক্তের হোলিখেলা, লাশের স্তুপ ও সাভার বিনাশ। পৃথিবীবাসী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে ধ্বংস, মুক্ত, মহামহত্ত্বের রক্তাক্ত আঙ্গাদ পেয়েছে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হলে তা হবে আরও ভয়াবহ। মানুষ আজ প্রতিবাদমুখর যুদ্ধবাজ অস্ত্র ব্যবসায়ীদের ঘৃণ্য চক্রান্ত রুখতে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে গোটা বিশ্ববাসী আজ প্রতিরোধী সৈনিক, শান্তির জাগ্রত প্রহরী। তাই যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশ্ব আজ সোচ্চার, শান্তির পক্ষে পালন করছে অগ্রণী ভূমিকা। বিশ্বজুড়ে মানুষের সম্মিলিত শুভবুদ্ধির প্রতিরোধমূলক তৎপরতায় যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আজ প্রতিহত, নিষ্ক্রিয় হতে চলেছে। শেষ বেলায় তাই কবি আহসান হাবিবের কণ্ঠে বলতে চাই-

"আমাকে সেই অস্ত্র ফিরিয়ে দাও

সভ্যতার সেই প্রতিশ্রুতি

সেই অমোঘ অনন্য

অস্ত্র আমাকে ফিরিয়ে দাও।



মডেল ২

লিখিত প্রশ্ন

(১)

(ক) উদাহরণসহ 'ম-ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লেখো।

- উত্তরঃ ১. শব্দের প্রথমে ম-ফলা থাকলে ম-ফলা উচ্চারণ হয় না। যেমনঃ স্মরণ > শৌরণ, শ্মশান > শঁশান, ইত্যাদি।
২. শব্দের মাঝখানে ম-ফলা থাকলে ম-ফলার উচ্চারণ হয় না। যেমনঃ বিস্ময় > বিশশৌয়।
৩. শব্দের শেষে ম-ফলা থাকলে ম-ফলা উচ্চারণ হয় না। যেমনঃ গ্রীষ্ম > গ্রিশশৌ, পদ্ম > পদদৌ।
৪. ন, ট, ং, গ, ণ, ম, ল- এ বর্ণগুলোর যে কোন বর্ণের সঙ্গে ম-ফলা যুক্ত হলে ম-ফলা উচ্চারণ হয়। যেমনঃ বাগ্মী > বাগমি, জন্ম > জনমৌ।
৫. যুক্তব্যঞ্জনের সঙ্গে ম-ফলা যুক্ত হলে, ম-ফলা উচ্চারণ হয় না। যেমনঃ যক্ষা > জোকখা, লক্ষন > লকখোন ইত্যাদি।

আরো কয়েকটি নিয়মঃ

ম-ফলার উচ্চারণ

- ক. পদের প্রথমে ম-ফলা থাকলে সে বর্ণের উচ্চারণে কিছুটা ঝাঁক পড়ে এবং সামান্য নাসিক্যস্বর হয়। যেমন : শ্মশান (শঁশান), স্মরণ (শঁরোন)। কখনো কখনো 'ম' অনুচ্চারিত থাকতেও পারে। যেমন : স্মৃতি (স্মৃতি বা স্মৃতি)।
খ. পদের মধ্যে বা শেষে ম-ফলা যুক্ত হলে উচ্চারণে সে বর্ণের দ্বিত্ব হয় এবং সামান্য নাসিক্যস্বর হয়। যেমন : আত্মীয় (আতিঁয়ৌ), পদ্ম (পদৌঁ), বিস্ময় (বিশশঁয়), ভস্মস্তূপ (ভশৌস্তূপ), ভম (ভশৌঁ), রশ্মি (রোশি)।
গ. গ, ঙ, ট, ণ, ন বা ল বর্ণের সঙ্গে ম-ফলা যুক্ত হলে, ম-এর উচ্চারণ বজায় থাকে। যুক্ত ব্যঞ্জনের প্রথম বর্ণের স্বর লুপ্ত হয়। যেমন : বাগ্মী (বাগমি), মৃন্ময় (মৃন্ময়), জন্ম (জন্মৌ), গুল্ম (গুল্মৌ)

অথবা

(খ) নিচের যেকোনো পাঁচটি শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ লেখো :

বিজ্ঞান

উত্তরঃ বিজ্ঞান = বিগ্গ্যান্

ঐতিহ্য

উত্তরঃ ঐতিহ্য = ওইতিজ্ঝৌ

শ্রাবণ

উত্তরঃ শ্রাবণ = শ্রাবোন্

স্বরাজ

উত্তরঃ স্বরাজ = শরাজ্

ব্যাকরণ

উত্তরঃ ব্যাকরণ = ব্যাক্করোন্

মর্যাদা

উত্তরঃ মর্যাদা = মোর্জাদা

স্মরণীয়

উত্তরঃ স্মরণীয় = শঁরোনियो

ঔপন্যাসিক

উত্তরঃ ঔপন্যাসিক = ওউপোন্নাশিক্

(১১)

(ক) কিশোর গ্যাংগের সমস্যা বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ লেখো।

উত্তরঃ কিশোর গ্যাং কালচার এবং এর প্রতিকার নিয়ে দুই বন্ধু—রাফি ও সিয়ামের মধ্যে একটি সংলাপ নিচে দেওয়া হলো:

রাফি: শুভ অপরাহু সিয়াম! কী খবর তোর? এত গম্ভীর হয়ে কী ভাবছিস?

সিয়াম: শুভ অপরাহু রাফি। আসলে গতকাল আমাদের এলাকার মোড়ে কিশোর গ্যাংয়ের দুপক্ষের মারামারি দেখলাম। সেটা নিয়েই ভাবছি। দিন দিন এরা বড্ড বেপরোয়া হয়ে উঠছে।

রাফি: ঠিক বলেছিস। আজকাল পত্রিকায় চোখ রাখলেই কিশোর গ্যাংয়ের নানা অপরাধের খবর দেখা যায়। চুরি, ছিনতাই থেকে শুরু করে মাদক ব্যবসা এবং খুনের মতো মারাত্মক অপরাধেও এরা জড়িয়ে পড়ছে।

সিয়াম: আমার তো অবাক লাগে, এত ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কীভাবে এই অপরাধের জগতে পা বাড়াচ্ছে! এদের তো এখন স্কুলে থাকার কথা, মাঠে খেলাধুলা করার কথা।

রাফি: এর পেছনে অনেকগুলো কারণ আছে সিয়াম। প্রথমত, পারিবারিক সুশিক্ষার অভাব এবং বাবা-মায়ের অসচেতনতা। অনেক পরিবারেই সন্তানদের খোঁজখবর ঠিকমতো নেওয়া হয় না।

সিয়াম: একদম ঠিক। এর সাথে যুক্ত হয়েছে প্রযুক্তির অপব্যবহার। ইন্টারনেটে বিভিন্ন আপত্তিকর কন্টেন্ট এবং গ্যাংস্টার কালচারের সিনেমা দেখে ওরা প্রভাবিত হচ্ছে। আবার অনেক সময় দেখা যায়, স্থানীয় কিছু বড় ভাই বা রাজনৈতিক নেতা নিজেদের স্বার্থে এদের ব্যবহার করে।

রাফি: একদম সত্যি কথা। ওই তথাকথিত বড় ভাইয়েরাই এদের হাতে অস্ত্র আর মাদক তুলে দেয়। ফলে এই কিশোরেরা একসময় নিজেদের আইন-কানূনের উর্ধ্বে ভাবতে শুরু করে।

সিয়াম: কিন্তু এভাবে চলতে থাকলে তো আমাদের সমাজটাই ধ্বংস হয়ে যাবে। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কী বলতো?

রাফি: এর জন্য সবার আগে পরিবারকে এগিয়ে আসতে হবে। বাবা-মাকে সন্তানের বন্ধু হতে হবে, তারা কার সাথে মিশছে, কোথায় যাচ্ছে—সেসবের খেয়াল রাখতে হবে।

সিয়াম: হ্যাঁ, আর আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সামাজিক সংগঠনগুলোরও বড় ভূমিকা আছে। কিশোরদের জন্য পর্যাপ্ত খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার।

রাফি: আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকেও কঠোর হতে হবে। তবে শুধু শাস্তি দিলেই হবে না, অপরাধে জড়িয়ে পড়া কিশোরদের সংশোধনের জন্য বেশি বেশি কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে।

সিয়াম: চমৎকার বলেছিস রাফি। জনসচেতনতা ছাড়া এই সামাজিক ব্যাধি দূর করা সম্ভব নয়। চল, আজ বিকেলে আমাদের ক্লাবের বন্ধুদের সাথে এ বিষয়ে একটা সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন করার ব্যাপারে কথা বলি।

রাফি: খুব ভালো উদ্যোগ সিয়াম! চল, এখনই লাইব্রেরির দিকে যাই আর বাকিদের সাথে আলোচনা করি।
সিয়াম: চল, যাওয়া যাক।

অথবা

(খ) 'এক বিকেলে' শিরোনামে একটি খুদে গল্প রচনা করো।

উত্তরঃ

এক বিকেলে

চারতলার বারান্দায় রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ছিল মিতু। আকাশটা কেমন যেন মেঘলা হয়ে আছে। বাতাসে একটা ভেজা মাটির গন্ধ, যা জানান দিচ্ছে একটু পরেই হয়তো বুম বৃষ্টি নামবে। মিতুর হাতে এক কাপ ধোঁয়া ওঠা চা। চায়ের কাপ থেকে ওড়া ভাপ যেন ওর মনের ভেতর জমে থাকা একরাশ স্মৃতির মতো বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে।

ঠিক এই সময়েই রাস্তা দিয়ে এক বৃদ্ধ ফেরিওয়ালাকে হেঁটে যেতে দেখল মিতু। বৃদ্ধের মাথায় একটা বুড়ি, তাতে থরে থরে সাজানো লাল, নীল, হলুদ কাচের চুড়ি। সেই বনবান শব্দটা মিতুকে এক ঝটকায় টেনে নিয়ে গেল তার ফেলে আসা ছোটবেলার দিনগুলোতে। ঠিক এভাবেই কোনো এক মেঘলা বিকেলে গ্রামের বাড়ির উঠানে চুড়িওয়ালার ডাক শুনে ও আর ওর ছোট বোন টুপুর দৌড়ে যেত। মা তখন হাসিমুখে ওদের পছন্দের চুড়ি কিনে দিতেন।

হঠাৎ এক ফোঁটা ঠাণ্ডা বৃষ্টি মিতুর গালে এসে পড়ল। ও ভাবনার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে এল। দেখল, নিচের রাস্তায় একদল ছোট বাচ্চা কাগজের নৌকা বানানোর জন্য ছটফট করছে। বৃষ্টির প্রথম পশলা নামতেই তারা আনন্দে চিৎকার করে উঠল।

মিতু আলতো করে হাসল। ব্যস্ত শহরের যান্ত্রিক জীবনের মাঝে এই একটি বিকেল যেন তাকে এক চিলতে শান্তির ছোঁয়া দিয়ে গেল। সে চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে মনে মনে বলল, "কিছু বিকেল সত্যিই খুব জাদুকরী হয়, যা বৃদ্ধের ভেতর জমে থাকা ধুলোবালি নিমেষেই ধুয়ে দেয়।"

(১০)

(ক) সারমর্ম লেখো :

বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মো প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।

দুঃখ-তাপে ব্যথিত চিতে নাই-বা দিলে সাঙ্ঘনা,
দুঃখ যেন করিতে পারি জয়।

সহায় মোর না যদি জুটে, নিজের বল না যেন টুটে,
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।

আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা তরিতে পারি শকতি যেন রয়।

উত্তরঃ **সারমর্ম:** সংসারে বিপদ, দুঃখ, তাপ, ক্ষয়-ক্ষতি, বঞ্চনা সবই আছে। এসব কিছুতে মনোবল না হারিয়ে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে জীবনের নানা সংকট মোকাবিলা করতে হয়।

(খ) ভাবসম্প্রসারণ করো :

দাও ফিরিয়ে সে অরণ্য, লও এ নগর।

উত্তরঃ **মূল ভাব:** এই বাক্যটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতার অংশ, যেখানে কবি প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সহজ, স্বাভাবিক ও শান্তিপূর্ণ জীবন ফিরে পেতে চান। তিনি যান্ত্রিক নগরজীবনের কৃত্রিমতা ও অবসাদ

ছেড়ে প্রাকৃতিক জীবনের সরলতা ও প্রশান্তি কামনা করছেন।

ভাব-সম্প্রসারণ: আধুনিক সভ্যতার নগর জীবন মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করেছে। এখানে মানুষের জীবন কৃত্রিম, ব্যস্ত ও আত্মকেন্দ্রিক। প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন এই জীবন মানসিক শান্তি ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত। মানুষ এখানে প্রতিনিয়ত প্রতিযোগিতা, ক্লান্তি ও অস্থিরতার মধ্যে বসবাস করে। কবি এই যান্ত্রিক নগরজীবনের পরিবর্তে চেয়েছেন প্রকৃতির কোলে ফিরে যেতে-সেই সবুজ অরণ্যে, যেখানে জীবন ছিল সহজ, শান্ত এবং নির্মল। অরণ্যজীবনে ছিল প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মেলবন্ধন, ছিল প্রাণের ছোঁয়া, ছিল সজীবতা ও মানবিকতা।

এই পঙক্তিতে কবি যেন আহ্বান জানাচ্ছেন-

"আমাকে দাও সেই স্বতঃস্ফূর্ত, সজীব প্রকৃতিজীবন;

নিয়ে যাও এই নিষ্প্রাণ, কৃত্রিম নগরজীবন।"

সারাংশ: এই পঙক্তির মাধ্যমে কবি প্রকৃতির সহজ-সরল জীবন ফিরে পেতে চান এবং যান্ত্রিক নগরসভ্যতার কৃত্রিমতা ত্যাগ করতে আহ্বান জানান।

(৯)

(ক) সামাজিক মাধ্যমে অধিক সময় না দেওয়ার জন্য ছোটো ভাইকে উপদেশ দিয়ে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি প্রেরণ করো।

উত্তর: **বিষয়:** সামাজিক মাধ্যমে অতিরিক্ত সময় কাটানোর অপকারিতা ও কিছু পরামর্শ।

প্রিয় [ভাইয়ের নাম],

আশা করি তুমি ভালো আছো। অনেক দিন তোমার সাথে সরাসরি কথা হয় না। ইদানীং লক্ষ্য করছি তুমি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেক বেশি সময় দিচ্ছো। একজন শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে তোমাকে কিছু কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি।

ভার্চুয়াল জগৎ আকর্ষণীয় হলেও এটি আমাদের অজান্তেই অনেক ক্ষতি করে। অতিরিক্ত সময় স্ক্রিনে থাকিয়ে থাকলে চোখের ক্ষতি হয়। এটি তোমার পড়াশোনা এবং মূল্যবান সময় নষ্ট করছে। বাস্তব জীবনের বন্ধু ও পরিবারের সাথে দূরত্ব তৈরি করছে।

আমি চাই তুমি এখন থেকেই এই অভ্যাসটি নিয়ন্ত্রণ করো। নিচের পদক্ষেপগুলো তোমাকে সাহায্য করতে পারে:

- **সময়সীমা নির্ধারণ:** প্রতিদিন সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের একটি নির্দিষ্ট সময় (যেমন ৩০ মিনিট) ঠিক করো।
- **বিজ্ঞপ্তি বন্ধ:** অ্যাপের নোটিফিকেশন বন্ধ রাখো যাতে বারবার ফোনের দিকে তাকাতে না হয়।
- **বিকল্প তৈরি:** অবসর সময়ে বই পড়ো, খেলাধুলা করো বা নতুন কোনো স্কিল শেখো।

তোমার ভবিষ্যৎ গঠনে এই সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আশা করি তুমি আমার পরামর্শটি ইতিবাচকভাবে নেবে। নিজের যত্ন নিও।

ইতি,

তোমার [তোমার নাম/বড় ভাই]

অথবা

(খ) তোমার এলাকায় ডেপুজুর প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানিয়ে পৌরসভা মেয়র অথবা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের কাছে একটি আবেদনপত্র লেখো।

উত্তর: ২৫.০৬.২০২৫

চেয়ারম্যান,

১১ নং দক্ষিণ গোহাট ইউনিয়ন,

কচুয়া, চাঁদপুর।

বিষয়: এডিস মশা নিধনের জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধের আবেদন।

জনাব,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমাদের ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে হঠাৎ করে এডিস মশার প্রভাবে ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। গত সাত দিনের মধ্যে ডেঙ্গুজ্বরে মৃতের সংখ্যা বিশেষ মতো পৌঁছেছে। বহু মানুষ চিকিৎসা নিচ্ছে, তবে সমস্যা থেকে মুক্তি মিলছে না। এতে এলাকাবাসী ভীষণ আতঙ্কিত। এছাড়া একটি মজা পুকুরের কারণে সাধারণ মশার সমস্যা ও বেড়েছে।

এসব পরিস্থিতিতে ডেঙ্গুজ্বর প্রতিরোধ এবং এডিস মশাসহ অন্যান্য মশার উপদ্রব কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহের মাধ্যমে আমাদের সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করছি।

আপনার দ্রুত পদক্ষেপে এলাকাবাসী স্বস্তি পাবেন বলে আমরা আশা করি।

নিবেদক,

এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে,

মোঃ আবু জাফর

১১ নং দক্ষিণ গোহাট ইউনিয়ন,

কচুয়া, চাঁদপুর।

(৮)

(ক) কোনো একটি ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের দিনলিপি তৈরি করো।

উত্তরঃ তারিখ: ১২ জানুয়ারি ২০২৫, শুক্রবার

স্থান: মহাস্থানগড়, বগুড়া

সময়: সকাল ৭টা - সন্ধ্যা ৬টা

আজকের দিনটি আমার জীবনে এক স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে। সকালে খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে আমরা সবাই মিলে রওনা দিলাম বগুড়ার মহাস্থানগড়ের উদ্দেশ্যে। এটি বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান, যা প্রায় ২,৫০০ বছরের পুরনো। বাসে বসে যেতে যেতে আমি মহাস্থানগড় সম্পর্কে পড়ে নিচ্ছিলাম — এটি প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন নগরীর ধ্বংসাবশেষ।

সকাল ১০টার দিকে আমরা গন্তব্যে পৌঁছাই। বিশাল প্রাচীর, খনন করা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, এবং লাল মাটির টিবিগুলো দেখে আমি অভিভূত হয়ে যাই। গাইড আমাদের বললেন, এই স্থানেই একসময় রাজা বঙ্গাল সেনের রাজত্ব ছিল, এবং এখানে বহু রাজা-বাদশাহর পায়ের চিহ্ন রয়েছে।

সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে গোকুল মেধ নামের স্থানটি। এটি ছিল একটি বৌদ্ধ স্তূপ, যেখানে অনেক কক্ষবিশিষ্ট ইটের কাঠামো দেখা যায়। আমরা মিউজিয়ামেও গিয়েছিলাম, যেখানে অনেক প্রাচীন মুদ্রা, পাত্র, মূর্তি ও অস্ত্র সংরক্ষিত আছে। এসব দেখে মনে হচ্ছিল, আমি যেন ইতিহাসের পাতার ভেতরে হাঁটছি।

দুপুরে ঐতিহ্যবাহী খাবার খেয়ে আবার কিছু জায়গা ঘুরে দেখলাম। বিকেলে সূর্য যখন পশ্চিমে ঢলে পড়ছিল, তখন প্রাচীন প্রাচীরের উপর দাঁড়িয়ে আমি ভাবছিলাম— কালের সাক্ষী হয়ে এই স্থান কত ইতিহাস দেখেছে!

সন্ধ্যায় আমরা ঢাকায় ফেরার জন্য রওনা দিলাম। সারাদিনের ক্লান্তি থাকলেও মনে ছিল অপার আনন্দ ও কৌতূহল। আজকের এই ভ্রমণ আমাকে বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে সাহায্য করেছে।

মহাস্থানগড় ভ্রমণের এই অভিজ্ঞতা আমার মনে ইতিহাস, গর্ব ও জ্ঞানচর্চার এক নতুন দ্বার খুলে দিয়েছে। ভবিষ্যতে আরও ঐতিহাসিক স্থান ঘুরে দেখার ইচ্ছা রইল।

অথবা

(খ) 'যানজট একটি ভয়াবহ সমস্যা'- শিরোনামে প্রতিবেদন রচনা করো।

উত্তরঃ নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা :

১২ জুন, ২০২৬

বর্তমান সময়ে দেশের শহরাঞ্চল, বিশেষ করে রাজধানী ঢাকার বাসিন্দাদের জন্য সবচেয়ে বড় যন্ত্রণার নাম যানজট। প্রতিদিন লাখ লাখ মানুষ এই যানজটের কারণে রাস্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বন্দি থাকছেন। এটি কেবল একটি সাধারণ সমস্যা নয়, বরং দেশের অর্থনীতি, জনস্বাস্থ্য এবং মানসিক শান্তির ওপর এক ভয়াবহ আঘাত।

যানজটের মূল কারণসমূহ

ক্রটিপূর্ণ ট্রাফিক ব্যবস্থা: দেশের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এখনো আধুনিক ও সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় করা সম্ভব হয়নি।

যানবাহনের অতিরিক্ত চাপ: রাস্তার তুলনায় ব্যক্তিগত গাড়ি ও গণপরিবহনের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অবৈধ পার্কিং: প্রধান সড়কগুলোর দুই পাশে যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং রাস্তা সংকুচিত করে তুলছে।

ফুটপাথ দখল: হকারদের ফুটপাথ দখলের কারণে পথচারীরা মূল সড়কে হাঁটতে বাধ্য হন, যা গতি কমিয়ে দেয়।

সড়ক খনন ও সংস্কার: বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার সমন্বয়হীন রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি যানজটকে তীব্র করে তোলে।

ভয়াবহ প্রভাব

অর্থনৈতিক ক্ষতি: যানজটের কারণে প্রতিদিন লাখ লাখ কর্মঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে। কোটি কোটি টাকার জ্বালানি অপচয় হচ্ছে, যা জাতীয় অর্থনীতিতে বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

স্বাস্থ্যঝুঁকি: রাস্তায় দীর্ঘ সময় আটকে থাকায় মানুষের মধ্যে মানসিক চাপ, বিষণ্ণতা এবং হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ছে। গাড়ির কালো ধোঁয়া বায়ুদূষণ তীব্র করছে।

জরুরি সেবায় বিঘ্ন: অ্যাম্বুলেন্স কিংবা ফায়ার সার্ভিসের মতো জরুরি যানবাহন সময়মতো গন্তব্যে পৌঁছাতে পারছে না। ফলে অকালেই ঝরে যাচ্ছে অনেক প্রাণ।

উত্তরণের উপায়

গণপরিবহনের উন্নয়ন: ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার কমিয়ে মানসম্মত ও সুশৃঙ্খল গণপরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

আইনের কঠোর প্রয়োগ: ট্রাফিক আইন অমান্যকারী এবং অবৈধ পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে।

সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা: বিভিন্ন সেবামূলক সংস্থার মধ্যে সমন্বয় বজায় রেখে রাস্তা সংস্কারের কাজ দ্রুত শেষ করা জরুরি।

ঢাকার বিকেন্দ্রীকরণ: সব প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম রাজধানী কেন্দ্রিক না করে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে হবে।

যানজটমুক্ত সচল শহর গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি। সরকারের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার পাশাপাশি নাগরিকদের সচেতনতা ও ট্রাফিক আইন মেনে চলার মানসিকতাই পারে এই ভয়াবহ সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে।

(৭)

(ক) নিচের যেকোনো দশটি শব্দের পারিভাষিক রূপ লেখো:

অথবা

Pioneer

উত্তরঃ **Pioneer** = পথিকৃৎ

Remark

উত্তরঃ **Remark** = মন্তব্য

Worship

উত্তরঃ **Worship** = পূজা

Feudal

উত্তরঃ **Feudal** = সামন্ততান্ত্রিক

Idealism

উত্তরঃ **Idealism** = ভাববাদ

Ordinance

উত্তরঃ **Ordinance** = অধ্যাদেশ

Para

উত্তরঃ **Para** = অনুচ্ছেদ

Vision

উত্তরঃ **Vision** = দৃষ্টি/রূপকল্প

Fiction

উত্তরঃ **Fiction** = কথাসাহিত্য

Grant

উত্তরঃ **Grant** = অনুদান

Hostage

উত্তরঃ **Hostage** = জিম্মি

Farce

উত্তরঃ **Farce** = প্রহসন

Legend

উত্তরঃ **Legend** = কিংবদন্তি

Rotation

উত্তরঃ **Rotation** = ঘূর্ণন

Symbol

উত্তরঃ **Symbol** = প্রতীক

(খ) নিচের অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ করো :

Dishonest men are never trusted. They adopt dishonesty to achieve success. They cannot hide their dishonesty for long. It is exposed sooner or later. They deceive others once or twice. But if they are once known to be dishonest, they are never more trusted.

উত্তরঃ অসৎ ব্যক্তিদের কেউ কখনো বিশ্বাস করে না। সাফল্য অর্জনের জন্য তারা অসদুপায় অবলম্বন করে। তারা তাদের অসততা দীর্ঘদিন লুকিয়ে রাখতে পারে না। আজ হোক বা কাল, তা প্রকাশ হয়েই পড়ে। তারা অন্যদের একবার বা দুবার ঠকাতে পারে। কিন্তু একবার তারা অসৎ হিসেবে পরিচিত হলে, তাদেরকে আর কখনোই বিশ্বাস করা হয় না।

(৬)

(ক) নিচের যেকোনো পাঁচটি বাক্য শুদ্ধ করে লেখো:

অথবা

(i) সংসার সুখের হয় রমনির গুণে।

উত্তরঃ সংসার সুখের হয় রমনির গুণে। = সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে।

(ii) আজকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্ররাই অমনোযোগী।

উত্তরঃ আজকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্ররাই অমনোযোগী। = আজকাল বানানের ব্যাপারে সকল ছাত্রই অমনোযোগী।

(iii) অপরাহু লিখতে অনেকেই ভুল করে।

উত্তরঃ অপরাহু লিখতে অনেকেই ভুল করে। = অপরাহু লিখতে অনেকেই ভুল করে।

(iv) স্বজনের মরাদাহ করতে শ্মশানে গেছে।

উত্তরঃ স্বজনের মরাদাহ করতে শ্মশানে গেছে। = স্বজনের শবদাহ করতে শ্মশানে গেছেন।

(v) ফেলো টাকা মাখো তেল।

উত্তরঃ ফেলো টাকা মাখো তেল। = ফেলো কড়ি মাখো তেল।

(vi) মাস্ক পরুন, সুস্থ থাকুন।

উত্তরঃ মাস্ক পড়ুন, সুস্থ থাকুন। = মাস্ক পড়ুন, সুস্থ থাকুন।

(vii) ছেলেটি বিদূষী হলেও বখাটে।

উত্তরঃ ছেলেটি বিদূষী হলেও বখাটে। = ছেলেটি বিদ্বান হলেও বখাটে।

(viii) তোমার বক্তব্য কোনোমতেই যুক্তিক নয়।

উত্তরঃ তোমার বক্তব্য কোনোমতেই যুক্তিক নয়। = তোমার বক্তব্য কোনোমতেই যুক্তিসংগত নয়।

(খ) নিচের অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখো :

বিদ্বানজনের সাধারণত সংস্কৃতিপ্রিয়। সৌহার্দতা আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির প্রাণ। কিন্তু দিন দিন তা ম্লান হওয়ায় আমরা সশঙ্কিত। তবুও নিরাশায় ডুবে থাকা চলবে না। এ ক্ষেত্রে যে কোনো শুভ উদযোগকে জানাই

সুস্বাগত।

উত্তরঃ বিদ্বজ্জনেরা সাধারণত সংস্কৃতিপ্রিয়। সৌহার্দ্য আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির প্রাণ। কিন্তু দিন দিন তা ম্লান হওয়ায় আমরা শঙ্কিত। তবুও নিরাশায় ডুবে থাকা চলবে না। এ ক্ষেত্রে যেকোনো শুভ উদ্যোগকে জানাই স্বাগত।

(৫)

(ক) বাক্য কাকে বলে? অর্থগতভাবে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা করো।

উত্তরঃ বাক্য হলো এক বা একাধিক শব্দের সমষ্টি যা সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে। বাক্যের মাধ্যমে একটি ভাব, চিন্তা, প্রশ্ন বা নির্দেশ প্রকাশ করা হয়। যেমন, "সে স্কুলে যায়।" এটি একটি সম্পূর্ণ বাক্য কারণ এটি একটি সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করছে।

বাক্যের গঠন অনুসারে শ্রেণিবিভাগ:

বাক্যের গঠন অনুসারে বাক্যকে সাধারণত তিনটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করা যায়:

সরল বাক্য

মিশ্র বাক্য

জটিল বাক্য

১. সরল বাক্য:

সরল বাক্য হলো এমন একটি বাক্য যা একটি প্রধান ভাব বা তথ্য প্রকাশ করে। এই ধরনের বাক্য সাধারণত একটি মাত্র প্রধান ক্রিয়া থাকে এবং তা একটি স্বাধীন বাক্যাংশ দ্বারা গঠিত হয়।

উদাহরণ:

আমি বই পড়ি।

সে গান গায়।

২. মিশ্র বাক্য:

মিশ্র বাক্য হলো এমন একটি বাক্য যা দুটি বা ততোধিক সরল বাক্যকে সংযোজক (যেমন এবং, কিন্তু, অথবা, তাই) দ্বারা যুক্ত করে গঠিত হয়। এখানে প্রতিটি অংশ স্বাধীনভাবে দাঁড়াতে পারে।

উদাহরণ:

সে স্কুলে যায় এবং আমি বাড়িতে থাকি।

রুবেল লেখাপড়া করছে, কিন্তু তার মন বসছে না।

৩. জটিল বাক্য:

জটিল বাক্য হলো এমন একটি বাক্য যা একটি প্রধান বাক্যাংশ এবং এক বা একাধিক গৌণ বাক্যাংশ দ্বারা গঠিত। গৌণ বাক্যাংশগুলি প্রধান বাক্যাংশের উপর নির্ভর করে এবং তা সম্পূর্ণভাবে অর্থ প্রকাশ করতে পারে না।

উদাহরণ:

যখন আমি ঘুমাচ্ছিলাম, তখন সে এসেছিল।

আমি জানি যে তুমি সত্য কথা বলছো।

অথবা

(খ) নিচের যেকোনো পাঁচটি বাক্য নির্দেশ অনুযায়ী পরিবর্তন করো :

(i) যা বার্ষিক্য, তাকে সব সময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না।

উত্তরঃ যা বার্ষিক্য, তাকে সব সময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না। = বার্ষিক্যকে সবসময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না।

(ii) শিক্ষক আসা মাত্রই শিক্ষার্থীরা উঠে দাঁড়াল।

উত্তরঃ শিক্ষক আসা মাত্রই শিক্ষার্থীরা উঠে দাঁড়াল। (জটিল) = যখন শিক্ষক আসলেন; তখনই শিক্ষার্থীরা উঠে দাঁড়াল।

(iii) আমি মিথ্যা বলিনি।

উত্তরঃ আমি মিথ্যা বলিনি। (অস্তিত্বচক) = আমি সত্য বলেছি।

(iv) গভর্নমেন্ট বাড়িটা রিকুইজিশন করেছে।

উত্তরঃ গভর্নমেন্ট বাড়িটা রিকুইজিশন করেছে। (প্রশ্নবাচক) = গভর্নমেন্ট কি বাড়িটা রিকুইজিশন করেনি?

(v) সদা সত্য কথা বলা উচিত?

উত্তরঃ সদা সত্য কথা বলা উচিত। = সদা সত্য কথা বলবে।

(vi) এটি ভারি লজ্জার কথা।

উত্তরঃ এটি ভারি লজ্জার কথা। = কী লজ্জার কথা!

(vii) পুলিশের লোক জানিবে কী করিয়া?

উত্তরঃ পুলিশের লোক জানিবে কী করিয়া? = পুলিশের লোক জানিবে না।

(viii) দেশপ্রেমিক ব্যক্তি দেশকে ভালোবাসে।

উত্তরঃ দেশপ্রেমিক ব্যক্তি দেশকে ভালোবাসে। = তিনি দেশপ্রেমিক, তাই দেশকে ভালোবাসেন।

(8)

(ক) উপসর্গ কাকে বলে? বিদেশি উপসর্গ ব্যবহার করে পাঁচটি শব্দ গঠন করো।

উত্তরঃ যেসব অব্যয়সূচক শব্দাংশ মূল শব্দের আগে যুক্ত হয়ে নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করে এবং শব্দের অর্থের পরিবর্তন, সম্প্রসারণ বা সংকোচন ঘটায়, সেগুলোকে উপসর্গ বলে।

বিদেশি উপসর্গ ব্যবহার করে পাঁচটি শব্দ:

বাংলা ভাষায় অনেক আরবি, ফারসি ও ইংরেজি শব্দ ব্যবহৃত হয়। নিচে বিদেশি উপসর্গের সাহায্যে গঠিত পাঁচটি শব্দ দেওয়া হলো:

১. বে + আদব = বেয়াদব (ফারসি 'বে' উপসর্গ)
২. বদ + মেজাজ = বদমেজাজ (ফারসি 'বদ' উপসর্গ)
৩. দর + কার = দরকার (ফারসি 'দর' উপসর্গ)
৪. ফি + বছর = ফি-বছর (আরবি 'ফি' উপসর্গ)
৫. হা + জির = হাজির (আরবি 'হা' উপসর্গ)

অথবা

(খ) নিচের যেকোনো পাঁচটি ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো :

ভবনদী

উত্তরঃ ভবনদী = ভব রূপ নদী রূপক (কর্মধারয় সমাস)

প্রবচন

উত্তরঃ প্রবচন = প্র (প্রকৃষ্ট) যে বচন (প্রাদি সমাস)।

পঙ্কজ

উত্তরঃ পঙ্কজ = পঙ্কে জন্মে যা (উপপদ তৎপুরুষ সমাস)

অনাহূত

উত্তরঃ অনাহূত = নয় আহূত / ন আহূত (নঞ তৎপুরুষ সমাস)

সপ্তর্ষি

উত্তরঃ সপ্তর্ষি = সপ্ত ঋষির সমাহার (দ্বিগু)

ক্ষুধানল

উত্তরঃ ক্ষুধানল = ক্ষুধা রূপ অনল। (রূপক কর্মধারয়)

উত্তরোত্তর

উত্তরঃ উত্তরোত্তর = উত্তর উত্তর (অব্যয়ীভাব সমাস)

শিক্ষক

উত্তরঃ শিক্ষক = শিক্ষা দান করেন যিনি (উপপদ তৎপুরুষ সমাস)

(৩)

(ক) 'আবেগ শব্দ' কাকে বলে? 'আবেগ শব্দ'-এর শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ আলোচনা করো।

উত্তরঃ যে শব্দের মাধ্যমে মনের নানা ভাব ও আবেগকে প্রকাশ করা হয়, তাকে আবেগ শব্দ বলে।

প্রকাশ অনুসারে আবেগ শব্দকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন:

- সিদ্ধান্তবাচক আবেগ শব্দ: এই জাতীয় আবেগ শব্দের সাহায্যে অনুমোদন প্রকাশ পায়। যেমন: বেশ, তাই হবে।
- প্রশংসাবাচক আবেগ শব্দ: এ ধরনের আবেগ শব্দ প্রশংসা প্রকাশ করে। যেমন: বাঃ! বড় ভালো কথা বলেছ।
- বিরজ্জিবাচক আবেগ শব্দ: এ ধরনের আবেগ শব্দ ঘৃণা প্রকাশ করে। যেমন: ছিঃ ছিঃ, তুমি এত নীচ!
- যন্ত্রণাবাচক আবেগ শব্দ: এ ধরনের আবেগ শব্দ আতঙ্ক প্রকাশ করে। যেমন: আঃ, কী আপদ।
- সম্বোধনবাচক আবেগ শব্দ: এ ধরনের আবেগ শব্দ আহ্বান করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন: হে বন্ধু, তোমাকে অভিনন্দন। বিস্ময়বাচক আবেগ শব্দ: এ ধরনের আবেগ আশ্চর্য হওয়ার ভাব প্রকাশ করে। যেমন: আরে, তুমি আবার এলে!

অথবা

(খ) নিচের অনুচ্ছেদের নিম্নরেখ পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ করো :

বাড়িতে সেদিন কুটুম এসেছিল, সঙ্গে এসেছিল একগাদা রসগোল্লা আর সন্দেশ। প্রকাশ্যে ভাগটা প্রকাশ্যে খেয়ে ভাড়ার ঘরে গোপন ভাগটা মুখ পুরে চলেছি, কোথা থেকে সে এসে খপ করে হাত ধরে ফেলল। রাগ করে মুখের দিকে তাকাতে সে এমন ভাবে হাসল যে লজ্জা পেলাম।

উত্তরঃ প্রদত্ত অনুচ্ছেদের নিচে কোনো শব্দের নিচে দাগ (নিম্নরেখ) দেওয়া নেই। তবে অনুচ্ছেদের গঠন বিবেচনা করে ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি নির্ণয়ের জন্য সাধারণত যে যেটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ বেছে নেওয়া হয়, সেগুলোর ব্যাকরণিক শ্রেণি নিচে দেওয়া হলো :

১. ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি নির্ণয়

- কুটুম — বিশেষ্য (ব্যক্তিবাচক নামপদ)
- প্রকাশ্যে — ক্রিয়াবিশেষণ (কাজের ধরন)
- পুরে — ক্রিয়া (অসমাপিকা ক্রিয়া)
- ফেলল — ক্রিয়া (যৌগিক ক্রিয়ার সাহায্যকারী অংশ)
- লজ্জা — বিশেষ্য (গুণ বা ভাববাচক)

(২)

(ক) বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের 'তৎসম' শব্দের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো।

উত্তরঃ বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে তৎসম শব্দের ৫টি নিয়ম নিচে দেওয়া হলো:

১. যেসব তৎসম শব্দে ই ঙ্গ বা উ উ উভয় শুদ্ধ কেবল সেসব শব্দে ই বা উ এবং তার কারাচিহ্ন (ু ি) হবে। যেমন: কিংবদন্তি, সূচিপত্র; উর্গা, উষা।
২. রেফের পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন: অর্জুন, ধর্ম ইত্যাদির পরিবর্তে অর্জন, ধর্ম ইত্যাদি হবে। সন্ধির ক্ষেত্রে কখগঘ পরে থাকলে পূর্ব পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার ঝ হবে। যেমন: অহম্ কার অহংকার।
৩. বিশেষ অক্ষরগুলো যুক্ত করে লেখতে হবে। যেমনঃ রাত্রি, অক্ষকার, প্রাণতি।
৪. সংস্কৃত ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের দীর্ঘ ঙ্গ-কারান্ত রূপ সমাসবদ্ধ হলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী সেগুলিতে হ্রস্ব ই-কার হয়। যেমন: গুণী গুণিজন, প্রাণী প্রাণিবিদ্যা, মন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদ। ইন্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে-ত্ব ও তা প্রত্যয় যুক্ত হলে ই-কার হবে। যেমন: কৃতি → কৃতিত্ব, দায়ী → দায়িত্ব, প্রতিযোগী → প্রতিযোগিতা, মন্ত্রী → মন্ত্রিত্ব, সহযোগী → সহযোগিতা।
৫. বিসর্গ: (:) শব্দের শেষে বিসর্গ (০ঃ) থাকবে না। যেমন: ইতস্ত, কার্যত, ক্রমশ, পুনঃপুন, প্রথমত, প্রধানত, প্রয়াত, প্রায়শ, ফলত, বস্তুত, মূলত। এছাড়া নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে শব্দমধ্যস্থ বিসর্গ-বর্জিত রূপ গৃহীত হবে। যেমন: দুস্থ, নিস্তরু, নিগৃহ, নিশ্বাস।

অথবা

(খ) নিচের যেকোনো পাঁচটি শব্দের বানান শুদ্ধ করে লেখো।

দায়ীত্ব

উত্তরঃ দায়ীত্ব = দায়িত্ব

মনিষা

উত্তরঃ মনিষা = মনীষা

সন্যাসী

উত্তরঃ সন্যাসী = সন্ন্যাসী

শিরচ্ছেদ

উত্তরঃ শিরচ্ছেদ = শিরশ্ছেদ

মনোপুত

উত্তরঃ মনোপুত = মনঃপুত

পূর্বাঙ্ক

উত্তরঃ পূর্বাঙ্ক = পূর্বাঙ্ক

মুমূর্ষ

উত্তরঃ 'মুমূর্ষ' = মুমূর্ষু ।

ন্যূনতম

উত্তরঃ ন্যূনতম = ন্যূনতম

(১২) যেকোনো একটি বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ রচনা করো:

(ক) শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধ

উত্তরঃ

শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধ

শিষ্টাচার কি:

আচরণে ভদ্রতা ও সুরূচিবোধের যৌক্তিক মিলনের নাম শিষ্টাচার। শিষ্টাচার মনের সৌন্দর্যের বাহ্য উপস্থাপনা। তার মার্জিততম প্রকাশ ঘটে সৌন্দর্যবোধের মাধ্যমে। যে মানুষ যত বেশি শিষ্ট তার প্রিয়তাও তত বেশি। আর এই শিষ্টতা তার চরিত্রকেও করে আকর্ষণীয়। মানুষের মাঝে লালিত সুন্দরের প্রকাশ তার চরিত্র। শিষ্টতা সেই সুন্দরের প্রতিমূর্ত রূপ।

অন্তর্গত মহত্ত্ব মানুষকে উদার করে। আর সেই উদারতা ব্যক্তিকে রুচ করে না, তাকে শিষ্ট আর ভদ্র হতে শেখায়। মানুষের মাঝে এই মহত্ত্বের পরিশীলিত প্রকাশই শিষ্টতা। সাধারণভাবে চালচলন, কথাবার্তায় যে ভদ্রতা, শালীনতা আর সৌজন্যের পরিচয় পাওয়া যায় তা-ই শিষ্টতা। শিষ্টাচার ব্যক্তিজীবনের যেমন তেমনি সমাজজীবনেরও গৌরবসূচক আভরণ।

আচরণে যদি মানুষ শিষ্ট না হয়, ব্যবহারে উগ্রতা যদি পরিহার না করে তবে কখনো শিষ্টাচার হওয়া সম্ভব নয়। স্বভাবে কৃত্রিমতা পরিহার করতে না পলে কখনো পবিত্র মনের অধিকারী হওয়া যায় না। মানবিক সত্তা তার ক্ষুরণে চরিত্রে সাধুতাকে অবলম্বন করে, তার প্রকাশ ঘটে শিষ্ট স্বভাবে। ঐন্দ্র্য আর উচ্ছৃঙ্খলতা এখানে পরাজিত হয়। অহংকার অন্যকে ছোট ভাবে শেখায়। শিষ্টতত্ত্ব বিপরীতভাবে মানুষকে সম্মান করতে শেখায়। কদর্যতা আর অশ্লীলতা শিষ্টাচারে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। কাজেই ব্যক্তিকে হতে হয় আচরণে মার্জিত, বক্তব্যে সৎ, সরল আর স্পষ্ট। বিনয় মানুষকে ছোট করে না, বরং পরায় সম্মানের মুকুট। এই বিনয় শিষ্টতার অঙ্গভূষণ।

শিষ্টাচারের গুরুত্ব:

আচরণে যে জাতি যত বেশি সভ্য সে জাতি তত বেশি সুশৃঙ্খল ও উন্নত। কেবল পশুপাখির মতে বেড়ে ওঠাই মানুষের লক্ষণ নয়। আত্মোন্নয়নের পাশাপাশি সমাজ ও জাতীয় জীবনে কোনো-না-কোনো ভাবে অবদান রাখা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। আর তা করতে হলে শিষ্ট আচরণের অনুশীলন ছাড়া বিকল্প নেই। শিষ্টাচারের প্রথম প্রকাশ ঘটে বাক্তিস্বভাবে। যা ক্রমাগত বাক্তি থেকে আলোর বন্যার মতো ছড়িয়ে পড়ে গোটা সমাজে, রাষ্ট্রে। এর আলোতে উজ্জ্বল বাক্তির আত্মিক মুক্তির সাথে যোগ হয় বৈষয়িক অগ্রগতি। সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে প্রতিনিয়তই আমাদের সমাজের অপরাপর দশ জনের সাথে যোগাযোগ আর ভাবের আদান-প্রদান করতে হয়। এরই মাঝে শিষ্টজন সহজে সকলের মন জয় করতে পারে। পারস্পরিক সম্প্রীতির জন্যে এর খুবই প্রয়োজন। কেননা সম্প্রীতি না থাকলে হিংসা আর হানাহানি সমাজকে ঠেলে দেয় বিশৃঙ্খলার দিকে।

শিষ্টাচারী বাক্তি দরিদ্র হতে পারে, কিন্তু তার সৌজন্যে আর বিনয়ের মাধ্যমে সে সকলের প্রিয়তা অর্জন করে। শিষ্টজন সহজেই অর্জন করেন অন্যের আস্থা। অন্যের সহানুভূতি লাভ করার জন্যে শিষ্টজনই উত্তম। অপর দিকে শিষ্টাচারীকে সকলে সম্মানের চোখে দেখে। সামাজিক সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার জন্যে

শিষ্টাচারের বিকল্প নেই। এতে করে আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে সকলের আন্তরিকতা প্রকাশ পায়। চূড়ান্ত পর্যায়ে আসে সুখম উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধি।

শিষ্টাচার ও ছাত্রসমাজ:

জ্ঞানার্জনে নিষ্ঠা, অভিনিবেশ আর শৃঙ্খলাবোধের পাশাপাশি শিষ্টাচার অনুশীলন খুবই জরুরি। নৈতিক চরিত্রে উৎকর্ষের জন্যে ছাত্রজীবনেই ব্যবহারের ভব্যতা আর শিষ্টতার সম্মিলন ঘটানোর কোনো বিলা নেই। কাজেই দেখা যাচ্ছে আজনের সাথে শিষ্টাচারের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। ছাত্রজীবনে শিষ্টাচারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ ঘটে পোশাক-পরিচ্ছদে। রুচিশীল আর সরল জীবন-যাপনের পাশাপাশি পোশাকের ক্ষেত্রেও সুরুচির পরিচয় থাকা দরকার।

শিষ্টাচার ও সমাজ:

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক- প্রতিটি ক্ষেত্রেই শিষ্টাচারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তা না হলে বিদ্বেষ, হিংসা, গ্রনহানি আর অশান্তি জীবনে চরম বিপর্যয় ডেকে আনে। শিষ্টাচার প্রতিষ্ঠায় সমাজ-ব্যবস্থা ও সমাজ কাঠামোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব প্রদর্শন করা দরকার। কিন্তু তার মানে এই নয় যে যৌক্তিক সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনকে এগিয়ে নিলে শিষ্টাচারী হওয়া যাবে না। সমাজে নিজের অবস্থান সম্পর্কে থাকতে হবে সতর্ক। সামাজিক অবস্থান শিষ্টাচারের মাত্রা নির্ধারণ করে। এই ভাবে ক্রোধ আর প্রতিহিংসার মতো চারিত্রিক দোষগুলো অতিক্রমের চেষ্টা থাকতেই হবে। এম বিপরীতমণী দিনগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্যে দরকার চারিত্রিক দৃঢ়তা।

শিষ্টাচার ও রাষ্ট্র:

জাতীয় জীবনে সর্বোচ্চ পর্যায়ে শিষ্টতার প্রকাশ পায় রাষ্ট্র পরিচালনায়, নেতৃত্ব প্রদানকারীদের মধ্যে। এর প্রভাব পড়ে গোটা দেশজুড়ে। এ্যাবার আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণে কুটনৈতিক কর্মকাণ্ডে শিষ্টতার বিকল্প নেই। চরম লাভ-লোকসানের ব্যপার ব্যবসা-বাণিজ্যেও শিষ্টাচারের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

শিষ্টাচার না থাকার কুফল:

শিষ্টাচারহীন সমাজ ও অন্তঃসারশূন্য, বিবেকহীন। সমাজে সৌন্দর্য আর সুকুমার প্রবৃত্তিগুলোর দেখা মেলে না। মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে বিরোধ হয়, ২. দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়। সর্বোপরি মানব সভ্যতা চরম হুমকির মুখোমুখি দাঁড়ায়। শিষ্টাচারহীন মানুষ সবসময় উদ্ধত থাকে। আলাপ-আলোচনায় তার মধ্যে প্রকাশ পায় অমার্জিত ভাব। তার আচরণে প্রাধান্য পায় দুর্ব্যবহার ও দুর্মুখতা।

শিষ্টাচার অর্জনের উপায়:

শিষ্টাচার নিজ থেকে মানব হৃদয়ে জন্ম নেয় না। একে বরণ করে নিতে হয়। এর চর্চা শুরু হয় শিশুকাল থেকেই। তাই শিশু কোন পরিবেশে, কার সহচর্যে কীভাবে বেড়ে উঠছে সেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই সাথে পয়োজন শিক্ষার। কেননা আমৃত্যু চলতে থাকে শিষ্টাচারের অনুশীলন। শিশু পরিবার-পরিজন, সঙ্গী-সাথী কিংবা প্রতিবেশী যাদের সাহচর্যে থাকে তাদের কাছ থেকেই আচরণ শেখে। তাই সংসঙ্গ শিষ্টাচারী হতে সাহায্য করে। স্কুল-কলেজেও শিক্ষার্থীরা শিষ্টাচারের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। ভালো বইভ একজন সং অভিাবকের মতোই শিষ্টাচার শেখাতে পারে।

উপসংহার:

শিষ্টাচারের ভিত্তিভূমিকার ওপর গড়ে ওঠে সং চরিত্রের সুরম্য অটালিকা। সং চরিত্রবান ব্যক্তি সমাজ ও জাতীয় জীবনে বিশেষ অবদান রাখতে পারে। অশিক্ষা, কুশিক্ষা শিষ্টাচারের অন্তরায়। তা প্রতিনিয়ত মানবিক মূল্যবোধগুলো পাস করে সমাজকে করে তুলতে পারে নিঃস্ব রিক্ত সর্বস্বান্ত। মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ে আমরা হতে পারি সমস্যা-জর্জরিত। এ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনে সুস্থতা ও সমৃদ্ধি অর্জনে তাই আমাদের শিষ্টাচারের চা করা উচিত।

(খ) বাংলাদেশের পর্যটনশিল্প সমস্যা ও সম্ভাবনা

উত্তর: **ভূমিকা:** বাংলাদেশ একটি সুপ্রাচীন দেশ। প্রাচীনত্বের গরিমায় বাংলা সারা বিশ্বে পরিচিত। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ-দেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি দারুণভাবে উন্নতি লাভ করেছে। দেশের

সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও ইতিহাস বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ করে দেশের জনা আর্থিক সমৃদ্ধি আনয়ন করেছে। বর্তমানে পর্যটনকে শিল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কারণ বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের ব্যাপক সম্ভাবন বর্তমান।

পর্যটনের বিকাশ: মানুষের একে অপরকে জানার আগ্রহ থেকেই পর্যটনের বিকাশ ঘটেছে। হয়ত পর্যটনের নামে নয়। কিন্তু পর্যটন বিষয়টি অনেক পুরাতন। মার্কোপোলো, ইবনে বতুতা, ফাহিয়েন, হিউয়েন সাং-সহ বিশ্ববিখ্যাত পর্যটকরা ইতিহাসে স্থায়ী হয়ে আছেন, সেই সময়ে যখন যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল খুবই কষ্টকর, সেই সময়েও ভ্রমণপিপাসুরা। ঘুরে বেড়িয়েছেন দেশে দেশে। এসব বিখ্যাত পর্যটকদের অনেকেই এ উপমহাদেশে এসেছিলেন সে কথা আমরা ইতিহাস থেকে পাই। আজ পর্যটনের যে ধারণা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে পৃথিবীব্যাপী, দেশে দেশে গড়ে উঠেছে সমৃদ্ধ পর্যটন শিল্প, লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে দেশ-দেশান্তরে তা কিন্তু জগৎ সম্পর্কে তার কল্পন ও জগৎ সত্যের প্রত্যক্ষ সমন্বয়ের অদম্য অভিপ্রায়ের কারণে।

আমরা জনি খ্রিস্টপূর্বকালে প্রথম বিশ্ব জয় করেছিল বাংলার মসলিন। পৃথিবীব্যাপী এদেশের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল সোনারগাঁও-এ তৈরি সুক্ষ বস্ত্র মসলিনের মাধ্যমে। এছাড়াও পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ম্যানগ্রোভ বন (সুন্দরবন) রয়েছে বাংলাদেশে যা বিশ্ববাসীকে পর্যটন আকর্ষণে রাখতে পরে ব্যাপক ভূমিকা। আমাদের রয়েছে পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত যা অবিচ্ছিন্নভাবে ১২০ কিলোমিটার দীর্ঘ। আরো একটি কারণে বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে গৌরবজনক আসন অলংকৃত করে আছে যা 'একুশে ফেব্রুয়ারি' আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

পৃথিবীকে আজ আমরা গ্লোবাল ভিলেজ বলছি। অর্থাৎ সারা পৃথিবীর সব দেশ মিলেমিশে একটি গ্রামে পরিণত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লবের ফলে সময় এসেছে পরস্পরের কাছে পরস্পরকে মেলে ধরার। নিজের দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য ভ্রমণপিপাসু বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপনের এখনই সময়। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতে বাংলাদেশেও পর্যটন শিল্পের যথাযথ উন্নতি ও তদারকিতে লাভজনক হিসেবে গড়ে ওঠতে পারে।

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন: ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশের হারিয়ে যাওয়া পর্যটন শিল্পের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য আর বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতিকে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে তুলে ধরে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও বেকারত্ব বিমোচনের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে ২৭ নভেম্বর ভারিখে জারিকৃত মহামান্য রাষ্ট্রপতির ১৪৩ নং আদেশ বলে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পর্যটন সম্ভাবনাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের উদ্যোগ সূচিত হয়। এর প্রেক্ষিতে ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন নামে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে এবং ১৯৭৫ সালে বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন নবগঠিত মন্ত্রণালয়ের অধীনে নীত হয়। জাতীয় পর্যটন সংস্থা হিসেবে এই সংস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে- বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের বিকাশ, পর্যটন সম্ভাবনাময় স্থানসমূহের অবকাঠামোর উন্নয়ন, পর্যটকদের সেবা প্রদান, বিদেশে ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা ও দেশের পর্যটন সম্পদের বিকাশের পাশাপাশি এ শিল্পের বিভিন্ন অঙ্গনে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ দেশের দারিদ্র্যবিমোচনে সহায়তা করা।

শ্রেণিভিত্তিক বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ: বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণগুলোকে নিম্নরূপে ভাগ করা যায়।
যথা:

(ক) প্রাকৃতিক বা বিনোদনমূলক পর্যটনঃ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ, শহরের যান্ত্রিক জীবনের বাইরে কিছুটা সময় কাটিয়ে আসা কিংবা হঠাৎ করে কোনো নতুন পরিবেশের ছোয়া পাবার জন্য মানুষ ছুটে যায় প্রকৃতির কাছে। এ ধরনের নয়ন-কাড়া প্রাকৃতিক অবস্থান বাংলাদেশে প্রচুর। রয়েছে। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মনোরম সমুদ্র সৈকত কুয়াকাটা। পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার, চট্টগ্রাম ও সিলেটের পাহাড়ি অঞ্চল ও চা বাগান, তামাবিল, জাফলং, রাঙামাটির নয়নভিরাম কৃত্রিম হ্রদ, সুন্দরবনসহ বিভিন্ন বনাঞ্চল। এছাড়াও রয়েছে উপকূলীয় দ্বীপাঞ্চল, বর্ণাঢ্য উপজাতীয় ও গ্রামীণ জীবনধারা।

(খ) **রোমাঞ্চকর ভ্রমণ এবং পরিবেশভিত্তিক পর্যটন:** রোমাঞ্চকর ও পরিবেশভিত্তিক পর্যটনের অনেক ক্ষেত্র রয়েছে বাংলাদেশে। সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকায় বিচিত্র বন্যপ্রাণী এবং উদ্ভিদসম্ভার দেখা যায়। রাঙামাটির হ্রদে নৌবিহার, মৎস্য শিকার, জলক্রীড়া, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ট্রেকিং, হাইকিং ইত্যাদির সুযোগ রয়েছে। সাগরের বুক চিরে অপরূপ দ্বীপ সেন্টমার্টিন। পর্যটক আকর্ষণের এমনি অনেক সুযোগ আছে আমাদের এই বাংলাদেশে।

(গ) **সাংস্কৃতিক পর্যটন:** ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান পরিদর্শন সাংস্কৃতিক পর্যটনের পর্যায়ভুক্ত। মহাস্থানগড়, ময়নামতি, পাহাড়পুর, ঢাকার লালবাগের দুর্গ, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, জাতীয় স্মৃতিসৌধ, জাতীয় জাদুঘর, সোনারগাঁও জাদুঘর, রাজশাহীর বরেন্দ্র জাদুঘর, নাটোর ও পুঠিয়ার রাজবাড়ি এবং এমনি আরো অনেক সাংস্কৃতিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন রয়েছে বাংলাদেশে।

(ঘ) **ধর্মীয় পর্যটন:** বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকেরা মূলত ধর্মীয় অনুভূতি থেকেই কিছু কিছু স্থানে ভ্রমণ করে। ঐতিহাসিক ধর্মীয় সাংস্কৃতিক আকর্ষণীয় স্থান বাংলাদেশে বিস্তৃত। মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, মাজার, দরগাহ, মঠসহ বিভিন্ন নিদর্শন ছড়িয়ে আছে সারাদেশময়। এসব আকর্ষণের মধ্যে রয়েছে বাগেরহাটের ঘাটগম্বুজ মসজিদ, ঢাকার সাতগম্বুজ মসজিদ, রাজশাহীর শাহ মখদুমের মাজার, পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার, মহাস্থানগড়, নবাবগঞ্জের সোনা মসজিদ, ঢাকেশ্বরী মন্দির, আর্মেনিয়ান চার্চ, চট্টগ্রামের বায়েজিদ বোস্তামীর দরগাহ, সীতাকুণ্ড মন্দির, সিনেটের হযরত শাহজালারের দরগা, কক্সবাজারের রামু মন্দির, রাজশাহীর তাহেরপুর রাজাবাড়ি প্রভৃতি।

(ঙ) **নৌ পর্যটন:** বিনোদনমূলক পর্যটনের জন্য এদেশের নদনদী আকর্ষণীয় উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে বহুকাল যাবৎ। বাংলাদেশ নদীবহুল দেশ। ২৫৭টি ছোটবড় নদনদী জালের মতে বিস্তৃত হয়ে আছে সারাদেশময়। নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রকৃত সৌন্দর্য অনেকাংশেই ফুটে ওঠে নৌভ্রমণের মাধ্যমে এখান থেকেই অনুভব করা যায় সোনারবাংলার প্রকৃত ছবি।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব: বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পর্যটন শিল্প নানাভাবে অবদান রাখতে পারে। প্রথমত, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এ শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বাংলাদেশে এমনিতেই রপ্তানি কম। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের কোনো খাতই তেমন শক্তিশালী কিংবা যাতসহ নয়। এই প্রেক্ষাপটে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিলে পর্যটনের মতো 'অদৃশ্য রপ্তানি পণ্য' খাতে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করতে পারে। পর্যটন কর্পোরেশন মুনাফা অর্জনকারী সংস্থার মধ্যে একটি। ১৯৮৩-৮৪ থেকে ২০০৩-২০০৪ পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠান সর্বমোট ৪৯৭৩.১০ লক্ষ টাকা করপূর্ব মুনাফা অর্জন করেছে। বর্তমান সরকার পর্যটন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সুনাম অর্জনে বিরাট অবদান রেখেছে। বাংলাদেশ ২ বছরের জন্য (২০০১-২০০৩) বিশ্ব পর্যটন সংস্থার কমিশন ফর সাউথ এশিয়ান চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার পাশাপাশি পর্যটন শিল্পে মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য ১৯৭৪ সালে জাতীয় হোটেল ও পর্যটন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। এ পর্যন্ত এখানে পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে ২২,০০০-এর বেশি ছাত্র-ছাত্রীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেই দেশ-বিদেশ কর্মরত আছেন। পর্যটন শিল্পের উন্নতির সঙ্গে যে সব ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হতে পারে সেগুলো হল:

১. ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও বেকারত্ব লাঘব;
২. প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়ন,
৩. কুটিরশিল্প ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন;
৪. বৈচিত্র্যময় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সৃষ্টি;
৫. অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
৬. বৈদেশিক বিনিয়োগ;
৭. আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি ইত্যাদি।

বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের সমস্যা: অনেক সম্ভাবনাময় শিল্প হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ নানা কারণে পর্যটন শিল্পে আশানুরূপ অগ্রগতি সাধন করতে পারে নি। এক্ষেত্রে যেসব সমস্যা রয়েছে সেগুলো হল:

১. **অবকাঠামোগত দুর্বলতা:** এই খাতের অবকাঠামো মারাত্মকভাবে দুর্বল। পরিবহণ ব্যবস্থা মাল্কার আমলের। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সত্ত্বেও এখনও রয়েছে অনেক দুর্বলতা। রাস্তাঘাট সংকীর্ণ, অনেক জায়গায় বিপজ্জনক। প্রায়শই যানজটে অযথা সময় ও শক্তি নষ্ট হয়। পর্যাপ্ত আধুনিক স্কেটেল ও মোটেল নেই। পর্যটন কেন্দ্রগুলোও অবহেলিত। এগুলোর সুপারিকল্পিত আধুনিকায়ন ও শুল্কমুক্ত বিপণির অভাবও এ ক্ষেত্রে বড় বাধা।

২. **রাজনৈতিক অস্থিরতা:** দেশে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে না ওঠায় রাজনৈতিক অস্থিরতা দেশের পর্যটন শিল্প বিকাশে বড় সমস্যা।

৩. **উন্নত সেব্য ও তথ্যের অভাব:** দক্ষ, মার্জিত জনবলের অভাব এ শিল্পে একটা বড় সমস্যা। সেই সঙ্গে রয়েছে উন্নত ও দ্রুত তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থার অভাব।

৪. **সামাজিক বাধা:** বিদেশি পর্যটকদের সংস্কৃতিকে এদেশে অনেকেই সহজ ও স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেন না। অনেকেই তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। অনেকেই তাদের সম্পর্কে পোষণ করেন নেতিবাচক মনোভাব। অনেক সময় পর্যটকরা দুষ্টলোকের পাশ্চাত্য পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হন। এগুলোও এ শিল্পের বিকাশে সমস্যা হয়ে আছে।

৫. **প্রচারের অভাব:** আজকে আমরা বিভিন্ন টিভি চ্যানেল, বিবিসি, সিএনএন, ডিসকভারী, ন্যাশনাল জিওগ্রাফির মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সমাজ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যসহ প্রাকৃতিক রূপ অবলোকন করে থাকি। কিন্তু এক্ষেত্রে বাংলাদেশের তেমন কোনো প্রচার নেই বললেই চলে। প্রামাণ্যচিত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের কথা তুলে ধরা যায়।

৬. **নিরাপত্তার অভাব:** অস্থিতিশীলতা, চুরি, ছিনতাই, হত্যা, রাহাজানি, সহিংসতা, থেকে পর্যটকদের রক্ষা করতে হবে। পর্যটকদের দিতে হবে নির্বিঘ্নে চলাফেরার নিশ্চয়তা।

পর্যটন শিল্প বিকাশে করণীয়: বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের বিকাশ অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। এ শিল্পের বিকাশে

(১) সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পর্যটন স্পটগুলোকে বেশি আকর্ষণীয় করে তোলে;

(২) যাতায়াতের সুষ্ঠু ব্যবস্থা তথা বিমান, নৌ ও সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন;

(৩) নিরাপদ ভ্রমণের যাবতীয় ব্যবস্থাকরণ;

(৪) দেশি-বিদেশি পর্যটকদের জন্য আবাসন সুবিধাদি করতে হবে।

এছাড়া সচেপ্ট হতে হবে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা নিরসনে জাতীয় ঐক্যমত প্রতিষ্ঠায়। পাশাপাশি পর্যটন শিল্পের বিকাশের জন্য চাই প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সংস্কার। চাই স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা। আকর্ষণীয় এলাকাগুলোর পরিকল্পিত নান্দনিক উন্নয়ন যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন পর্যটন-কর্মীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ। পর্যটন সংক্রান্ত নান বিষয়ে প্রয়োজন তথাপূর্ণ আকর্ষণীয় প্রচার। এই শিল্পের বিকাশের জন্য পাশাপাশি নিশ্চিত করতে হবে পর্যটকদের নিরাপত্তা। বিভিন্ন দেশের মতো পর্যটকদের বাড়তি কিছু সুবিধা দিতে হবে। সৈকতে রাখতে হবে বিভিন্ন বিনোদনের ব্যবস্থা, ব্যবহার করতে হবে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি। প্রতিটি ঐতিহাসিক স্থানসহ অন্যান্য দৃষ্টিনন্দন স্থানকে পর্যটনের আওতায় এনে সমৃদ্ধ করতে হবে।

কক্সবাজার ও কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত: বিশ্বের বৃহত্তম সমুদ্র সৈকতের অবস্থান আমাদের বাংলাদেশের কক্সবাজারে যার দৈর্ঘ্য প্রায় ১২০ কিলোমিটার। আরও রয়েছে দক্ষিণ অঞ্চলের কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত। যেখানে অবস্থান করে অবলোকন করা যায় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত। যা খুবই বিরল। সেন্টমার্টিন: আমাদের আছে জগদ্বিখ্যাত প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন। বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন একটি প্রবাল দ্বীপের নামই সেন্টমার্টিন। নারিকেল বিখ্যাত ঘেরা যার সৈকত। এখানে রয়েছে পর্যটন শিল্প সমৃদ্ধ করার অপার সম্ভাবনা।

রাঙামাটি ও বান্দরবান: পাহাড়-পর্বত ঘেরা বান্দরবান, রাঙামাটির সবুজ বনানীতে অপূর্ণ সৌন্দর্য সহসাই মনকে উচাটন করে দেয়। ছোট-বড় পাহাড়ের মাঝ দিয়ে বয়ে যাওয়া পাহাড়ি নদী, কপা আর হ্রদের অপার নান্দনিকতা। যে-কোনো মানুষকে বারবার হাতছানি দিয়ে ডাকে। পাহাড়ি উপজাতিদের কৃষ্টি সংস্কৃতি জীবনযাত্রার বর্ণাঢ্য মুগ্ধ করে পর্যটন প্রিয়দের।

সুন্দরবন: এই বাংলাদেশেই অবস্থিত পৃথিবীর বৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন যার নাম সুন্দরবন। খাল, নদী, সাগর বেষ্টিত সুন্দরবনের জলে কুমির আর ভাঙায় বাঘ। যে বাঘ ভুবন বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার নামে অভিহিত। সুন্দরবন ছাড়া এই বাঘ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এছাড়া আছে ঝাঁকে ঝাঁকে চিত্রল হরিণ, বানর, শূকর, বনমোরগ, অজগরসহ নানা প্রকার বন্যপ্রাণী। সুন্দরবনে অবস্থানকালে পর্যটকদের ঘুম ভাঙাবে অগুনতি পাখির কল-কাকলীতে যা একজন পর্যটককে স্বপ্নিল আবেশে মুগ্ধ করতে পারে।

চা বাগান ও জলপ্রপাত: সিলেট অঞ্চলের চা বাগানগুলোও বেশ সৌন্দর্যমণ্ডিত। যা পর্যটকদের আকর্ষণ করতে পারে।

জাফলংয়ের জলপ্রপাত, হায়কের পাথর কেয়ারী নয়নভোলানো স্থান। এছাড়া তামাবিল, চট্টগ্রামে ফয়েজ লেক, যমুনা সেতু ইত্যাদি পর্যটনের স্থান হিসেবে বেশ সমাদৃত।

উপসংহার: পর্যটন শিল্পে বাংলাদেশের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পকে আরে উন্নত করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। ৭ম শতকে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ বাংলাদেশ ভ্রমণে এসে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন: 'A sleeping beauty emerging from mists and water. এই টাচ্ছ্বসিত প্রশংসাকে সর্বদা ধরে রাখার মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের বিকাশের দায়িত্ব আমাদের। সরকারের পাশাপাশি আমরা বেসরকারি উদ্যোগে বিকাশ ঘটাতে পারি পর্যটন শিল্পের। আমরা সম্মিলিতভাবে যদি প্রচেষ্টা চালাই তাহলেই অচিরেই পর্যটন শিল্পে বাংলাদেশ বিশ্বের দরবারে স্থান করে নিবে। আসুন আমরা সকলে মিলে আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমিকে অনিবার ভালোবাসায় ভরিয়ে তুলি। আর জগদ্বাসীকে আপন করে গ্রহণ করি নিজের দেশে পরম আতিথেয়তায়।

(গ) কর্মমুখী শিক্ষা

উত্তর: **সূচনা :** শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ছাড়া জীবন অপূর্ণ। কিন্তু যে শিক্ষা বাস্তব জীবনে কাজে লাগে না, সে শিক্ষা অর্থহীন। এ ধরনের শিক্ষায় পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বোঝা বাড়ে। তাই জীবনভিত্তিক শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। আর জীবনের সাথে সম্পৃক্ত যে শিক্ষা সেটিই কর্মমুখী শিক্ষা। একমাত্র কর্মমুখী শিক্ষাই হচ্ছে আমাদের বাস্তব জীবনের সহায়ক।

কর্মমুখী শিক্ষা কী : কর্মমুখী শিক্ষা হচ্ছে একজন ব্যক্তিকে তার আত্মপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা করার লক্ষ্যে বিশেষ কোনো কর্মে প্রশিক্ষিত করে তোলা। অর্থাৎ যে শিক্ষাব্যবস্থায় মানুষ কোনো একটি বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা লাভ করে এবং শিক্ষা শেষে জীবিকার্জনের যোগ্যতা অর্জন করে, তাকেই কর্মমুখী শিক্ষা বলে। কর্মমুখী শিক্ষাকে কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষাও বলা হয়ে থাকে।

কর্মমুখী শিক্ষার প্রকারভেদ : কর্মমুখী শিক্ষা যান্ত্রিক শিক্ষা নয়। জীবনমুখী শিক্ষার পরিমণ্ডলেই তার অবস্থান। তাই পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক জীবনবোধের আলোকে কর্মমুখী শিক্ষা দুই ভাগে বিভক্ত। একটি হলো উচ্চতর কর্মমুখী শিক্ষা। এটিতে যারা বিজ্ঞান বিষয়ে পারদর্শী তারা – বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ ইত্যাদি স্বাধীন পেশা গ্রহণ করতে পারে। চাকরির আশায় বসে থাকতে হয় না। আরেকটি হলো সাধারণ কর্মমুখী শিক্ষা। এর জন্য কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার দরকার হয় না। প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষাই যথেষ্ট। সাধারণ কর্মমুখী শিক্ষার মধ্যে পড়ে কামার, কুমার, তাঁতি, দর্জি, কলকারখানার কারিগর, মোটরগাড়ি মেরামত, ঘড়ি-রেডিও-টিভি-ফ্রিজ মেরামত, ছাপাখানা ও বাঁধাইয়ের কাজ, চামড়ার কাজ, গ্রাফিক্স আর্টস, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, মৎস্য চাষ, হাঁস- মুরগি পালন, নার্সারি, ধাত্রীবিদ্যা ইত্যাদি। এ শিক্ষায় শিক্ষিত হলে কারোরই বেঁচে থাকার জন্য ভাবতে হয় না।

কর্মমুখী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা : মানুষের মেধা ও মননকে বিকশিত করার জন্য প্রয়োজন শিক্ষার। তাই মানুষকে সেই শিক্ষাই গ্রহণ করা উচিত, যে শিক্ষা তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনধারার উন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। এ দুরবস্থা থেকে মুক্তি পেতে পরিকল্পিত ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে জীবন সম্পৃক্ত ও উপার্জনক্ষম কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন জরুরি। কর্মমুখী শিক্ষা আত্মকর্মসংস্থানের নানা সুযোগ সৃষ্টি করে। ব্যক্তিকে স্বাবলম্বী করে তোলে। এ শিক্ষা ব্যক্তি ও দেশকে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি

দেয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্যবিমোচনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। কর্মমুখী শিক্ষায় দক্ষ জনশক্তি আমরা বিদেশে পাঠিয়ে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারি। বর্তমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের দেশেও শিক্ষাকে কর্মমুখী করে তোলা অতীব প্রয়োজন।

কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার : কর্মমুখী শিক্ষার গুরুত্ব আজ সর্বত্র স্বীকৃত। এর মাধ্যমে হাতে-কলমে শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা পেশাগত কাজের যোগ্যতা অর্জন করে এবং দক্ষ কর্মী হিসেবে কর্মক্ষেত্রে যোগ দেয়। কর্মমুখী শিক্ষা প্রসার ও উৎকর্ষ সাধন ব্যতীত কোনো জাতির কৃষি, শিল্প, কল-কারখানা, অন্যান্য উৎপাদন এবং কারিগরি ক্ষেত্রে উন্নতি সম্ভব নয়। বাংলাদেশে কর্মমুখী শিক্ষার ক্ষেত্র ক্রমেই সম্প্রসারিত হচ্ছে। দেশে প্রকৌশল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়; পলিটেকনিক ও ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট; লেদার ও টেক্সটাইল টেকনোলজি কলেজ, গ্রাফিক্স আর্টস কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এগুলো কর্মমুখী শিক্ষা প্রসারে ভূমিকা রাখছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা অপ্রতুল। তাই আমাদের দেশে সরকার ও জনগণের সক্রিয় প্রচেষ্টায় আরও অনেক কর্মমুখী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা দরকার। বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে কর্মমুখী শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে স্কুল ও মাদ্রাসায় নবম ও দশম শ্রেণিতে বেসিক ট্রেড কোর্স চালু, কৃষিবিজ্ঞান, শিল্প, সমাজকল্যাণ ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত; পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ডবল শিফট চালু ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

উপসংহার : বাংলাদেশ বিপুল জনসংখ্যার দেশ। কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে এ জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব। দক্ষ জনশক্তি দেশের সম্পদ; উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। তাই আমাদের দেশে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ব্যাপকভাবে কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার ঘটানো দরকার।

(ঘ) যুদ্ধ নয় শান্তি

উত্তরঃ

যুদ্ধ নয় শান্তি

ভূমিকা:

"আর যুদ্ধ নয়, নয়।

আর নয় মায়েদের শিশুদের কান্না

রক্ত কি, ধ্বংস কি, যুদ্ধ আর না, আর না।"

না, বিশ্বের শান্তি প্রিয় মানুষ আর যুদ্ধ চায় না। তবু মানুষকে যুদ্ধের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়। বিগত সাড়ে পাঁচ হাজার বছরে মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে সড়ে চৌদ্দ হাজার যুদ্ধ। বিংশ শতাব্দীর দুটি ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধ বিশ্বের মানুষকে বুঝিয়ে দিয়েছে যুদ্ধ কী? যুদ্ধের ভয়াবহতা কত নির্মম। তাইজে শান্তিকামী মানুষরা প্রতিষ্ঠা করুন জাতিসংঘ নামক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু একাবিংশ শতাব্দীর মানুষ ইরাকের যুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করতেছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পৈশাচিক উল্লাস। শিশুর কান্নায়, নারীর আর্তনাদে, লাশের গন্ধে ইরাকের আকাশ ভারী হয়ে উঠলেও লোভী শৃগালের মতো মার্কিন প্রশাসনের দৃষ্টি এখন তেল সম্পদের দিকে।

প্রাচীন যুদ্ধ: প্রাচীনকালেও পৃথিবীতে যুদ্ধ ছিল। সে সময়কার মহাকাব্যগুলোও যুদ্ধভিত্তিক। যুদ্ধের মাধ্যমেই এক একটি সভ্যতার জন্ম হয়েছে। আমরা হোমারের মহাকাব্য 'ইলিয়াড' ও 'ভিডিসির' মধ্যে প্রাচীনকালের যুদ্ধের ভয়াবহ বর্ণনা পাই। বর্তমানেও এরই ধারা অব্যাহত রেখে চলছে যুদ্ধ। সভ্যতার ইতিহাস শ্রেণিদ্বন্দ্ব ও শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস। মানবসভ্যতার সেই প্রত্যক্ষ মুহূর্ত থেকেই যুদ্ধ, সংঘর্ষ আর রক্তপাত। তারই মধ্য দিয়ে শক্তিশালীর ঘটেছে উত্তরণ। একের বিনাশে অপরের অস্তিত্ব হয়েছে সুরক্ষিত। আজও মানুষ ভুলতে পারে নি সেই রক্তাক্ত দিনের ভয়ংকর স্মৃতি। প্রাচীন বর্বর যুগের অসভ্য মানুষ আজকের সভ্য মানুষ হয়ে যুদ্ধের নির্মম অর্থ জেনে গেছে, যুদ্ধ নিয়ে আর নড় নয়, নয় প্রভুত্বের বিস্তারের বিলাসিতা। যুদ্ধ মানে আজ সপ্ততার বিনাশ, যুদ্ধ মানে এখন মানুষের অস্তিত্বের বিলোপ। তবে আজকের মতো পারমাণবিক যুদ্ধ কিংবা আধুনিক সব সমরাজ্ঞ নিয়ে প্রাচীনকালে যুদ্ধ হতো না। মুখের ভেল পল্টানোর সাথে সাথে পাল্টে গেছে মানুষের যুদ্ধ করার উপকরণ সমূহের।

যুদ্ধ কেন হয়?ঃ এক সময় মানুষ যুদ্ধ করতো নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য। হিংস্র জন্তু জানোয়ারের হাত থেকে বাঁচার জন্য মানুষ যুদ্ধ করত। আর এখন মানুষ যুদ্ধ করে নিজের ক্ষমতা আর অস্তিত্বের অস্তিত্ব এবং নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য। পাশাপাশি অন্যকে করংস করার জন্য, অন্যের সম্পদ দখল করার জন্য ও অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্যে মানুষ যুদ্ধ করছে। এছাড়া সম্প্রসারণশীলতার জন্য ভয়ানক যুদ্ধের উদাহরণ বিশ শতকের দুটি বিশ্বযুদ্ধ। মানুষ হিংসা দ্বেষ, লোভ লালসার বশবর্তী হয়েও এখন যুদ্ধ করছে।

যুদ্ধের ফলাফল: যুদ্ধের ফলাফল কখনো ভালো হয় না। যুদ্ধের ফলে অগণিত মানুষ জনপদ ধ্বংসের পাশাপাশি দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি আজ যুদ্ধের ভয়াবহতা ও ধ্বংসলীলা বাড়িয়ে দিয়েছে আধুনিক সমরাস্ত্র নির্মাণ করে। এজন্য বর্তমানে যুদ্ধবিগ্রহের ক্ষয়ক্ষতি মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী। আর আমেরিকা ও রাশিয়া অনবরত মেতে আছে শক্তির মদমত্তায়। নিজের শক্তির প্রকাশ ও আধিপত্য বিস্তারের জন্য আমেরিকা প্রতিনিয়ত যুদ্ধ করছে বিভিন্ন দেশের সাথে। নতুন নতুন মারণাস্ত্র আবিষ্কার ও এর বিস্তারেও নিয়োজিত আছে আমেরিকা। আফগানিস্তানে ও ইরাকে অসংখ্য লোককে মেরে ফেলেছে। জনপদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্থাপত্যশিল্প ধ্বংস করেছে আমেরিকা। এখানে মানবতার চরম অবমূল্যায়ন করেছে আমেরিকা। তেমনি ১৯৭১ সালেও পাকিস্তানীরা ৩০ লাখ মানুষকে হত্য করেছিল। যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞে আজ পুরো সভ্যতা বিপর্যস্ত। যুদ্ধের ধ্বংসলীলায় মানুষের যে ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে তা বর্ণনাতীত।

বিশ্ব পরিস্থিতির পরিবর্তন:

"তাই আমি চেয়ে দেখি প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত ধরে

ধরে দানবের সাথে আজ সংগ্রামের তরে"

- সুকান্ত ভট্টাচার্য

কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী দানবকে রুখবে কে? বর্তমান এককেন্দ্রিক বিশ্ব ব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষে পৃথিবী এখন মানুষের হাতের নাগালে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে একসময় সূর্য অস্ত যেত না। কিন্তু আজ সেসবই ইতিহাসমাত্র। বলশেভিক বিপ্লবের দুনিয়া কাঁপানো আওয়াজ একদিন সারা বিশ্বের শোষিত ও নিপীড়িত মানুষকে জাগিয়ে ভুলেছিল মুক্তির আকাঙ্ক্ষায়। কিন্তু অমিত ক্ষমতার অধিকার সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙন সে স্বপ্নকে নির্বাসিত করেছে। Time you old Gypsyman-এর মতে, সময় এখন আমেরিকার, বিশ্বের একক ক্ষমতাস্বত্ব শক্তি, দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, শাসিয়ে বেড়াচ্ছে সারা বিশ্বকে। এ মুহূর্তে বিশ্বের সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা এক বিশ্বকেন্দ্রিক। প্রযুক্তির উৎকর্ষে সামরিক ক্ষেত্রেই এসেছে বিরাট পরিবর্তন। তাই আমেরিকার বেড়লিতে সারাবিশ্ব ভয়ে চুপ, প্রতিবাদ করলেই সাদ্দামের মতো টুটি চেপে ধরবে। কিন্তু সভ্যতার রঙ্গমঞ্চে এ প্রেতনৃত্য করে বন্ধ হবে তা কী কেউ জানে?

বিগত যুদ্ধের অভিজ্ঞতা: সভ্যতার চলমানতায় মানুষ আপন ধীশক্তি দিয়ে খুঁজে নিল অজ্ঞাত শক্তির উৎস। ক্রমে সে হয়ে উঠল দানবীয় শক্তির অধিকারী। বিশ শতকে পরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ করল সেই দানবীয় শক্তির তাড়ন। জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকির মানুষ আজ ভুলতে পারে না সেই দুঃস্বপ্নের দিনগুলোকে। চোখের পলকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় জনপদ, কলসে যায় মানবতা, শিহরিত হয় গোটা বিশ্ববিবেক। বেদনায় আর্তনাদ করে ওঠে পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষ।

বিগত যুদ্ধের বিভীষিকা: বিশ শতকেই ঘটেছে দুই ভয়াবহ মহাযুদ্ধ প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৫-১৯১৯ এবং ১৯৩৯-১৯৪০)। এ যুদ্ধ অভীতের সব যুদ্ধকে ছাপিয়ে গেছে। কারণ এর বিস্তৃতি ঘটে গোটা বিশ্বময়। পৃথিবীর বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো বাঁপিয়ে পড়েছিল এক মরণ-যজ্ঞে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছিল বোমারু বিমান ও আধুনিক সমরাস্ত্র সজ্জিত যুদ্ধ জাহাজ। নিহত হয়েছিল সামরিক ও অসামরিক স্তরের চার কোটি চৌদ্দো লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার মানুষ। বিকলাঙ্গ হয়েছিল আরো দু কোটি মানুষ। সম্পদ ধ্বংস হয়েছিল তিরিশ বিলিয়ন ডলারের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত মানুষের সংখ্যা সর্বকালের রেকর্ড অতিক্রম করেছে। এ যুদ্ধে পাঁচ কোটি চল্লিশ লক্ষ মানুষের প্রাণ সংহার করে। বিকলাঙ্গ করে নয় কোটি মানুষকে। সম্পদ নষ্ট হয় চারশ বিলিয়ন ডলারের।

এ যুদ্ধে মানবসভ্যতার ইতিহাসে ঘণ্যতম আণবিক বোমা ব্যবহৃত হয় ১৯৪৫ সালের ৬ই এবং ৯ই আগস্ট জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে। চোখের পলকে দাউ দাউ আগুনে জ্বলে যায় দুটি সম্পদ সমৃদ্ধ জনপদ। তেজস্ক্রিয় বিষবাস্প ছড়িয়ে পড়ে শহরে গ্রামে। ধ্বংসের প্রলয়ঙ্কর রূপ দেখে শিহরিত হয় বিশ্ববিবেক। আতর্নাদ করে ওঠে পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষ।

অশান্ত বিশ্ব পরিস্থিতি: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ভিয়েতনাম যুদ্ধের দুঃসহ স্মৃতি এখনো মার্কিনীদের মনে কাঁটার মতো বিদ্ধ হয়। পাক-ভারত যুদ্ধ (১৯৬০), ইরান-ইরাক (১৩ বছর ব্যাপী), আফগানিস্তানের ভয়াবহত। আমাদের শান্তিকামী করে তোলে। সোমালিয়ার ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় প্রচণ্ডভাবে বিশ্ববিবেককে নাড়া দেয়। ফিলিস্তিনের প্রতিটি শিশুর অসহায় আতর্নাদ বিশ্ব বিবেককে নাড়া দিলেও শ্যারনের পাষণ্ড হৃদয় এজিদের মতো রক্তের হোলিখেলায় নেচে ওঠে। সারাবিশ্বে চলছে ভয়াবহ এক অশান্ত পরিস্থিতি, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি গোট পৃথিবীকে গিলে খাবার মতলবে আছে। সম্প্রতি শেষ হলো ইরাক যুদ্ধ। আফগানিস্তানের মাটি ক্লাস্টার বোমার আঘাতে অঙ্গার হয়েছে। লাশের গল্পে শকুনের উল্লাস বেড়েছে। তেমনি ইরাকের জনগনের তথাকথিত মুক্তির স্লোগানে লুটপাট হয়েছে সাড়ে পাঁচ হাজার বছরের সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিদর্শন, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে আধুনিক সভ্যতা। আধুনিক প্রযুক্তি মিসাইলের আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়েছে অসহায় শিশুর হাত, বুক ও দেহ। লাশের স্তূপে দাড়িয়ে মার্কিন ট্যাংক মুক্তির পতাকা উড়িয়েছে। সে পতাকা ইরাকের নয়, মার্কিনের। ইরাক আর ইরাক নেই, নব্য আমেরিকা যেন। ইরাক এখন আমেরিকার নতুন উপনিবেশ।

আধুনিক সমরাস্ত্রের ভয়াবহতাঃ মানবসভ্যতা আজ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশংকায় কম্পমান। সারাবিশ্বে যুদ্ধবাজদের যুদ্ধ প্রস্তুতি সাধারণ নিরীহ মানুষদের আতংকের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। পৃথিবীর শক্তিদর রাষ্ট্রগুলোর হাতে ভয়ানক সব মারণাস্ত্র সারা বিশ্বে মজুদ আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত বিস্ফোরণের চেয়ে দশ হাজার গুণ বেশি বিস্ফোরক। আণবিক বোমার চেয়ে চার প্রজারগুণ শক্তিশালী বোমার সংখ্যা এখন পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার। যুদ্ধ এখন জল ও স্থলের সীমানা ছাড়িয়ে আকাশে, গ্রহে ও উপগ্রহে। রাডারকে ফাঁকি দিয়ে মানুষ এখন উপগ্রহ, স্যাটেলাইটের মাধ্যমে গোয়েন্দাগিরি চালায়। দূরপাল্লার মিসাইল, আণবিক যুদ্ধজাহাজ, ভয়ংকর সব যুদ্ধ বিমান প্রস্তুত সভ্যতাকে ধ্বংসের জন্য। একটি মাত্র সুইচ টিপ দিলে কয়েক হাজার মাইল দূরের একটি সভ্যতা নিমিষেই ধুলিসাৎ হয়ে যেতে পারে।

পারমাণবিক বোমা: আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম ভয়ংকর আবিষ্কার পারমাণবিক অস্ত্র। আর যুদ্ধক্ষেত্রে এই পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার যে কতটা ভয়াবহ, তার প্রমাণ পাওয়া যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিশ বছর পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৪৫ সালের ৬৬৯ আগস্ট জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে পরমাণবিক বোমা বীভৎস আকার ধারণ করে। ভাগনিত মানুষের লাশ ও মানুষের অঙ্গহানি থেকে এটা বোঝা যায়, আজও মানুষ এর প্রভাব বহন করে চলেছে। এরপর থেকে শুরু হয় পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির এক মহা প্রতিযোগিতা।

যুদ্ধ নয় শান্তি: যুদ্ধ কোনো সাধারণ মানুষ কামনা করে না। সাধারণ মানুষ চায় যুদ্ধমুক্ত একটি সুন্দর ও শান্তির স্থান। শান্তি স্থাপনের জন্য তাই আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। অস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা ও অস্ত্রের ব্যবসা প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে। বিজ্ঞানকে যুদ্ধাস্ত্র তৈরিতে ব্যবহার না করে মানুষের কলয়নে নিয়োজিত করতে হবে। বর্ণবিদ্বেষ ও জাতিগত বিদ্বেষ দূর করে আমাদেরকে উদার মনের অধিকারী হতে হবে। পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এখন জাতিসংঘ কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কথা চিন্তা করে যুদ্ধ পরিহার করা উচিত।

যুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান: জাতিসংঘের সহযোগিতায় শান্তিকামী মানুষেরা 'যুদ্ধ নয় শান্তি চাই' স্লোগানে একই পতাকাতলে সমবেত হয়েছে। তাদের সাথে যোগ দিয়ে যুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে বিশ্বখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বিজ্ঞানী ও দার্শনিক। বিশ্ব শান্তির জন্য প্রতিবছর বিশেষ বাড়িকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হচ্ছে। দেশে দেশে ইত্তকের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ জনতার যুদ্ধবিরোধী স্লোগান শান্তির কথা বলে। বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ আবার একই ছায়াতলে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন, বৌমারেটলা আরি ককসে, ম্যাক্সিম গোর্কী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ

সোচ্চার নারীঘাতী ও শিশুঘাতী কুৎসিত যুদ্ধের বিরুদ্ধে। শিল্পীর তুলিতে, কবির কবিতায়, গানের সুরে, জীবনের উদ্দামতায় আজ ধ্বনিত হচ্ছে শান্তির বীজমন্ত্র।

বিশ্বশান্তি ও বাংলাদেশ: বাংলাদেশ সবসময়ই মধ্যপন্থী একটি শান্তিকামী দেশ। জাতিসংঘের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ সবসময়ই চেষ্টা করে ঐক্য ও শান্তি ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করার। যুদ্ধ নয় শান্তির এ আন্দোলনে বাংলাদেশের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ নিজেকে জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। বেড়েছে তার কণ্ঠস্বরের মর্যাদা। বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বিবদমান বিশ্বে শান্তি স্থাপনে ছিলেন উৎসাহী। রাষ্ট্রে রাষ্ট্র সহযোগিতা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, শান্তি, মৈত্রী ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা, অন্য রাষ্ট্রের বৈদেশিক বা অভ্যন্তরীণ নীতিতে হস্তক্ষেপ না করা ইত্যাদি হচ্ছে বর্তমানে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি। তাই বিশ্বের কোথাও যুদ্ধের ক্ষীণতম সম্ভাবনা সৃষ্টি হলে বাংলাদেশ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে।

১৯৮৬ সালকে বিশ্ব-শান্তিবর্ষ হিসেবে ঘোষণা: পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা আজ এক উদ্বেগজনক অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। বিশ্ব সামরিক খাতে ব্যয়বরাদ্দ বাড়ছে। অস্ত্র নির্মাণে ঢালাওভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি। এ ছাড়া গোটা বিশ্বে নানারকম সংঘাত, যুদ্ধ, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, অনাহার, রোগভোগ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত মানুষ। তাই জাতিসংঘের মন্ত্রসচিব ১৯৮৬ সালকে ঘোষণা করেছিলেন। আন্তর্জাতিক শান্তিবর্ষরূপে। এর ফলে রাষ্ট্রসংঘের সব সদস্যরাষ্ট্র ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনগুলো শান্তির সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পথ নির্দেশ করার সুযোগ পেয়েছে বিশ্ববাসীও জাতিসংঘের এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। সম্প্রতি আমেরিকার দ্বিতীয় বারের মতো ইরাক আক্রমণে বিশ্ব শান্তি আবারও সংকটের মুখে। আফগানিস্তান আক্রমণের মধ্যে দিয়ে সাহাজ্যবাদী এ দেশটির ফ্যাসিবাদী কার্যক্রম শুরু হয়েছে। অন্যান্য দেশগুলো প্রতিবাদ করছেই না বরং নানাভাবে ইন্ধন জোগাচ্ছে। সবচেয়ে শঙ্কার বিষয় খোদ মার্কিনর এ অন্যায় আক্রমণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেও খোদ জাতিসংঘ এবারও কাঠের পুতুলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এসব প্রেক্ষাপটে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় বিশ্ববাসী এর বিরুদ্ধে জোর জনমত গড়ে তুলেছে। কেবল 'শান্তি বর্ষ' ঘোষণা দিয়ে প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এজন্য জাতিসংঘকে নিতে হবে সাহসী ভূমিকা। বিশ্বশান্তি রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত এ প্রতিষ্ঠানটির নিকট সবাই এমনটিই প্রত্যাশা করে।

উপসংহার: যুদ্ধ মানেই ধ্বংস। যুদ্ধ মানেই দুর্ভিক্ষ, উপবাস, মৃত্যু। যুদ্ধ মানেই রক্তের হোলিখেলা, লাশের স্তুপ ও সাভার বিনাশ। পৃথিবীবাসী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে ধ্বংস, মুক্ত, মহামহত্ত্বের রক্তাক্ত আত্মদ পেয়েছে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হলে তা হবে আরও ভয়াবহ। মানুষ আজ প্রতিবাদমুখর যুদ্ধবাজ অস্ত্র ব্যবসায়ীদের ঘণ্য চক্রান্ত রুখতে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে গোটা বিশ্ববাসী আজ প্রতিরোধী সৈনিক, শান্তির জাগ্রত প্রহরী। তাই যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশ্ব আজ সোচ্চার, শান্তির পক্ষে পালন করছে অগ্রণী ভূমিকা। বিশ্বজুড়ে মানুষের সম্মিলিত শুভবুদ্ধির প্রতিরোধমূলক তৎপরতায় যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আজ প্রতিহত, নিষ্ক্রিয় হতে চলেছে। শেষ বেলায় তাই কবি আহসান হাবিবের কণ্ঠে বলতে চাই-

"আমাকে সেই অস্ত্র ফিরিয়ে দাও

সভ্যতার সেই প্রতিশ্রুতি

সেই অমোঘ অনন্য

অস্ত্র আমাকে ফিরিয়ে দাও।

(ঙ) তথ্যপ্রযুক্তি ও বাংলাদেশ

উত্তরঃ

তথ্য প্রযুক্তি ও বাংলাদেশ

ভূমিকা: মানব কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানকে কাজে লাগানোর কৌশলই হলো প্রযুক্তি। আধুনিককালে মানব জীবনের সাথে প্রযুক্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তথ্য ও প্রযুক্তি প্রতি মুহূর্তে আমাদের কাজে লাগে। মানুষ বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে তথ্য প্রযুক্তির সেবা গ্রহণ করে আসছে। যেমন- মোবাইল, টেলিফোন, কম্পিউটার, সফটওয়্যার, নেটওয়ার্ক, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি। তথ্য প্রযুক্তি

বিশ্বজুড়ে যেমন অভাবনীয় পরিবর্তন এনেছে, তেমনি দেশ ও জাতির অগ্রগতিতে অপরিহার্য অবদান রাখছে। তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে বেকার মানুষ কর্মসংস্থানের সন্ধান পেয়েছে, আর্থনীতিক উন্নতি হয়েছে, জনশক্তি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তি: তথ্যপ্রযুক্তি হলো তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াকরণ এবং সরবরাহের জন্য ব্যবহৃত প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মিলিত ও সুশৃঙ্খল রূপ। তথ্য- প্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো হলো- কম্পিউটিং, মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন, ডাটাবেস উন্নয়ন, বিনোদন, তথ্যভান্ডার, নেটওয়ার্ক, সফটওয়্যার উন্নয়ন, মুদ্রণ ও রিপ্ৰোগ্রাফিক, ডিশ অ্যান্টেনা ইত্যাদি।

তথ্যপ্রযুক্তি ও বাংলাদেশ: আধুনিককালে বিশ্বজুড়ে তথ্যপ্রযুক্তির জয়জয়কার ধ্বনিত হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তির হাত ধরে বিশ্ব এখন মানুষের হাতের মুঠোয়। বাংলাদেশও এ প্রযুক্তি থেকে পিছিয়ে নেই। গত দশ বছর ধরে বাংলাদেশে ক্রমান্বয়ে প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেছে। স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ দেশব্যাপী তরুণ প্রজন্ম তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপারে খুবই আগ্রহী। বাংলাদেশের বিভিন্ন জরিপ সংস্থার তথ্যসূত্রে জানা যায়- গত দশ বছরে আমাদের দেশ তথ্যপ্রযুক্তির প্রতিটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে।

জাতীয় উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তি: আধুনিক বিশ্বে দেশ ও জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য। বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রতিটি দেশেই দিন দিন তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বেড়ে চলেছে। বিভিন্ন দেশে এখন অসংখ্য তথ্যপ্রযুক্তির প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। শিক্ষা, চিকিৎসা, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসায়-বাণিজ্য, ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, ইন্টারনেট ও তথ্যপ্রযুক্তির দোকান দিয়ে মানুষ খুব ভালো ব্যবসাও করছে। তাছাড়া তথ্যপ্রযুক্তির নানা প্রোগ্রামের ওপর মেলা প্রদর্শনী, প্রতিযোগিতা, সেমিনার ইত্যাদির আয়োজনে করা হয়। আর এই জন্যই তথ্যপ্রযুক্তি দ্রুত দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে এবং দেশ ও জাতির উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে।

তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশে সরকারের অবদান : তথ্যপ্রযুক্তি দেশের উন্নয়নে অবদান রাখে বলে বাংলাদেশ সরকার তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেছে:

১. তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার দেশের অভ্যন্তরীণ গ্রাম এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করে প্রায় সারা দেশকে ডিজিটাল টেলিফোন ও ইন্টারনেটের আওতায় এনেছে।
২. বাংলাদেশ সরকার তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশে জাতীয় যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালা অনুমোদন করে ঢাকার কারওয়ান বাজারে অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত একটি 'আইসিটি ইনকিউবেটর' স্থাপন করেছে। এটি ১০ হাজার বর্গফুট এলাকা জুড়ে অবস্থিত।
৩. বাংলাদেশ থেকে সফটওয়্যার ও তথ্যপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট পণ্য বিদেশে বাজারজাতকরণের জন্য বাংলাদেশ সরকার 'আইসিটি বিজনেস প্রমোশন সেন্টার' স্থাপন করেছে।
৪. তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য গাজীপুরের কালিয়াকৈরে হাইটেক পার্ক স্থাপন করা হয়। পার্কটি ২৬৫ একর জমির ওপর অবস্থিত। এতে প্রযুক্তির বিভিন্ন স্থাপনা রয়েছে।
৫. দেশের প্রতিটি স্কুলে সরকারি উদ্যোগে কম্পিউটার প্রদান করা হয়েছে এবং মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে কম্পিউটার শিক্ষা কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছে। তাছাড়া কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য আইসিটি ইন্টারন্যাশনাল কর্মসূচি চালু করা হয়েছে।

জাতীয় জীবনে তথ্যপ্রযুক্তির গুরুত্ব: এক সময়কার দরিদ্র বাংলাদেশ বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সালের মধ্যে এই দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার ঘোষণা দিয়েছেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকারের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করতে হলে তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া এত দ্রুত জাতীয় উন্নয়নে বিপ্লব ঘটানোর সম্ভব হবে না। সুতরাং অর্থনীতি শিক্ষা, চিকিৎসাসহ সকল ক্ষেত্রেই দ্রুতগতিতে তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার ঘটাতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব দিতে হবে:

আর্থিক উন্নতি: আমাদের দেশ ও জাতির উন্নয়নের জন্য সর্বাগ্রে আর্থিক উন্নতির প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। কেননা অর্থনীতিই পারে দেশের উন্নতির চাকা ঘোরাতে। আর্থিক উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখছে তথ্যপ্রযুক্তি। এশিয়া মহাদেশের দেশগুলোর মধ্যে যে দেশগুলোতে তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের জোয়ার বইছে তার মধ্যে ভারত শীর্ষে। এদিক থেকে বাংলাদেশ একটু পিছিয়ে থাকলেও বাংলাদেশের আর্থিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখছে তথ্যপ্রযুক্তি। আমাদের দেশে এখন কম্পিউটার সফটওয়্যার তৈরি হচ্ছে। আমাদের দেশ থেকে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকার সফটওয়্যার বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। আগামী দিনে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি প্রয়োগে: বিশ্বব্যাপী প্রতিনিয়তই চলছে টিকে থাকার প্রতিযোগিতা। বিশ্ব দরবারে টিকে থাকার জন্য আমাদের প্রয়োজন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক কোর্স চালু করা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষা কোর্স চালু করতে হবে। বিশ্বব্যাপী চাহিদার কথা বিবেচনা করে তথ্যপ্রযুক্তির নবায়ন করতে হবে। তাছাড়া সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের তথ্যপ্রযুক্তিতে জ্ঞানার্জনের সুযোগ দিতে হবে এবং প্রতিটি স্কুল-কলেজে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে বেকারত্বের অবসান: আমাদের দেশে যুব-সমাজে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হলো বেকারত্ব। বাংলাদেশে দিন দিন বেকার সমস্যা বেড়েই চলেছে। কিন্তু আমাদের দেশের বেকারদের জন্য সুখবর হচ্ছে বর্তমান যুগে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বেকারদের জন্য কর্মসংস্থানের নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, ইন্টারনেট, ফেসবুক ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রায় দশ হাজার প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। আর এ সকল প্রতিষ্ঠান প্রায় লক্ষাধিক বেকার যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে।

জনশক্তি উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তি: একটি দেশের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তি। আর সাধারণ জনগণকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করতে প্রয়োজন তথ্যপ্রযুক্তির সমৃদ্ধ জ্ঞান। তথ্যপ্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ হলেই আমাদের জনশক্তি দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত হওয়া সম্ভব। আর জনশক্তি দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত হলেই দেশের আর্থনীতিক উন্নতি সম্ভব। বর্তমান বিশ্বে যে জাতি তথ্যপ্রযুক্তিতে যত বেশি সমৃদ্ধ সে জাতি তত বেশি উন্নত।

তথ্যপ্রযুক্তিহীন কোনো জাতিই উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে পারে না। তাই বাংলাদেশের সরকারের উচিত দেশ ও জাতির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলে।

ব্যবসায়-বাণিজ্যে তথ্যপ্রযুক্তি: বর্তমান যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি এক নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে। এখন ঘরে বসেই ই-মেইল, ই-কমার্স, ই-নেট ইত্যাদি প্রযুক্তির মাধ্যমে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই ব্যবসা-বাণিজ্যের খোঁজ-খবর রাখতে পারছে। আর এটা সম্ভব হচ্ছে শুধু তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে। ঘরে বসে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই মুহূর্তের মধ্যে দেশ-বিদেশে উৎপাদিত পণ্য এবং বাজার দর সম্পর্কে অবগত হতে পারছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে পণ্যের অর্ডার দেওয়া-নেওয়া হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ যদি এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারে, তাহলে আমরা আর্থনীতিক দিক থেকে উন্নতির শিখরে পৌঁছতে পারব।

উপসংহার: বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিকদের সবচেয়ে বিপ্লবকর আবিষ্কার তথ্যপ্রযুক্তি। মানুষ ঘরে বসে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় দূরের মানুষের সাথে যোগাযোগ থেকে শুরু করে কেনা-বেচার কাজও করছে। তথ্যপ্রযুক্তি-বিদ্যা কাজে লাগিয়ে মানুষ বেকারত্ব দূর করতে পারছে। অনেকে ঘরে বসেই উপার্জন করতে পারছে। প্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া এক মুহূর্তও চলা সম্ভব নয়। তাই বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশকেও প্রযুক্তিনির্ভর হতে হবে এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে আর্থনীতিক উন্নতিতে অবদান রাখতে হবে। বাংলাদেশের জনগণকে প্রযুক্তিসমৃদ্ধ দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করতে হবে।

✨ ধন্যবাদ! ✨

কোন প্রশ্নের বানান বা উত্তর ভুল থাকলে রিপোর্ট করুন | *Thank you for reading!*

আরও দেখুন: sattacademy.com

⚠ Sattacademy -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ

sattacademy.com | [+880 1306 446390](tel:+8801306446390)

স্যাট একাডেমি



মডেল ৩

লিখিত প্রশ্ন

(১)

(ক) 'ব' ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো।

উত্তরঃ উদাহরণসহ 'ব'-ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়মঃ

১. 'ব' অথবা 'ম'-এর সাথে ব-ফলা যুক্ত হলে 'ব'-এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যেমন- লম্ব (লম্বো), বিম্ব (বিম্বো) প্রভৃতি।
২. প্রথম ব্যঞ্জনবর্ণে ব-ফলা সংযুক্ত হলে সে ব-ফলার কোনো উচ্চারণ হয় না। যেমন- স্বনাম (শনাম), ধ্বনি (ধ্বনি), স্বাধিকার (শাধিকার), স্বদেশ (শদেশ), স্বাগত (শাগতো) প্রভৃতি।
৩. শব্দের মধ্যে কিংবা শেষে ব-ফলা থাকলে সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ-দ্বিত্ব ঘটে থাকে। যেমন- বিশ্ব (বিশ্বো), বিদ্বান (বিদ্বান) প্রভৃতি।
৪. উৎ (উদ্) উপসর্গযোগে গঠিত শব্দের 'ৎ' (দ)-এর সাথে ব-ফলার 'ব' বাংলা উচ্চারণে লুপ্ত হয় না। যেমন- উদ্বেগ (উদ্বেগ), উদ্বোধন (উদ্বোধন) প্রভৃতি।
৫. বাংলা শব্দে 'ক' থেকে সন্ধির সূত্রে আগত 'গ'-এর সাথে ব-ফলা যুক্ত হলে 'ব'-এর উচ্চারণ অপরিবর্তিত থাকবে। যেমন- দিগ্বিদিক (দিগ্বিদিক), দিগ্বলয় (দিগ্বলয়), দিগ্বিজয় (দিগ্বিজয়) প্রভৃতি।

অথবা

(খ) নিচের যেকোনো পাঁচটি শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ লেখো :

অধ্যক্ষ

উত্তরঃ অধ্যক্ষ = ওদ্বোধক্খো

ব্যতীত

উত্তরঃ ব্যতীত = বেতিতো

খেলা

উত্তরঃ খেলা = খ্যালা

শ্মশান

উত্তরঃ শ্মশান = শঁশান্

সুস্মিতা

উত্তরঃ সুস্মিতা = শুস্মিতা

গদ্য

উত্তরঃ গদ্য = গোদ্দো

উদ্বিগ্ন

উদ্বিগ্ন = উদ্বিগ্ন

উত্তরঃ

পরীক্ষা

উত্তরঃ পরীক্ষা = পোৱিক্খা

(১১)

(ক) দেশগঠনে ছাত্রসমাজের ভূমিকা প্রসঙ্গে দুই বন্ধু আকসা ও আরিশার মধ্যে একটি সংলাপ উপস্থাপন করো।

উত্তরঃ দেশগঠনে ছাত্রসমাজের ভূমিকা প্রসঙ্গে দুই বন্ধু আকসা ও আরিশার মধ্যে একটি সংলাপ নিচে উপস্থাপন করা হলো:

আকসা: কেমন আছিস আরিশা? আজ ক্লাসে দেশগঠনে তরুণ প্রজন্মের ভূমিকা নিয়ে স্যার যা বললেন, সেটা নিয়ে ভাবছিলাম।

আরিশা: ভালো আছি আকসা। হ্যাঁ, স্যারের কথাগুলো সত্যিই চিন্তার খোরাক জোগায়। আসলে আমাদের মতো ছাত্রসমাজের ওপরই তো দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

আকসা: একদম ঠিক। কিন্তু আমার মনে হয়, ছাত্রবৃত্তায় আমরা পড়াশোনা বাদ দিয়ে কীভাবে দেশগঠনে বড় ভূমিকা রাখতে পারি?

আরিশা: দেশগঠন মানেই তো শুধু বড় কোনো পদে গিয়ে কাজ করা নয়। একজন ছাত্র হিসেবে নিজের পড়াশোনাটা ঠিকঠাক করাও দেশগঠনের অংশ। আমরা যদি সুশিক্ষিত ও দক্ষ নাগরিক হতে পারি, তবেই তো দেশকে এগিয়ে নিতে পারব।

আকসা: তা অবশ্য সত্যি। তবে শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই কি যথেষ্ট? আমাদের কি সামাজিক কোনো দায়িত্ব নেই?

আরিশা: অবশ্যই আছে। দেখ, আমরা পড়াশোনার পাশাপাশি রক্তদান কর্মসূচি, বৃক্ষরোপণ, কিংবা পথশিশুদের শিক্ষা দেওয়ার মতো স্বেচ্ছাসেবী কাজে অংশ নিতে পারি। এগুলোও কিন্তু দেশ গড়ার একেকটি ধাপ।

আকসা: তুই ভালো একটা পয়েন্ট বলেছিস। এছাড়া বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে আমরা কিন্তু ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে কুসংস্কার, সাইবার অপরাধ আর অন্যান্যের বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি করতে পারি।

আরিশা: চমৎকার বলেছিস! তাছাড়া আমাদের দেশের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়—বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান, সবখানেই ছাত্রসমাজ অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

আকসা: একদম তাই। ছাত্ররা সবসময়ই পরিবর্তনের অগ্রদূত। তবে আমার মনে হয়, আমাদের নিজেদের মধ্যে আগে দেশপ্রেম, সততা আর নৈতিকতা গড়ে তুলতে হবে। দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়তে হলে আমাদের নিজেদেরও লোভ-লালসার উর্ধ্ব থাকতে হবে।

আরিশা: তুই ঠিক ধরেছিস। মাদক, দুর্নীতি ও অপসংস্কৃতি থেকে নিজেদের দূরে রাখা এবং চারপাশের মানুষকে সচেতন করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব। আমরা যদি এখন থেকেই দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে আচরণ করি, তবেই একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।

আকসা: তোর সাথে কথা বলে আমার ভাবনাগুলো আরও পরিষ্কার হলো আরিশা। চল, আমরা নিজেদের জায়গা থেকে দেশের জন্য অন্তত ছোট ছোট ইতিবাচক কাজ শুরু করি।

আরিশা: হ্যাঁ, চল। আজ থেকেই শুরু হোক আমাদের সেই চেষ্টা। ভালো থাকিস আকসা।

আকসা: তুইও ভালো থাকিস আরিশা। ধন্যবাদ।

অথবা

(খ) 'রক্তদানে পুণ্য' শীর্ষক শিরোনামে খুদেগল্প রচনা করো।

উত্তরঃ **রক্তদানে পুণ্য**

মেডিকেল কলেজের বারান্দায় অস্থিরভাবে পায়চারি করছিলেন রহমান সাহেব। তার একমাত্র মেয়ে নিপার অ্যাপেনডিসাইটিস অপারেশন চলছে। হঠাৎ ওটি (ওপারেশন থিয়েটার) থেকে ডাক্তার বের হয়ে বললেন, "রোগীর প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে। অবিলম্বে 'ও নেগেটিভ' (O-) রক্ত লাগবে। আমাদের ব্লাড ব্যাংকে এই গ্রুপের রক্ত এখন নেই। দ্রুত ব্যবস্থা করুন।"

রহমান সাহেবের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। ও নেগেটিভ অত্যন্ত দুর্লভ রক্তের গ্রুপ। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাইকে ফোন করলেন, কিন্তু কারও সাথেই গ্রুপ মিলল না। ওদিকে ওটির দেয়ালের লাল আলোটা নিপার জীবনের শেষ মুহূর্তের মতো দপদপ করছে। অসহায় বাবা হাসপাতালের মেঝেতে বসে কাঁদতে লাগলেন। ঠিক তখনই পাশে এসে দাঁড়াল এক তরুণ। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ, পরনে সাধারণ পোশাক। সে রহমান সাহেবের কাঁধে হাত রেখে বলল, "চাচা, আপনি কাঁদবেন না। আমার রক্তের গ্রুপ ও নেগেটিভ। আমি রক্ত দেব।" রহমান সাহেব চমকে তাকালেন। ছেলেটির চোখে এক অদ্ভুত শান্ত আশ্বাস। দ্রুত তাকে ওটিতে নিয়ে যাওয়া হলো। রক্ত দেওয়ার পর নিপার অপারেশন সফলভাবে শেষ হলো। ডাক্তার এসে জানালেন, মেয়ে এখন সম্পূর্ণ শঙ্কামুক্ত।

আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় রহমান সাহেবের চোখ ভিজে এল। তিনি পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে ছেলেটির হাতে দিতে চাইলেন। ছেলেটি মৃদু হেসে টাকাটা সরিয়ে দিল। বলল, "চাচা, টাকার বিনিময়ে রক্ত দিলে তো তা ব্যবসা হয়ে যেত। মানুষের জীবন বাঁচানোর যে আনন্দ, তার কোনো মূল্য হয় না। আমাদের ধর্মে ও মানবতার দৃষ্টিতে রক্তদানে যে পুণ্য ও আত্মতৃপ্তি আছে, সেটাই আমার সবচেয়ে বড় পুরস্কার।" কথাটা বলে ছেলেটি ভিড়ের মাঝে হারিয়ে গেল। রহমান সাহেব পরম মমতায় মেয়ের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন, সৃষ্টিকর্তা কোনো কোনো মানুষকে পৃথিবীতে পুণ্য অর্জনের জন্য একদম দেবদূতের মতো পাঠান। রক্তদান যে আসলেই কত বড় পুণ্য, তা আজ তিনি নিজের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করলেন।

(১০)

(ক) সারাংশ লেখো:

আজকের দুনিয়াটা আশ্চর্যভাবে অর্থের বা বিভূতির উপর নির্ভরশীল। লাভ ও লোভের দুর্নিবার গতি কেবল আগে যাবার নেশায় লক্ষহীন প্রচণ্ড বেগে শুধুই বিনাশের পথে এগিয়ে চলেছে। মানুষ যদি এ মূঢ়তাকে জয় না করতে পারে, তবে মনুষ্যত্ব কথাটাই হয়তো লোপ পেয়ে যাবে। মানুষের জীবন আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে সেখান থেকে আর হয়তো নামবার উপায় নেই, এবার উঠবার সিঁড়ি না খুঁজলেই নয়।

উত্তরঃ সারাংশ: বর্তমান পৃথিবীতে মানুষ নেশাগ্রস্তের মতো ধন সম্পদের পেছনে ধাবমান। অর্থের এ অন্ধ নেশা মানুষের আত্মবিনাশের পথকেই প্রশস্ত করছে। অথচ এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য এখনই এ নেশা পরিত্যাগ করা প্রয়োজন।

অথবা

(খ) ভাবসম্প্রসারণ করো:

রাত যত গভীর হয়, প্রভাত তত নিকটে আসে।

উত্তরঃ **মূলভাব:** মানবজীবনে সুখ ও দুঃখ পালাক্রমে আসে। দুঃখ যত বাড়তে থাকে, তত সুখ নামক সোনার হরিণ কাছে পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

সম্প্রসারিত ভাব: মানুষকে অস্তিত্বের লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েই নিরন্তর সংগ্রাম করতে হয়। জীবনে পদে পদে বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করে মানুষকে পথ চলতে হয়। একই ধারায় জীবন প্রবাহিত হবে এমনটি প্রত্যাশা করা কোনোভাবেই ঠিক নয়। জীবনপথের সকল কাঁটা নিজ হাতে উপড়ে ফেলে সাফল্যের দিকে, অগ্রগতির দিকে মানুষকে এগিয়ে যেতে হয়। রাতের পর যেমন আসে উজ্জ্বল সোনালি সকাল, তেমনই দুঃখের পরও আসে সুখ। কারো জীবনই শুধু দুঃখ দিয়ে গড়া নয়; আবার কারো জীবনেই নিরন্তর সুখ থাকে না। সুখ ও দুঃখের পালাবদল ঘটে। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব বলেই যোগ্যতা, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য ও মনোবল দিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয় তাকে। দুঃখকে জয় করেই সুখকে লাভ করতে হবে। এটি খুব সহজ কাজ নয়। নিরন্তর সাধনার মাধ্যমেই সুখকে লাভ করা সম্ভব হয়।

মন্তব্য: সুখ-দুঃখ নিয়েই মানুষের জীবন। কেউই নিরন্তর দুঃখী কিংবা সুখী নয়; বরং সুখ-দুঃখ মানুষের জীবনে পালাক্রমে আসে। তাই দুঃখে ধৈর্যহারা হওয়া চলবে না। মনে রাখতে হবে, দুঃখের পর অবশ্যম্ভাবীভাবে সুখ আসবেই; এটাই দুনিয়ার নিয়ম।

(৯)

(ক) মোবাইল ফোন অপব্যবহারের ক্ষতিগুলো উল্লেখ করে বন্ধুকে প্রেরণের জন্য একটি ই-মেইল রচনা করো।

উত্তরঃ To: rahim123@email.com

Subject: মোবাইল ফোনের অপব্যবহার সম্পর্কে কিছু জরুরি কথা

প্রিয় রাহিম,

আশা করি তুমি ভালো আছো। তোমার পড়াশোনা ও দৈনন্দিন জীবন খুব ভালোভাবে চলছে বলেই আমি ধরে নিচ্ছি। আজ আমি তোমাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে লিখছি — **মোবাইল ফোনের অপব্যবহার**।

আমরা সবাই জানি, মোবাইল ফোন আজকের যুগে একটি অপরিহার্য ডিভাইস। এটি আমাদের যোগাযোগ, তথ্য সংগ্রহ ও বিনোদনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, অনেকেই এর **অপব্যবহার করছে**, যার ফলে সমাজে এবং ব্যক্তি জীবনে **বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রভাব** দেখা যাচ্ছে।

অনেক শিক্ষার্থী মোবাইল ফোনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা **গেম, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বা ইউটিউব** নিয়ে ব্যস্ত থাকে, ফলে তারা পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ হারায়। এছাড়াও অতিরিক্ত সময় স্ক্রিনে তাকিয়ে থাকায় **দৃষ্টিশক্তির সমস্যা, ঘুমের ব্যাঘাত এবং মানসিক চাপ** তৈরি হয়। সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো, অনেকেই মোবাইল ব্যবহার করে **অশোভন কনটেন্ট** দেখে, যা নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এছাড়া মোবাইল ফোনের মাধ্যমে **বিভিন্ন ধরনের গুজব, ভুয়া খবর এবং সাইবার অপরাধ** ছড়ানো সম্ভব, যা সমাজে **বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি** করে। তাই আমাদের উচিত — প্রযুক্তিকে যেমন কাজে লাগানো, তেমনি এর অপব্যবহার থেকে **নিজে** এবং অন্যদের **রক্ষা** করা।

তুমি একজন সচেতন মানুষ, তাই আমি বিশ্বাস করি তুমি এ বিষয়ে সতর্ক থাকবে এবং অন্যদেরও সচেতন করতে এগিয়ে আসবে।

ভালো থেকে। সময় পেলে উত্তর দিও।

ইতি,

তোমার বন্ধু

করিম

অথবা

(খ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য একটি আবেদনপত্র লেখো।

উত্তরঃ তারিখ: ১২ জুন, ২০২৬

বরাবর,

প্রধান শিক্ষক,

[বিদ্যালয়ের নাম]

[বিদ্যালয়ের ঠিকানা]

বিষয়: **সহকারী শিক্ষক পদে নিয়োগের জন্য আবেদন।**

জনাব,

সবিনয় নিবেদন এই যে, গত [বিজ্ঞপ্তির তারিখ] তারিখে [পত্রিকার নাম/অনলাইন জব পোর্টাল]-এ প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, আপনার ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয়ে শূন্য পদে 'সহকারী শিক্ষক' নিয়োগ করা হবে। আমি উক্ত পদের জন্য একজন আগ্রহী প্রার্থী হিসেবে আপনার নিকট আবেদন পেশ করছি।

আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি নিচে উপস্থাপন করা হলো:

ব্যক্তিগত তথ্যাবলি (Bio-data):

- নাম: [আপনার পূর্ণ নাম]
- পিতার নাম: [আপনার পিতার নাম]
- মাতার নাম: [আপনার মাতার নাম]
- স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: [গ্রামের নাম], ডাকঘর: [ডাকঘরের নাম], উপজেলা: [উপজেলার নাম], জেলা: [জেলার নাম]
- বর্তমান ঠিকানা: [আপনার বর্তমান যোগাযোগের ঠিকানা]

- জন্ম তারিখ: [আপনার জন্ম তারিখ]
- জাতীয়তা: বাংলাদেশী
- ধর্ম: [আপনার ধর্ম]
- মোবাইল নম্বর: [আপনার সচল মোবাইল নম্বর]
- ই-মেইল: [আপনার ই-মেইল ঠিকানা]

শিক্ষাগত যোগ্যতা (Educational Qualifications):

পরীক্ষার নাম	পাসের সন	বিভাগ/জিপিএ	বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়
বি.এড (B.Ed)	[পাসের সন]	[জিপিএ/শ্রেণী]	[বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম]
এম.এ / এম.এস.সি	[পাসের সন]	[জিপিএ/শ্রেণী]	[বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম]
বি.এ / বি.এস.সি (অনার্স)	[পাসের সন]	[জিপিএ/শ্রেণী]	[বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম]
এইচ.এস.সি (HSC)	[পাসের সন]	[জিপিএ]	[বোর্ডের নাম]
এস.এস.সি (SSC)	[পাসের সন]	[জিপিএ]	[বোর্ডের নাম]

অতিরিক্ত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা (যদি থাকে):

- [অন্য কোনো স্কুলে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকলে তা ১-২ লাইনে উল্লেখ করুন]
- কম্পিউটার চালনায় মৌলিক দক্ষতা (MS Office, Internet Browsing) এবং ডিজিটাল ক্লাসরুম পরিচালনায় পারদর্শী।

অতএব, বিনীত প্রার্থনা এই যে, আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে আমাকে উক্ত পদের অনুকূলে ইন্টারভিউ দেওয়ার সুযোগ দানে বাধিত করবেন।

বিনীত,

[আপনার স্বাক্ষর]

([আপনার নাম])

(৮)

(ক) কলেজের প্রথম দিনের অনুভূতি ব্যক্ত করে একটি দিনলিপি লেখো।

উত্তরঃ দিনলিপি

তারিখ: ১ জুলাই ২০২৫

দিন: মঙ্গলবার

স্থান: আমার রুম

আজ আমার জীবনের একটি বিশেষ দিন—কলেজে আমার প্রথম দিন। সকাল থেকেই মনে এক অদ্ভুত অনুভূতি কাজ করছিল। একদিকে নতুন পরিবেশে যাওয়ার আনন্দ, অন্যদিকে অপরিচিত মুখগুলোর মাঝে কেমন যেন একটু ভয়ের মতোও লাগছিল।

সকাল সাতটার দিকে আমি তৈরি হয়ে নিলাম। নতুন পোশাক পরে আয়নায় নিজেকে দেখে মূদু একটা হাসি দিয়ে নিলাম। বাবা আমাকে কলেজ পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। কলেজের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল, জীবনের এক নতুন অধ্যায়ে পা রাখছি।

কলেজের চত্বর ছিল প্রাণচঞ্চল। কেউ কেউ বন্ধুদের সঙ্গে গল্পে মশগুল, কেউবা নিজের মতো একা একা হেঁটে চলেছে। আমি একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে চারপাশে তাকিয়ে দেখছিলাম। হঠাৎ এক সহপাঠী এগিয়ে এসে হাসিমুখে পরিচিত হলো। তার নাম রায়হান। ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে কিছুটা স্বস্তি পেলাম।

প্রথম ক্লাস ছিল বাংলা। শিক্ষক ছিলেন মৃদুভাষী ও অভিজ্ঞ। তিনি শুধু পাঠ্যসূচির কথা বললেন না, কলেজজীবনের গুরুত্ব, সময়ের সঠিক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা এবং কীভাবে নিজেকে একজন ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হয়—তা নিয়েও সুন্দর আলোচনা করলেন। কথাগুলো মনে গভীর ছাপ ফেলল।

এরপর একে একে ইংরেজি, গণিত ও তথ্যপ্রযুক্তির ক্লাস হলো। প্রত্যেক শিক্ষকই নতুন পরিবেশে আমাদের স্বাগত জানালেন এবং পড়াশোনার প্রতি মনোযোগী হওয়ার অনুরোধ করলেন। তাদের আন্তরিকতা আমাকে মুগ্ধ করল।

বিরতির সময় অনেক নতুন বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় হলো। কেউ এসছে মফস্বল শহর থেকে, কেউবা একেবারে গ্রামাঞ্চল থেকে। সবাই এতটা সহজভাবে মিশে গেলাম যেন বহুদিনের পরিচয়।

কলেজের লাইব্রেরিতে ঢুকেও মন ভালো হয়ে গেল। এত বই দেখে মনে হলো, জ্ঞান ও স্বপ্নের এক বিশাল ভান্ডারে পা রেখেছি। নিজেকে একটু গর্বিতও লাগল—এত বড় একটা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী হতে পেরে।

সারাদিনে ক্লাস্টি থাকলেও মনটা ছিল ভরপুর আনন্দে। মনে হচ্ছিল, আজ নতুনভাবে জীবন শুরু হলো। এই কলেজজীবনই একদিন আমার ভবিষ্যতের ভিত্তি হয়ে দাঁড়াবে—এই বিশ্বাস আজ আরও দৃঢ় হলো।

আজকের দিনটি আমি কোনোদিন ভুলব না। জীবনের এই নতুন অধ্যায়ের প্রথম পাতাটি আজ খুলে গেল। আল্লাহর কাছে দোয়া করি—এই পথ যেন সুন্দর হয়, সফল হয়।

অথবা

(খ) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণ এবং এর প্রতিকার সম্বন্ধে পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

উত্তরঃ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও প্রতিকার বিষয়ে পত্রিকায় প্রকাশের উপযোগী একটি প্রতিবেদন নিচে প্রস্তুত করা হলো:

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি: কারণ ও প্রতিকার

নিজস্ব প্রতিবেদক: বর্তমানে দেশের সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের সবচেয়ে বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের আকাশচুম্বী দাম। চাল, ডাল, তেল, পেঁয়াজ থেকে শুরু করে কাঁচাবাজারের প্রতিটি পণ্যের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর জন্য সংসার চালানো এখন এক কঠিন সংগ্রাম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মূল্যবৃদ্ধির প্রধান কারণসমূহ:

- **সিভিকিট ও অসাধু ব্যবসায়ী:** একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী কৃত্রিম সংকট তৈরি করে পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়।
- **মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাণ্ড্য:** কৃষক যে দামে পণ্য বিক্রি করেন, ভোক্তাদের তা কিনতে হয় কয়েক গুণ বেশি দামে। মাঝখানের ফড়িয়া বা দালালরা অতিরিক্ত মুনাফা লুটে নেয়।
- **জালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি:** পরিবহন খরচ বাড়ার কারণে সরাসরি প্রভাব পড়ে পণ্যের মূল্যের ওপর।
- **চাঁদাবাজি:** পণ্যবাহী ট্রাকে বিভিন্ন মহাসড়কে অবৈধ চাঁদা আদায়ের কারণে পণ্যের দাম বাড়ে।
- **আন্তর্জাতিক বাজার:** বিশ্ববাজারে কাঁচামাল ও আমদানি পণ্যের দাম বৃদ্ধি এবং ডলারের সংকটও এর জন্য দায়ী।

কার্যকর প্রতিকার ও করণীয়:

- **বাজার মনিটরিং:** সরকারি পর্যায়ে নিয়মিত এবং কঠোরভাবে বাজার তদারকি করতে হবে।
- **সিভিকিট ভাঙা:** কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিকারী অসাধু ব্যবসায়ীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।
- **টিসিবির কার্যক্রম বৃদ্ধি:** কম আয়ের মানুষের জন্য টিসিবির (TCB) মাধ্যমে সুলভ মূল্যে পণ্য বিক্রির আওতা বাড়তে হবে।
- **পরিবহন ব্যয় ও চাঁদাবাজি রোধ:** পণ্য পরিবহনে সব ধরনের চাঁদাবাজি কঠোর হস্তে দমন করতে হবে।

- সরাসরি বাজারজাতকরণ: কৃষকরা যাতে কোনো মধ্যস্থত্বভোগী ছাড়াই সরাসরি বাজারে পণ্য বিক্রি করতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

দ্রব্যমূল্যের এই লাগামহীন উর্ধ্বগতি রোধ করতে না পারলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান আরও বিপন্ন হবে। তাই সরকার, ব্যবসায়ী সমাজ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে একযোগে এই সংকট মোকাবিলায় এগিয়ে আসতে হবে।

(৭)

(ক) পারিভাষিক শব্দ লেখো : (১০টি)

অথবা

Forecast

উত্তর: Forecast = পূর্বাভাষ

Prepaid

উত্তর: Prepaid = পূর্বপ্রদত্ত

Impeachment

উত্তর: Impeachment = অভিশংসন

Manuscript

উত্তর: Manuscript = পাণ্ডুলিপি

Subsidy

উত্তর: Subsidy = ভরতুকি

Annexation

উত্তর: Annexation = সংযোজন

Referendum

উত্তর: Referendum = গণভোট

Racism

উত্তর: Racism = বর্ণবাদ।

Invoice

উত্তর: Invoice = চালান

Biography

উত্তর: Biography = জীবনী

Immigrant

উত্তর: Immigrant = অভিবাসী

Lien

উত্তর: Lien = পূর্বস্বত্ব

Parole

উত্তরঃ Parole = শর্তাধীন মুক্তি

Surplus

উত্তরঃ Surplus = উদ্বৃত্ত

Affidavit

উত্তরঃ Affidavit = হলফনামা

(খ) Time is very precious. It should not be neglected. The man who makes good use of time is sure to succeed. All the famous persons of the world made use of time. We should follow them.

উত্তরঃ সময় অত্যন্ত মূল্যবান। একে অবহেলা করা অনুচিত। যে লোক সময়ের সদ্ব্যবহার করে সে অবশ্যই সফল হয়। পৃথিবীর সমস্ত বিখ্যাত লোক মগGqi সদ্ব্যবহার করেছেন। আমাদের উচিত তাঁদের অনুসরণ করা।

(ঙ)

(ক) বাক্য শুদ্ধ করে লেখো : (পাঁচটি)

অথবা

(i) সব পাখিরা নীড় বাঁধে না।

উত্তরঃ সব পাখিরা নীড় বাঁধে না। = সব পাখি নীড় বাঁধে না।

(ii) পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে ভেতরে প্রবেশ নিষেধ।

উত্তরঃ পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে ভিতরে প্রবেশ নিষেধ। = পরীক্ষা চলাকালীন ভিতরে প্রবেশ নিষেধ।

(iii) এ বারের বন্যায় লোকটি সর্বশান্ত হলো।

উত্তরঃ এ বারের বন্যায় লোকটি সর্বশান্ত হলো। = এ বারের বন্যায় লোকটি সর্বস্বান্ত হলো।

(iv) দশচক্রে ঈশ্বর ভূত।

উত্তরঃ দশচক্রে ঈশ্বর ভূত। = দশচক্রে ভগবান ভূত।

(v) 'অপরাহু' শব্দটি লিখতে অনেকেই ভুল করে।

উত্তরঃ 'অপরাহু' শব্দটি লিখতে অনেকেই ভুল করেন। = 'অপরাহু' শব্দটি লিখতে অনেকেই ভুল করেন।

(vi) মাতাহীন শিশুর কী দুঃখ।

উত্তরঃ মাতাহীন শিশুর কী দুঃখ! = মাতৃহীন শিশুর কী দুঃখ!

(vii) তাঁর সৌজন্যতায় মুগ্ধ হয়েছি।

উত্তরঃ তাঁর সৌজন্যতায় মুগ্ধ হয়েছি। = তাঁর সৌজন্যে/সুজনতায় মুগ্ধ হয়েছি।

(viii) আজকাল খাঁটি গরুর দুধ বড়ই দুর্লভ।

উত্তরঃ আজকাল খাঁটি গরুর দুধ বড়ই দুর্লভ। = আজকাল গরুর খাঁটি দুধ বড়ই দুর্লভ।

(খ) নিচের অনুচ্ছেদের অপপ্রয়োগ শুদ্ধ করো:

বিদ্যান মুর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। একথা প্রমাণ হয়েছে। জীবনে স্বার্থকতা লাভ করতে হলে পাঠে মনোযোগী হতে হয়। দূরাবস্থা আকাঙ্ক্ষার অন্তরায়। দৈন্যতা ভাল নয়।

উত্তরঃ বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। একথা প্রমাণিত হয়েছে। জীবনে সার্থকতা লাভ করতে হলে পাঠে মনোযোগী হতে হয়। দূরবস্থা আকাজক্ষার অন্তরায়। দীনতা (বা দৈন্য) ভালো নয়।

(৫)

(ক) বাক্য কাকে বলে? একটি সার্থক বাক্যের কী কী গুণ থাকা আবশ্যিক? উদাহরণসহ লেখো।

উত্তরঃ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক পদ বা শব্দের সমন্বয়ে যখন বক্তার মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় তখন তাকে বাক্য বলে। যেমন- ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করে আমি গর্বিত। উপরের উভয় পদসমষ্টিই মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করেছে। সুতরাং এদের প্রত্যেকটি এক-একটি বাক্য।

ক. সরল বাক্য, খ. জটিল বাক্য, গ. যৌগিক বাক্য।

ক. **সরল বাক্য:** যে বাক্যে একটি মাত্র কর্তা (উদ্দেশ্য) এবং একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া (বিধেয়) থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন- ছেলেটি দৌড়াচ্ছে। এখানে 'ছেলেটি' উদ্দেশ্য এবং 'দৌড়াচ্ছে' বিধেয়।

খ. **জটিল বাক্য:** যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্যের সঙ্গে এক বা একাধিক আশ্রিত বাক্য পরস্পর সাপেক্ষভাবে যুক্ত হয়, তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে।

আশ্রিত বাক্য

যে পরিশ্রম করে

প্রধান খণ্ডবাক্য

সেই সুখ লাভ করে।

গ. **যৌগিক বাক্য:** পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা জটিল বাক্য সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করলে, তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন- কঠোর পরিশ্রম করব, তবুও ভিক্ষা করবো না।

অথবা

(খ) বাক্য রূপান্তর করো : (পাঁচটি)

(i) পুলিশের লোক জানবে কী করিয়া?

উত্তরঃ পুলিশের লোক জানিবে কী করিয়া? = পুলিশের লোক জানিবে না।

(ii) ভুল সকলেই করে।

উত্তরঃ ভুল সকলেই করে। = ভুল কে না করে?

(iii) বিপদে ধৈর্য ধরা উচিত।

উত্তরঃ বিপদে ধৈর্য ধরা উচিত। = বিপদে ধৈর্য ধরো।

(iv) দশ মিনিট পর ট্রেন এলো।

উত্তরঃ দশ মিনিট পর ট্রেন এলো। = দশ মিনিট অতিক্রান্ত হলো, তারপর ট্রেন এলো।

(v) চুপ করো।

উত্তরঃ চুপ করো। (নির্দেশাত্মক) = কথা বোলো না।

(vi) মেঘ হলে বৃষ্টি হবে।

উত্তরঃ মেঘ হলে বৃষ্টি হবে। = যদি মেঘ হয়, তাহলে বৃষ্টি হবে।

(vii) ভোরের নির্মল বাতাস।

উত্তরঃ ভোরের বাতাস নির্মল। (বিস্ময়সূচক) = কী নির্মল ভোরের বাতাস

(viii) যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই একথা বিশ্বাস করবে।

উত্তরঃ যাদের বুদ্ধি নেই, তারাই একথা বিশ্বাস করবে। = বুদ্ধিহীনরাই বা নির্বোধরাই একথা বিশ্বাস করবে।

(8)

(ক) 'উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।' প্রমাণ করো।

উত্তরঃ বাংলা ভাষায় এমন কতগুলো অব্যয়সূচক শব্দাংশ রয়েছে, যার নিজস্ব কোনো অর্থ নেই, কিন্তু শব্দের আগে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করতে সাহায্য করে তাদের উপসর্গ বলে। উপসর্গের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো- এর নিজস্ব কোনো অর্থবাচকতা নেই কিন্তু অন্য শব্দের আগে যুক্ত হলে অর্থদ্যোতকতা সৃষ্টি হয়। যেমন:

অ+কাজ= অকাজ

পরি+পূর্ণ = পরিপূর্ণ

প্র+ভাত= প্রভাত

বি+হার= বিহার

নি+খোঁজ= নিখোঁজ

উপর্যুক্ত উদাহরণসমূহে 'অ', 'পরি', 'প্র', 'বি', 'নি' ইত্যাদি শব্দাংশের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই, অথচ 'কাজ' শব্দের আগে 'অ' উপসর্গটি যুক্ত হলে হয় 'অকাজ।' এরকম 'পূর্ণ' শব্দের পূর্বে 'পরি' উপসর্গ যোগ করায় 'পরিপূর্ণ' হলো। 'ভাত' শব্দের সঙ্গে 'প্র' যুক্ত হয়ে 'প্রভাত', 'হার' শব্দের সঙ্গে 'বি' যুক্ত হয়ে 'বিহার', 'খোঁজ' শব্দের পূর্বে 'নি' উপসর্গ যুক্ত হয়ে 'নিখোঁজ' ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থে শব্দ তৈরি হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে উপসর্গগুলো বিভিন্ন অর্থের দ্যোতক। এখানে উল্লেখ্য যে, নাম বা কৃদন্ত শব্দের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে স্বাধীনভাবে থাকলে উপসর্গের কোনো অর্থ নেই। কিন্তু কৃদন্ত বা নাম শব্দের সঙ্গে যুক্ত হলেই আশ্রিত শব্দকে অবলম্বন করে বিশেষ অর্থদ্যোতকতা সৃষ্টি করে।

অর্থাৎ উপসর্গের নিজস্ব কোনো অর্থ না থাকলেও অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তা শব্দের অর্থের পরিবর্তন, সমপ্রসারণ বা সংকোচন করতে পারে। অতএব, আমরা বলতে পারি 'উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।'

অথবা

(খ) নিচের যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করো :

হিতাহিত

উত্তরঃ হিতাহিত = হিত ও অহিত (দ্বন্দ্ব সমাস)

আশীবিষ

উত্তরঃ আশীবিষ = আশীতে বিষ যার = বহুব্রীহি সমাস

তেপান্তর

উত্তরঃ তেপান্তর = তিন প্রান্তরের সমাহার = দ্বিগু সমাস।

রাজপথ

উত্তরঃ রাজপথ = পথের রাজা (ষষ্ঠী তৎপুরুষ বা সম্বন্ধ তৎপুরুষ সমাস)।

ভবনদী

উত্তরঃ ভবনদী = ভব রূপ নদী রূপক = কর্মধারয় সমাস

কালান্তর

উত্তরঃ কালান্তর = অন্য কাল (নিতা সমাস)।

যথেষ্ট

যথেষ্ট = ইষ্টকে অতিক্রম না করে (অব্যয়ীভাব)

উত্তরঃ

নদীমাতৃক

উত্তরঃ নদীমাতৃক = নদী মাতা (মাতৃ) যার (বহুব্রীহি সমাস)।

(৩)

(ক) আবেগ শব্দ কাকে বলে? উদাহরণসহ আবেগ শব্দের শ্রেণিবিভাগ লেখো।

উত্তরঃ যে শব্দের মাধ্যমে মনের নানা ভাব ও আবেগকে প্রকাশ করা হয়, তাকে আবেগ শব্দ বলে।

প্রকাশ অনুসারে আবেগ শব্দকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন:

- সিদ্ধান্তবাচক আবেগ শব্দ: এই জাতীয় আবেগ শব্দের সাহায্যে অনুমোদন প্রকাশ পায়। যেমন: বেশ, তাই হবে।
- প্রশংসাবাচক আবেগ শব্দ: এ ধরনের আবেগ শব্দ প্রশংসা প্রকাশ করে। যেমন: বাঃ! বড় ভালো কথা বলেছ।
- বিরক্তিবাচক আবেগ শব্দ: এ ধরনের আবেগ শব্দ ঘৃণা প্রকাশ করে। যেমন: ছিঃ ছিঃ, তুমি এত নীচ!
- যন্ত্রণাবাচক আবেগ শব্দ: এ ধরনের আবেগ শব্দ আতঙ্ক প্রকাশ করে। যেমন: আঃ, কী আপদ।
- সম্বোধনবাচক আবেগ শব্দ: এ ধরনের আবেগ শব্দ আহ্বান করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন: হে বন্ধু, তোমাকে অভিনন্দন। বিস্ময়বাচক আবেগ শব্দ: এ ধরনের আবেগ আশ্চর্য হওয়ার ভাব প্রকাশ করে। যেমন: আরে, তুমি আবার এলে!

অথবা

(খ) নিচের অনুচ্ছেদের পাঁচটি বিশেষণ চিহ্নিত করো:

সকালে মা তার ঘুমন্ত শিশুকে জাগিয়ে গরম দুধ খাওয়ালেন। এরপর আড়াই বছরের অবুঝ শিশুটিকে নিয়ে বাগানে লাল লাল ফুল দেখালেন। সদ্যোজাত ফুলগুলো ছিল চমৎকার। বাকবকে রোদে পরিবেশও ছিল সুখকর।

উত্তরঃ উক্ত অনুচ্ছেদ থেকে চিহ্নিত পাঁচটি বিশেষণ হলো:

১. ঘুমন্ত (শিশুর অবস্থা প্রকাশ করছে)
২. গরম (দুধের গুণ/অবস্থা বোঝাচ্ছে)
৩. অবুঝ (শিশুর স্বভাব বোঝাচ্ছে)
৪. সদ্যোজাত (ফুলের অবস্থা বোঝাচ্ছে)
৫. সুখকর (পরিবেশের গুণ বোঝাচ্ছে)

(২)

(ক) তৎসম শব্দের বানানের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো।

উত্তরঃ প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে অ-তৎসম শব্দের বানানের নিয়ম-

১. সকল অ-তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ কার ব্যবহৃত হয়। যেমন- হাতি, গাড়ি, ভারি, হাতি ইত্যাদি।
২. স্ত্রীবাচক ও জাতিবাচক শব্দে ই ও উ কার হবে। যেমন- ইরানি, জাপানি, পুজো, বুড়ি মুলা ইত্যাদি।
৩. 'আলি' প্রত্যয় যুক্ত শব্দে ই কার হবে। যেমন- মিতালি, সোনালি, খেয়ালি ইত্যাদি।
৪. তদ্ভব, দেশি, বিদেশি মিশ্র শব্দের বানানে দন্ত্য-ন হবে। যেমন- ইরান, কান, কোরান, ধরন ইত্যাদি।
৫. 'আনো' প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে ও- কার যুক্ত হবে। যেমন- কাওয়ানো, দেখানো, করানো ইত্যাদি।

অথবা

(খ) নিচের যেকোনো পাঁচটি শব্দের শুদ্ধ বানান লেখো :

শিরোচ্ছেদ

উত্তরঃ শিরোচ্ছেদ = শিরশ্ছেদ

আকাংকা

উত্তরঃ আকাঙ্খা = আকাঙ্ক্ষা

গিতাঞ্জলি

উত্তরঃ গিতাঞ্জলি = গীতাঞ্জলি

উজ্জ্বল্য

উত্তরঃ উজ্জল্য = উজ্জ্বল্য

পিপিলিকা

উত্তরঃ পিপিলিকা = পিপীলিকা

স্বরস্বতী

উত্তরঃ স্বরস্বতী = সরস্বতী।

আশীষ

উত্তরঃ আশীষ = আশিস।

প্রত্যাশ

উত্তরঃ প্রত্যাশ = প্রত্যাষ।

(১২) যেকোনো একটি বিষয় অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ লেখো :

(ক) বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা

উত্তরঃ

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প: সমস্যা ও সম্ভাবনা

ভূমিকা: বাংলাদেশ একটি সুপ্রাচীন দেশ। প্রাচীনত্বের গরিমায় বাংলা সারা বিশ্বে পরিচিত। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ-দেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি দারুণভাবে উন্নতি লাভ করেছে। দেশের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও ইতিহাস বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ করে দেশের জনা আর্থিক সমৃদ্ধি আনয়ন করেছে। বর্তমানে পর্যটনকে শিল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কারণ বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের ব্যাপক সম্ভাবন বর্তমান।

পর্যটনের বিকাশ: মানুষের একে অপরকে জানার আগ্রহ থেকেই পর্যটনের বিকাশ ঘটেছে। হযত পর্যটনের নামে নয়। কিন্তু পর্যটন বিষয়টি অনেক পুরাতন। মার্কোপোলো, ইবনে বতুতা, ফাহিয়েন, হিউয়েন সাং-সহ বিশ্ববিখ্যাত পর্যটকরা ইতিহাসে স্থায়ী হয়ে আছেন, সেই সময়ে যখন যোগাযোগের ব্যবস্থা ছিল খুবই কষ্টকর, সেই সময়েও ভ্রমণপিপাসুরা। ঘুরে বেড়িয়েছেন দেশে দেশে। এসব বিখ্যাত পর্যটকদের অনেকেই এ উপমহাদেশে এসেছিলেন সে কথা আমরা ইতিহাস থেকে পাই। আজ পর্যটনের যে ধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে পৃথিবীব্যাপী, দেশে দেশে গড়ে উঠেছে সমৃদ্ধ পর্যটন শিল্প, লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে দেশ-দেশান্তরে তা কিন্তু জগৎ সম্পর্কে তার কল্পন ও জগৎ সত্যের প্রত্যক্ষ সমন্বয়ের অদম্য অভিপ্রায়ের কারণে।

আমরা জনি খ্রিস্টপূর্বকালে প্রথম বিশ্ব জয় করেছিল বাংলার মসলিন। পৃথিবীব্যাপী এদেশের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল সোনারগাঁও-এ তৈরি সুক্ষ বস্ত্র মসলিনের মাধ্যমে। এছাড়াও পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ম্যানগ্রোভ বন (সুন্দরবন) রয়েছে বাংলাদেশে যা বিশ্ববাসীকে পর্যটন আকর্ষণে রাখতে পরে ব্যাপক ভূমিকা। আমাদের রয়েছে পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত যা অবিচ্ছিন্নভাবে ১২০ কিলোমিটার দীর্ঘ। আরো একটি কারণে বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে গৌরবজনক আসন অলংকৃত করে আছে যা 'একুশে ফেব্রুয়ারি' আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

পৃথিবীকে আজ আমরা গ্লোবাল ভিলেজ বলছি। অথাৎ সারা পৃথিবীর সব দেশ মিলেমিশে একটি গ্রামে পরিণত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও তথ্য প্রযুক্তির বিপ্লবের ফলে সময় এসেছে পরস্পরের কাছে পরস্পরকে মেলে ধরার। নিজের দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য ভ্রমণপিপাসু বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপনের এখনই

সময়। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতে বাংলাদেশেও পর্যটন শিল্পের যথাযথ উন্নতি ও তদারকিতে লাভজনক হিসেবে গড়ে ওঠতে পারে।

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন: ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশের হারিয়ে যাওয়া পর্যটন শিল্পের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য আর বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতিকে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে তুলে ধরে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও বেকারত্ব বিমোচনের লক্ষে ১৯৭২ সালে ২৭ নভেম্বর তারিখে জারিকৃত মহামান্য রাষ্ট্রপতির ১৪৩ নং আদেশ বলে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পর্যটন সম্ভাবনাকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের উদ্যোগ সূচিত হয়। এর প্রেক্ষিতে ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন নামে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে এবং ১৯৭৫ সালে বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন নবগঠিত মন্ত্রণালয়ের অধীনে নীত হয়। জাতীয় পর্যটন সংস্থা হিসেবে এই সংস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে- বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের বিকাশ, পর্যটন সম্ভাবনাময় স্থানসমূহের অবকাঠামোর উন্নয়ন, পর্যটকদের সেবা প্রদান, বিদেশে ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরা ও দেশের পর্যটন সম্পদের বিকাশের পাশাপাশি এ শিল্পের বিভিন্ন অঙ্গনে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ দেশের দারিদ্র্যবিমোচনে সহায়তা করা।

শ্রেণিভিত্তিক বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ: বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণগুলোকে নিম্নরূপে ভাগ করা যায়। যথা:

(ক) প্রাকৃতিক বা বিনোদনমূলক পর্যটন: প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ, শহরের যান্ত্রিক জীবনের বাইরে কিছুটা সময় কাটিয়ে আসা কিংবা হঠাৎ করে কোনো নতুন পরিবেশের ছোয়া পাবার জন্য মানুষ ছুটে যায় প্রকৃতির কাছে। এ ধরনের নয়ন-কাড়া প্রাকৃতিক অবস্থান বাংলাদেশে প্রচুর। রয়েছে। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মনোরম সমুদ্র সৈকত কুয়াকাটা। পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজার, চট্টগ্রাম ও সিলেটের পাহাড়ি অঞ্চল ও চা বাগান, তামাবিল, জাফলং, রাঙামাটির নয়নভিরাম কৃত্রিম হ্রদ, সুন্দরবনসহ বিভিন্ন বনাঞ্চল। এছাড়াও রয়েছে উপকূলীয় দ্বীপাঞ্চল, বর্ণাঢ্য উপজাতীয় ও গ্রামীণ জীবনধারা।

(খ) রোমাঞ্চকর ভ্রমণ এবং পরিবেশভিত্তিক পর্যটন: রোমাঞ্চকর ও পরিবেশভিত্তিক পর্যটনের অনেক ক্ষেত্র রয়েছে বাংলাদেশে। সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকায় বিচিত্র বন্যপ্রাণী এবং উদ্ভিদসম্ভার দেখা যায়। রাঙামাটির হ্রদে নৌবিহার, মৎস্য শিকার, জলক্রীড়া, পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ট্রেকিং, হাইকিং ইত্যাদির সুযোগ রয়েছে। সাগরের বুক চিরে অপরূপ দ্বীপ সেন্টমার্টিন। পর্যটক আকর্ষণের এমনি অনেক সুযোগ আছে আমাদের এই বাংলাদেশে।

(গ) সাংস্কৃতিক পর্যটন: ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান পরিদর্শন সাংস্কৃতিক পর্যটনের পর্যায়ভুক্ত। মহাস্থানগড়, ময়নামতি, পাহাড়পুর, ঢাকার লালবাগের দুর্গ, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, জাতীয় স্মৃতিসৌধ, জাতীয় জাদুঘর, সোনারগাঁও জাদুঘর, রাজশাহীর বরেন্দ্র জাদুঘর, নাটোর ও পুঠিয়ার রাজবাড়ি এবং এমনি আরো অনেক সাংস্কৃতিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন রয়েছে বাংলাদেশে।

(ঘ) ধর্মীয় পর্যটন: বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকেরা মূলত ধর্মীয় অনুভূতি থেকেই কিছু কিছু স্থানে ভ্রমণ করে। ঐতিহাসিক ধর্মীয় সাংস্কৃতিক আকর্ষণীয় স্থান বাংলাদেশে বিস্তৃত। মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, মাজার, দরগাহ, মঠসহ বিভিন্ন নিদর্শন ছড়িয়ে আছে সারাদেশময়। এসব আকর্ষণের মধ্যে রয়েছে বাগেরহাটের ঘাটগম্বুজ মসজিদ, ঢাকার সাতগম্বুজ মসজিদ, রাজশাহীর শাহ মখদুমের মাজার, পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার, মহাস্থানগড়, নবাবগঞ্জের সোনা মসজিদ, ঢাকেশ্বরী মন্দির, আমেনিয়ান চার্চ, চট্টগ্রামের বায়েজিদ বোস্তামীর দরগাহ, সীতাকুণ্ড মন্দির, সিনেটের হযরত শাহজালারের দরগা, কক্সবাজারের রামু মন্দির, রাজশাহীর তাহেরপুর রাজবাড়ি প্রভৃতি।

(ঙ) নৌ পর্যটন: বিনোদনমূলক পর্যটনের জন্য এদেশের নদনদী আকর্ষণীয় উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে বহুকাল যাবৎ। বাংলাদেশ নদীবহুল দেশ। ২৫৭টি ছোটবড় নদনদী জালের মতে বিস্তৃত হয়ে আছে সারাদেশময়। নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রকৃত সৌন্দর্য অনেকাংশেই ফুটে ওঠে নৌভ্রমণের মাধ্যমে এখান থেকেই অনুভব করা যায় সোনারবাংলার প্রকৃত ছবি।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব: বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পর্যটন শিল্প নানাভাবে অবদান রাখতে পারে। প্রথমত, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এ শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। বাংলাদেশে এমনিতেই রপ্তানি কম। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের কোনো খাতই তেমন শক্তিশালী কিংবা যাতসহ নয়। এই প্রেক্ষাপটে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিলে পর্যটনের মতো 'অদৃশ্য রপ্তানি' পণ্য খাতে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করতে পারে। পর্যটন কর্পোরেশন মুনাফা অর্জনকারী সংস্থার মধ্যে একটি। ১৯৮৩-৮৪ থেকে ২০০৩-২০০৪ পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠান সর্বমোট ৪৯৭৩.১০ লক্ষ টাকা করপূর্ব মুনাফা অর্জন করেছে। বর্তমান সরকার পর্যটন ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সুনাম অর্জনে বিরাট অবদান রেখেছে। বাংলাদেশ ২ বছরের জন্য (২০০১-২০০৩) বিশ্ব পর্যটন

সংস্থার কমিশন ফর সাউথ এশিয়ান চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার পাশাপাশি পর্যটন শিল্পে মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য ১৯৭৪ সালে জাতীয় হোটেল ও পর্যটন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। এ পর্যন্ত এখানে পরিচালিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে ২২,০০০-এর বেশি ছাত্র-ছাত্রীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেই দেশ-বিদেশ কর্মরত আছেন। পর্যটন শিল্পের উন্নতির সঙ্গে যে সব ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হতে পারে সেগুলো হল:

১. ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও বেকারত্ব লাঘব;
২. প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়ন,
৩. কুটিরশিল্প ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন;
৪. বৈচিত্র্যময় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সৃষ্টি;
৫. অবকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
৬. বৈদেশিক বিনিয়োগ;
৭. আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বৃদ্ধি ইত্যাদি।

বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের সমস্যা: অনেক সম্ভাবনাময় শিল্প হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ নানা কারণে পর্যটন শিল্পে আশানুরূপ অগ্রগতি সাধন করতে পারে নি। এক্ষেত্রে যেসব সমস্যা রয়েছে সেগুলো হল:

১. অবকাঠামোগত দুর্বলতা: এই খাতের অবকাঠামো মারাত্মকভাবে দুর্বল। পরিবহণ ব্যবস্থা মাকাতার আমলের। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সত্ত্বেও এখনও রয়েছে অনেক দুর্বলতা। রাস্তাঘাট সংকীর্ণ, অনেক জায়গায় বিপজ্জনক। প্রায়শই যানজটে অযথা সময় ও শক্তি নষ্ট হয়। পর্যাপ্ত আধুনিক স্কোটেল ও মোটেল নেই। পর্যটন কেন্দ্রগুলোও অবহেলিত। এগুলোর সুপরিষ্কৃত আধুনিকায়ন ও শুষ্কমুক্ত বিপণির অভাবও এক্ষেত্রে বড় বাধা।

২. রাজনৈতিক অস্থিরতা: দেশে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে না ওঠায় রাজনৈতিক অস্থিরতা দেশের পর্যটন শিল্প বিকাশে বড় সমস্যা।

৩. উন্নত সেব্য ও তথ্যের অভাব: দক্ষ, মার্জিত জনবলের অভাব এক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা। সেই সঙ্গে রয়েছে উন্নত ও দ্রুত তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থার অভাব।

৪. সামাজিক বাধা: বিদেশি পর্যটকদের সংস্কৃতিকে এদেশে অনেকেই সহজ ও স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেন না। অনেকেই তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। অনেকেই অদের সম্পর্কে পোষণ করেন নেতিবাচক মনোভাব। অনেক সময় পর্যটকরা দুষ্টলোকের পাল্লায় পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হন। এগুলোও এক্ষেত্রে বিকাশে সমস্যা হয়ে আছে।

৫. প্রচারের অভাব: আজকে আমরা বিভিন্ন টিভি চ্যানেল, বিবিসি, সিএনএন, ডিসকভারী, ন্যাশনাল জিওগ্রাফির মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সমাজ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যসহ প্রাকৃতিক রূপ অবলোকন করে থাকি। কিন্তু এক্ষেত্রে বাংলাদেশের তেমন কোনো প্রচার নেই বললেই চলে। প্রামাণ্যচিত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের কথা তুলে ধরা যায়।

৬. নিরাপত্তার অভাব: অস্থিতিশীলতা, চুরি, ছিনতাই, হত্যা, রাহাজানি, সহিংসতা, থেকে পর্যটকদের রক্ষা করতে হবে। পর্যটকদের দিতে হবে নির্বিঘ্নে চলাফেরার নিশ্চয়তা।

পর্যটন শিল্প বিকাশে করণীয়: বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের বিকাশ অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। এক্ষেত্রে বিকাশে

- (১) সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পর্যটন স্পটগুলোকে বেশি আকর্ষণীয় করে তোলে;
- (২) যাতায়াতের সুষ্ঠু ব্যবস্থা তথা বিমান, নৌ ও সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন;
- (৩) নিরাপদ ভ্রমণের যাবতীয় ব্যবস্থাকরণ;
- (৪) দেশি-বিদেশি পর্যটকদের জন্য আবাসন সুবিধাদি করতে হবে।

এছাড়া সচেষ্টিত হতে হবে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা নিরসনে জাতীয় ঐক্যমত প্রতিষ্ঠায়। পাশাপাশি পর্যটন শিল্পের বিকাশের জন্য চাই প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও সংস্কার। চাই স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা। আকর্ষণীয় এলাকাগুলোর পরিকল্পিত নান্দনিক উন্নয়ন যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন পর্যটন-কর্মীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ। পর্যটন সংক্রান্ত নান বিষয়ে প্রয়োজন তথাপূর্ণ আকর্ষণীয় প্রচার। এই শিল্পের বিকাশের জন্য পাশাপাশি নিশ্চিত করতে হবে পর্যটকদের নিরাপত্তা। বিভিন্ন দেশের মতো পর্যটকদের বাড়তি কিছু সুবিধা দিতে হবে। সৈকতে রাখতে হবে বিভিন্ন বিনোদনের ব্যবস্থা, ব্যবহার করতে হবে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি। প্রতিটি ঐতিহাসিক স্থানসহ অন্যান্য দৃষ্টিনন্দন স্থানকে পর্যটনের আওতায় এনে সমৃদ্ধ করতে হবে।

কক্সবাজার ও কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত: বিশ্বের বৃহত্তম সমুদ্র সৈকতের অবস্থান আমাদের বাংলাদেশের কক্সবাজারে যার দৈর্ঘ্য প্রায় ১২০ কিলোমিটার। আরও রয়েছে দক্ষিণ অঞ্চলের কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত। যেখানে অবস্থান করে অবলোকন করা যায় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত। যা খুবই বিরল। সেন্টমার্টিন: আমাদের আছে জগদ্বিখ্যাত প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন। বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন একটি প্রবাল দ্বীপের নামই সেন্টমার্টিন। নারিকেল বিথীতে ঘেরা যার সৈকত। এখানে রয়েছে পর্যটন শিল্প সমৃদ্ধ করার অপার সম্ভাবনা।

রাঙামাটি ও বান্দরবান: পাহাড়-পর্বত ঘেরা বান্দরবান, রাঙামাটির সবুজ বনানীতে অপরূপ সৌন্দর্য সহসাই মনকে উচাটন করে দেয়। ছোট-বড় পাহাড়ের মাঝ দিয়ে বয়ে যাওয়া পাহাড়ি নদী, কপা আর হ্রদের অপার নান্দনিকতা। যে-কোনো মানুষকে বারবার হাতছানি দিয়ে ডাকে। পাহাড়ি উপজাতিদের কৃষ্টি সংস্কৃতি জীবনযাত্রার বর্ণাঢ্য ও মুগ্ধ করে পর্যটন প্রিয়দের।

সুন্দরবন: এই বাংলাদেশেই অবস্থিত পৃথিবীর বৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন যার নাম সুন্দরবন। খাল, নদী, সাগর বেষ্টিত সুন্দরবনের জলে কুমির আর ভাঙায় বাঘ। যে বাধ ভুবন বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার নামে অভিহিত। সুন্দরবন ছাড়া এই বাঘ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এছাড়া আছে ঝাঁকে ঝাঁকে চিত্রল হরিণ, বানর, শূকর, বনমোরগ, অজগরসহ নানা প্রকার বন্যপ্রাণী। সুন্দরবনে অবস্থানকালে পর্যটকদের ঘুম ভাঙাবে অগুনতি পাখির কল-কাকলীতে যা একজন পর্যটককে স্বপ্নিল আবেশে মুগ্ধ করতে পারে।

চা বাগান ও জলপ্রপাত: সিলেট অঞ্চলের চা বাগানগুলোও বেশ সৌন্দর্যমণ্ডিত। যা পর্যটকদের আকর্ষণ করতে পারে।

জাফলংয়ের জলপ্রপাত, হায়কের পাথর কেয়ারী নয়নভোলানো স্থান। এছাড়া তামাবিল, চট্টগ্রামে ফয়েজ লেক, যমুনা সেতু ইত্যাদি পর্যটনের স্থান হিসেবে বেশ সমাদৃত।

উপসংহার: পর্যটন শিল্পে বাংলাদেশের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পকে আরো উন্নত করার জন্য দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। ৭ম শতকে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ বাংলাদেশ ভ্রমণে এসে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন: 'A sleeping beauty emerging from mists and water. এই টাচ্ছ্বসিত প্রশংসাকে সর্বদা ধরে রাখার মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের বিকাশের দায়িত্ব আমাদের। সরকারের পাশাপাশি আমরা বেসরকারি উদ্যোগে বিকাশ ঘটাতে পারি পর্যটন শিল্পের। আমার সম্মিলিতভাবে যদি প্রচেষ্টা চালাই তাহলেই অচিরেই পর্যটন শিল্পে বাংলাদেশ বিশ্বের দরবারে স্থান করে নিবে। আসুন আমরা সকলে মিলে আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমিকে অনিবার ভালোবাসায় ভরিয়ে তুলি। আর জগদ্বাসীকে আপন করে গ্রহণ করি নিজের দেশে পরম আতিথেয়তায়।

(খ) বাংলাদেশের উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তির ভূমিকা

উত্তরঃ

বাংলাদেশের উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তি

ভূমিকা : মানব কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানকে কাজে লাগানোর কৌশলই হলো প্রযুক্তি। আধুনিককালে মানব জীবনের সাথে প্রযুক্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তথ্য ও প্রযুক্তি প্রতি মূহূর্তে আমাদের কাজে লাগে। মানুষ বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে তথ্যপ্রযুক্তির সেবা গ্রহণ করে আসছে। যেমন- মোবাইল, টেলিফোন, কম্পিউটার, সফটওয়্যার, নেটওয়ার্ক, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি। তথ্যপ্রযুক্তি বিশ্বজুড়ে যেমন অভাবনীয় পরিবর্তন এনেছে, তেমনি দেশ ও জাতির অগ্রগতিতে অপরিহার্য অবদান রাখছে। তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে বেকার মানুষ কর্মসংস্থানের সন্ধান পেয়েছে, আর্থনীতিক উন্নতি হয়েছে, জনশক্তি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তি : তথ্যপ্রযুক্তি হলো তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াকরণ এবং সরবরাহের জন্য ব্যবহৃত প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মিলিত ও সুশৃঙ্খল রূপ। তথ্য-প্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো হলো- কম্পিউটিং, মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন, ডাটাবেস উন্নয়ন, বিনোদন, তথ্যভান্ডার, নেটওয়ার্ক, সফটওয়্যার উন্নয়ন, মুদ্রণ ও রিপোগ্রাফিক, ডিশ অ্যান্টেনা ইত্যাদি।

তথ্যপ্রযুক্তি ও বাংলাদেশ : আধুনিককালে বিশ্বজুড়ে তথ্যপ্রযুক্তির জয়জয়কার ধ্বনিত হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তির হাত ধরে বিশ্ব এখন মানুষের হাতের মুঠোয়। বাংলাদেশও এ প্রযুক্তি থেকে পিছিয়ে নেই। গত দশ বছর ধরে বাংলাদেশে ক্রমাগতই প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেছে। স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ দেশব্যাপী তরুণ প্রজন্ম তথ্য প্রযুক্তির

ব্যাপারে খুবই আগ্রহী। বাংলাদেশের বিভিন্ন জরিপ সংস্থার তথ্যসূত্রে জানা যায়- গত দশ বছরে আমাদের দেশ তথ্যপ্রযুক্তির প্রতিটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে।

জাতীয় উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তি : আধুনিক বিশ্বে দেশ ও জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য। বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রতিটি দেশেই দিন দিন তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বেড়ে চলেছে। বিভিন্ন দেশে এখন অসংখ্য তথ্যপ্রযুক্তির প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। শিক্ষা, চিকিৎসা, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসায়-বাণিজ্য, ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, ইন্টারনেট ও তথ্যপ্রযুক্তির দোকান দিয়ে মানুষ খুব ভালো ব্যবসাও করছে। তাছাড়া তথ্যপ্রযুক্তির নানা প্রোগ্রামের ওপর মেলা প্রদর্শনী, প্রতিযোগিতা, সেমিনার ইত্যাদির আয়োজনে করা হয়। আর এই জন্যই তথ্যপ্রযুক্তি দ্রুত দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে এবং দেশ ও জাতির উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে।

তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশে সরকারের অবদান : তথ্যপ্রযুক্তি দেশের উন্নয়নে অবদান রাখে বলে বাংলাদেশ সরকার তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেছে :

১. তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার দেশের অভ্যন্তরীণ গ্রাম এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করে প্রায় | সারা দেশকে ডিজিটাল টেলিফোন ও ইন্টারনেটের আওতায় এনেছে।

২. বাংলাদেশ সরকার তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশে জাতীয় যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালা অনুমোদন করে ঢাকার | কারওয়ান বাজারে অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত একটি আইসিটি ইনকিউবেটর স্থাপন করেছে। এটি ১০ হাজার বর্গফুট এলাকা জুড়ে অবস্থিত।

৩. বাংলাদেশ থেকে সফটওয়্যার ও তথ্যপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট পণ্য বিদেশে বাজারজাতকরণের জন্য বাংলাদেশ সরকার 'আইসিটি বিজনেস প্রমোশন সেন্টার স্থাপন করেছে।

৪. তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য গাজীপুরের কালিয়াকৈরে হাইটেক পার্ক স্থাপন করা হয়। পার্কটি ২৬৫ একর জমির ওপর অবস্থিত। এতে প্রযুক্তির বিভিন্ন স্থাপনা রয়েছে।

৫. দেশের প্রতিটি স্কুলে সরকারি উদ্যোগে কম্পিউটার প্রদান করা হয়েছে এবং মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে কম্পিউটার শিক্ষা কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছে। তাছাড়া কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য আইসিটি ইন্টারশীপ' কর্মসূচি চালু করা হয়েছে।

জাতীয় জীবনে তথ্যপ্রযুক্তির গুরুত্ব : এক সময়কার দরিদ্র বাংলাদেশ বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সালের মধ্যে এই দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার ঘোষণা দিয়েছেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকারের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করতে হলে তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া এত দ্রুত জাতীয় উন্নয়নে বিপ্লব ঘটানোর সম্ভব হবে না। সুতরাং অর্থনীতি শিক্ষা, চিকিৎসাসহ সকল ক্ষেত্রেই দ্রুতগতিতে তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার ঘটাতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব দিতে হবে :

আর্থিক উন্নতি : আমাদের দেশ ও জাতির উন্নয়নের জন্য সর্বাঙ্গে আর্থিক উন্নতির প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। কেননা অর্থনীতিই পারে দেশের উন্নতির চাকা ঘোরাতে। আর্থিক উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখছে তথ্যপ্রযুক্তি। এশিয়া মহাদেশের দেশগুলোর মধ্যে যে দেশগুলোতে তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের জোয়ার বইছে তার মধ্যে ভারত শীর্ষে। এদিক থেকে বাংলাদেশ একটু পিছিয়ে থাকলেও বাংলাদেশের আর্থিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখছে তথ্যপ্রযুক্তি। আমাদের দেশে এখন কম্পিউটার সফটওয়্যার তৈরি হচ্ছে। আমাদের দেশ থেকে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকার সফটওয়্যার বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। আগামী দিনে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত

নেওয়া হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি প্রয়োগে : বিশ্বব্যাপী প্রতিনিয়তই চলছে টিকে থাকার প্রতিযোগিতা। বিশ্ব দরবারে টিকে থাকার জন্য আমাদের প্রয়োজন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক কোর্স চালু করা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষা কোর্স চালু করতে হবে। বিশ্বব্যাপী চাহিদার কথা বিবেচনা করে তথ্যপ্রযুক্তির নবায়ন করতে হবে। তাছাড়া সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের তথ্যপ্রযুক্তিতে জ্ঞানার্জনের সুযোগ দিতে হবে এবং প্রতিটি স্কুল-কলেজে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে বেকারত্বের অবসান : আমাদের দেশে যুব-সমাজে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হলো বেকারত্ব। বাংলাদেশে দিন দিন বেকার সমস্যা বেড়েই চলেছে। কিন্তু আমাদের দেশের বেকারদের জন্য সুখবর হচ্ছে বর্তমান যুগে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বেকারদের জন্য কর্মসংস্থানের নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, ইন্টারনেট, ফেসবুক ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রায় দশ হাজার প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। আর এ সকল প্রতিষ্ঠান প্রায় লক্ষাধিক বেকার যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে।

জনশক্তি উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তি : একটি দেশের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তি। আর সাধারণ জনগণকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করতে প্রয়োজন তথ্যপ্রযুক্তির সমৃদ্ধ জ্ঞান। তথ্যপ্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ হলেই আমাদের জনশক্তি দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত হওয়া সম্ভব। আর জনশক্তি দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত হলেই দেশের আর্থনীতিক উন্নতি সম্ভব। বর্তমান বিশ্বে যে জাতি তথ্যপ্রযুক্তিতে যত বেশি সমৃদ্ধ সে জাতি তত বেশি উন্নত। তথ্যপ্রযুক্তিহীন কোনো জাতিই উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে পারে না। তাই বাংলাদেশের সরকারের উচিত দেশ ও জাতির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলে।

ব্যবসায়-বাণিজ্যে তথ্যপ্রযুক্তি : বর্তমান যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি এক নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে। এখন ঘরে বসেই ই-মেইল, ই-কমার্স, ই-নেট ইত্যাদি প্রযুক্তির মাধ্যমে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই ব্যবসা-বাণিজ্যের খোঁজ-খবর রাখতে পারছে। আর এটা সম্ভব হচ্ছে শুধু তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে। ঘরে বসে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই মুহূর্তের মধ্যে দেশ-বিদেশে উৎপাদিত পণ্য এবং বাজার দর সম্পর্কে অবগত হতে পারছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে পণ্যের অর্ডার দেওয়া-নেওয়া হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ যদি এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারে, তাহলে আমরা আর্থনীতিক দিক থেকে উন্নতির শিখরে পৌঁছতে পারব।

উপসংহার : বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিকদের সবচেয়ে বিপ্লবকর আবিষ্কার তথ্যপ্রযুক্তি। মানুষ ঘরে বসে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় দূরের মানুষের সাথে যোগাযোগ থেকে শুরু করে কেনা-বেচার কাজও করছে। তথ্যপ্রযুক্তি-বিদ্যা কাজে লাগিয়ে মানুষ বেকারত্ব দূর করতে পারছে। অনেকে ঘরে বসেই উপার্জন করতে পারছে। প্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া এক মুহূর্তও চলা সম্ভব নয়। তাই বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশকেও প্রযুক্তিনির্ভর হতে হবে এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে আর্থনীতিক উন্নতিতে অবদান রাখতে হবে। বাংলাদেশের জনগণকে প্রযুক্তিসমৃদ্ধ দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করতে হবে।

(গ) জাতীয় জীবনে স্বদেশপ্রেমের গুরুত্ব

উত্তরঃ ভূমিকা : দেশপ্রেম মানুষের একটি সহজাত ও মহৎ গুণ। নিজের জন্মভূমি, ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর ভালোবাসাই হলো দেশপ্রেম। জাতীয় জীবনের উন্নতি, প্রগতি ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য দেশপ্রেম অপরিহার্য।

দেশপ্রেমের সংজ্ঞার্থ

স্বদেশের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক মমত্ববোধকে দেশপ্রেম বলে। এটি কেবল একটি আবেগ বা অনুভূতি নয়। দেশের কল্যাণ সাধনে আত্মত্যাগ করার মানসিকতাই আসল দেশপ্রেম।

জাতীয় জীবনে দেশপ্রেমের গুরুত্ব

জাতীয় জীবনে দেশপ্রেমের গুরুত্ব অপরিসীম। নিচে এর মূল দিকগুলো আলোচনা করা হলো:

- **স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা:** একটি স্বাধীন দেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে দেশপ্রেম চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। দেশপ্রেমিক নাগরিক দেশের সীমানা পাহারা দিতে নিজের জীবন উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠিত হন না।
- **জাতীয় ঐক্য গঠন:** দেশপ্রেম সব ভেদাভেদ ভুলে মানুষকে এক সুতোয় বাঁধে। ধর্ম, বর্ণ বা জাতিগত বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও দেশপ্রেমের টানে সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়।
- **অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন:** দেশপ্রেমিক নাগরিকরা সততার সাথে কর প্রদান করেন, জাতীয় সম্পদ রক্ষা করেন এবং দুর্নীতি থেকে দূরে থাকেন। এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত হয়।
- **সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিকাশ:** নিজের দেশের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরতে দেশপ্রেম অনুপ্রেরণা জোগায়।
- **সংকট মোকাবেলা:** যুদ্ধ, মহামারী বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দেশপ্রেমিক মানুষ নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে আত্মমানবতার সেবায় এগিয়ে আসে।

ইতিহাসে দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত

বাঙালির জাতীয় জীবনে দেশপ্রেমের সবচেয়ে বড় উদাহরণ ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ। স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য এ দেশের ৩০ লাখ মানুষ জীবন দিয়েছেন। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে প্রতিটি গণআন্দোলনে দেশপ্রেমের পরিচয় মিলেছে।

দেশপ্রেম বনাম উগ্র জাতীয়তাবাদ

দেশপ্রেম ও উগ্র জাতীয়তাবাদ এক নয়। নিজের দেশকে ভালোবাসা অত্যন্ত পবিত্র কাজ। কিন্তু নিজের দেশকে ভালোবাসতে গিয়ে অন্য দেশকে ঘৃণা করা বা অন্য জাতির ক্ষতি করা উগ্রতা। প্রকৃত দেশপ্রেম বিশ্বমানবতাকে শ্রদ্ধা করতে শেখায়।

ছাত্রসমাজ ও দেশপ্রেম

জাতীয় জীবনে দেশপ্রেমের চেতনা জাগ্রত রাখতে ছাত্রসমাজের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ছাত্রদের প্রধান কাজ মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করা। সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করাই ছাত্রজীবনের আসল দেশপ্রেম।

উপসংহার

দেশপ্রেমহীন মানুষ পশুর সমান। জাতীয় জীবনের সর্বস্বীর্ণ উন্নতির জন্য প্রতিটি নাগরিকের হৃদয়ে দেশপ্রেমের আগুন জ্বলতে হবে। ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে দেশের স্বার্থকে প্রাধান্য দিলেই একটি উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী জাতি গঠন সম্ভব।

(ঘ) মাদকাসক্তি এবং আমাদের তরুণ প্রজন্ম

উত্তরঃ ভূমিকা

একটি দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো তার তরুণ সমাজ। তরুণদের মেধা, শ্রম ও উদ্দীপনার ওপর ভর করেই গড়ে ওঠে উন্নত সমৃদ্ধ রাষ্ট্র। কিন্তু বর্তমান সময়ে এই অমিত সম্ভাবনাময় তরুণ প্রজন্মকে গ্রাস করছে এক মরণব্যাদি, যার নাম মাদকাসক্তি। মাদকাসক্তি নামক এই কালো ছায়া তরুণদের জীবনীশক্তি, মেধা ও নৈতিকতাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে। সমাজ ও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে এই ব্যাদি থেকে তরুণদের রক্ষা করা আজ সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি।

মাদকাসক্তি কী?

সাধারণ অর্থে, যেসব দ্রব্য সেবন করলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে এবং মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কর্মক্ষমতা লোপ পায়, সেগুলোকে মাদকদ্রব্য বলা হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায়, মাদকদ্রব্যের ওপর মানুষের এই ক্ষতিকর মানসিক ও শারীরিক নির্ভরশীলতা বা তীব্র আসক্তিকেই মাদকাসক্তি (Substance use disorder) বলা হয়ে থাকে। হিরোইন, ইয়াবা, ফেন্সিডিল, কোকেন, গাঁজা, এলএসডি ও বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক উপাদান মিশ্রিত তরল বা বড়ি আমাদের সমাজে মাদক হিসেবে পরিচিত।

তরুণ প্রজন্মের মাদকাসক্তি হওয়ার কারণ

আমাদের তরুণ সমাজ কোনো একটি নির্দিষ্ট কারণে মাদকাসক্তি হয়ে পড়ছে না, এর পেছনে রয়েছে বহুবিধ সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণ। যেমন:

সঙ্গদোষ: বেশিরভাগ তরুণ কৌতূহলবশত বা বন্ধুদের চাপে পড়ে প্রথমবার মাদক গ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে তা অভ্যাসে পরিণত হয়।

পারিবারিক কলহ ও দূরত্বের অভাব: পরিবারের বাবা-মায়ের মধ্যে অশান্তি, অবহেলা, এবং সন্তানদের সঠিক সময়ে পর্যাপ্ত সময় ও ভালোবাসা না দেওয়ার কারণে তরুণরা একাকীত্বে ভোগে ও মাদকের দিকে ধাবিত হয়।

হতাশা ও বেকারত্ব: পড়াশোনা শেষ করে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অভাব এবং জীবনের নানা ব্যর্থতা থেকে তৈরি হওয়া তীব্র মানসিক চাপ বা ডিপ্রেসন কাটাতে অনেকে মাদকের আশ্রয় নেয়।

মাদকের সহজলভ্যতা: অবৈধ চোরাচালানের মাধ্যমে শহর থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলেও এখন হাতের নাগালে মাদক পাওয়া যায়।

অপসংস্কৃতির প্রভাব: ইন্টারনেট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং বিভিন্ন বিনোদন মাধ্যমে মাদকের ব্যবহারকে আধুনিকতা বা ফ্যাশন হিসেবে ভুলভাবে উপস্থাপন করার ফলেও তরুণরা বিভ্রান্ত হচ্ছে।

তরুণ সমাজ ও দেশের ওপর মাদকাসক্তির কুপ্রভাব

মাদকাসক্তি একজন তরুণকে তিলে তিলে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় এবং পুরো সমাজ ব্যবস্থাকে অচল করে তোলে। এর নেতিবাচক প্রভাবগুলো হলো:

শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয়: মাদক গ্রহণের ফলে লিভার, কিডনি, ফুসফুস ও হৃদযন্ত্র মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাশাপাশি স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়া, মানসিক ভারসাম্য হারানো ও আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

পারিবারিক ও সামাজিক বিপর্যয়: একটি পরিবারে একজন মাদকাসক্ত সন্তান থাকলে সেই পরিবারের শান্তি চিরতরে বিলুপ্ত হয়। নেশার টাকা জোগাড় করতে গিয়ে পারিবারিক কলহ ও বাবা-মার ওপর শারীরিক নির্যাতনের ঘটনাও ঘটে।

অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি: মাদকের টাকা জোগাড়ের জন্য তরুণরা চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, চাঁদাবাজি এবং খুনের মতো চরম অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে।

জাতীয় অর্থনীতির ক্ষতি: তরুণ জনশক্তি দেশের অর্থনৈতিক চালিকাশক্তি। কিন্তু এই বিশাল অংশটি কর্মক্ষমতা হারিয়ে দেশের জন্য এক বিরাট বোঝায় পরিণত হচ্ছে, যা পরোক্ষভাবে দেশের উন্নয়নকে থমকে দিচ্ছে।

মাদকাসক্তি প্রতিরোধের উপায়

মাদকাসক্তি নামক এই সামাজিক অভিশাপ থেকে তরুণদের বাঁচাতে হলে সমন্বিত ও সুপরিচালিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি:

পারিবারিক সচেতনতা বৃদ্ধি: পরিবার হলো মানুষের প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র। বাবা-মাকে সন্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে, তাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখতে হবে এবং জীবনের কঠিন সময়ে পাশে দাঁড়াতে হবে।

মাদকের অপব্যবহার রোধে কঠোর আইন: দেশের সীমান্ত অঞ্চলগুলোতে কড়া নজরদারি নিশ্চিত করতে হবে এবং মাদক চোরাচালান ও ব্যবসার সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

সুস্থ বিনোদনের সুযোগ তৈরি: তরুণদের মাঠমুখী করতে পর্যাপ্ত খেলাধুলার ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, এবং বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে জড়িত করার সুযোগ বাড়াতে হবে।

সামাজিক সচেতনতা ও শিক্ষা: শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় উপাসনালয় এবং গণমাধ্যমের সহায়তায় মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে যুবসমাজের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতামূলক প্রচারণা চালাতে হবে।

পুনর্বাসন ও চিকিৎসা

যারা ইতিমধ্যে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে, তাদের সমাজ থেকে দূরে ঠেলে না দিয়ে সহানুভূতির সাথে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে হবে। এর জন্য আধুনিক চিকিৎসা, মনস্তাত্ত্বিক কাউন্সেলিং এবং সরকারি-বেসরকারি মাদক নিরাময় বা পুনর্বাসন কেন্দ্রের ভূমিকা অপরিসীম। স্নেহ, ভালোবাসা ও সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

উপসংহার

তারুণ্য হলো সৃষ্টির, তারুণ্য হলো এগিয়ে যাওয়ার। মাদকের বিষাক্ত ছোবলে এই অমিত সম্ভাবনাকে অকালে ঝরে যেতে দেওয়া যায় না। মাদকাসক্তি মুক্ত সমাজ গঠন কেবল কোনো একক ব্যক্তি বা সরকারের কাজ নয়; এটি আমাদের সকলের সম্মিলিত দায়িত্ব। আসুন, তরুণ প্রজন্মকে রক্ষা করতে আমরা সবাই মিলে আওয়াজ তুলি — "মাদককে না বলুন, জীবনকে হ্যাঁ বলুন।"

ঙ) জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ

উত্তরঃ ১. ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত ও উদ্বেগজনক একক সংকট হলো জলবায়ু পরিবর্তন। মানব সভ্যতার দ্রুত বিকাশ, অনিয়ন্ত্রিত শিল্পায়ন এবং প্রকৃতির ওপর নির্মম অত্যাচারের ফলে পৃথিবীর আবহাওয়ার স্বাভাবিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেছে। ভৌগোলিক গঠন ও অবস্থানের কারণে এই পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় শিকার আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। বাংলাদেশ বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণে মাত্র ০.৪৭ শতাংশের কম দায়ী হলেও, জলবায়ুর নেতিবাচক প্রভাবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত শীর্ষ দেশগুলোর একটি।

২. জলবায়ু পরিবর্তন কী?

সাধারণভাবে কোনো স্থানের ৩০ থেকে ৪০ বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থাকে জলবায়ু বলে। এই দীর্ঘমেয়াদি আবহাওয়ার উপাদান যেমন—তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদির স্থায়ী ও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনই হলো জলবায়ু পরিবর্তন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে জলবায়ু পরিবর্তন বলতে মূলত 'বৈশ্বিক উষ্ণায়ন' বা পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে বোঝায়।

৩. জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ দুটি: প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট। তবে বর্তমান সংকটের জন্য মানুষের কর্মকাণ্ডই সবচেয়ে বেশি দায়ী।

গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ: কয়লা, খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস পোড়ানোর ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন ও সিএফসি (CFC) গ্যাসের পরিমাণ অত্যাধুনিক হারে বাড়ছে। এই গ্যাসগুলো সূর্যের তাপকে ধরে রেখে পৃথিবীকে উত্তপ্ত করছে।

বনভূমি উজাড়: কলকারখানা স্থাপন, নগরায়ণ এবং অতিরিক্ত জনসংখ্যার বাসস্থানের জন্য নির্বিচারে গাছপালা কাটা হচ্ছে। ফলে প্রকৃতি কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণের ক্ষমতা হারাচ্ছে।

শিল্পায়ন: উন্নত দেশগুলোর অতিরিক্ত শিল্প উৎপাদন এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার এই সংকটকে তীব্রতর করেছে।

৪. বাংলাদেশের জলবায়ু ও ভৌগোলিক ঝুঁকি

বাংলাদেশ একটি ব-দ্বীপ অঞ্চল। এর দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর এবং উত্তর ও পূর্বে রয়েছে পাহাড়। নদীমাতৃক এবং সমতল ভূমির দেশ হওয়ায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা সামান্য বাড়লেই বাংলাদেশের বিশাল এলাকা তলিয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে থাকে। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত হওয়ায় এ দেশের ঋতুচক্র তীব্রভাবে আবহাওয়ার ওপর নির্ভরশীল।

৫. বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তনের বহুমুখী নেতিবাচক প্রভাব বাংলাদেশে ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে:

প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘনঘটা: বাংলাদেশে আইলা, সিডর, আম্পান, রেমালের মতো প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় এবং আকস্মিক বন্যার প্রবণতা ও তীব্রতা অনেক বেড়ে গেছে।

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি: বিজ্ঞানীদের মতে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় ১৭% এলাকা পানির নিচে তলিয়ে যেতে পারে, যার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ 'জলবায়ু উদ্বাস্তু' (Climate Refugees) হবে।

লবণাক্ততা বৃদ্ধি: সমুদ্রের পানি প্রবেশ করায় উপকূলীয় অঞ্চলের ফসলি জমি ও সুপেয় পানির উৎসগুলোতে লবণাক্ততা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তায় ধস: অসময়ে বন্যা, খরা ও অতিবৃষ্টির কারণে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে খরার তীব্রতা বাড়ছে, যা খাদ্য নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি।

জীববৈচিত্র্য ধ্বংস: বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনের উদ্ভিদ ও রয়েল বেঙ্গল টাইগারসহ অসংখ্য বন্যপ্রাণী সমুদ্রের নোনা পানির অনুপ্রবেশের কারণে হুমকির মুখে পড়েছে।

৬. সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশের পদক্ষেপ

সীমিত সম্পদ সত্ত্বেও বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন (Adaptation) ও প্রশমনে (Mitigation) বিশ্বে রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে:

নিজস্ব তহবিল গঠন: বাংলাদেশ সরকার নিজস্ব অর্থায়নে 'বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড' (BCCTF) গঠন করেছে।

সাইক্লোন শেল্টার ও বাঁধ নির্মাণ: উপকূলীয় এলাকায় হাজার হাজার ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র এবং টেকসই বেড়িবাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে।

দুর্যোগ পূর্বাভাস ব্যবস্থার আধুনিকায়ন: আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে দুর্যোগের আগাম সতর্কবার্তা তৃণমূল মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

লবণাক্ততা-সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবন: বাংলাদেশের কৃষি বিজ্ঞানীরা লবণাক্ততা ও খরা-সহিষ্ণু ধান (যেমন- ব্রি ধান) উদ্ভাবন করেছেন, যা প্রতিকূল পরিবেশেও ফলন দিচ্ছে।

মুজিব ক্লাইমেট প্রসপারিটি প্ল্যান: জলবায়ু ঝুঁকিকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে রূপান্তর করার লক্ষ্যে এই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৭. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও বৈশ্বিক দায়িত্ব

যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক সমস্যা, তাই শুধু বাংলাদেশের পক্ষে এর স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। প্যারিস জলবায়ু চুক্তির বাস্তবায়ন এবং উন্নত দেশগুলো কর্তৃক কার্বন নিঃসরণ কমানো ও ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে প্রতিশ্রুত জলবায়ু তহবিল (Climate Fund) প্রদান করা জরুরি। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মঞ্চে (যেমন- COP সম্মেলন) জলবায়ু ন্যায়ের (Climate Justice) দাবিতে জোরালো ভূমিকা পালন করে আসছে।

৮. উপসংহার

জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের অস্তিত্বের লড়াই। এই সংকট মোকাবিলায় আমাদের যেমন জাতীয়ভাবে বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ দূষণ রোধ ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে, তেমনি আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্বনেতাদেরও দায়িত্বশীল হতে হবে। সম্মিলিত ও টেকসই প্রচেষ্টার মাধ্যমেই কেবল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ ও সবুজ বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।

✨ ধন্যবাদ! ✨

কোন প্রশ্নের বানান বা উত্তর ভুল থাকলে রিপোর্ট করুন | *Thank you for reading!*

আরও দেখুন: sattacademy.com

⚠️ Sattacademy -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ

🌐 sattacademy.com | 📞 +880 1306 446390



মডেল ৪

লিখিত প্রশ্ন

(১)

(ক) উদাহরণসহ 'য' (্য) ফলা উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লেখো।

উত্তর: 'য' ফলা উচ্চারণের নিয়মঃ উদাহরণ সহঃ

- ১। য-ফলার পর ব্যঞ্জনধ্বনি বা অ, আ, ও ধ্বনি থাকলে য-ফলা 'অ্যা' উচ্চারিত হয়। যেমন- ব্যবহার (ব্যাবোহার)
- ২। য-ফলার পরে 'ই' ধ্বনি থাকলে য-ফলা 'এ' উচ্চারিত হয়। যেমন- ব্যতীত (বেতিতো)
- ৩। য-ফলা শব্দের মাঝে বা শেষে থাকলে 'দ্বিত্ব' উচ্চারিত হয়। যেমন- বিদ্যুৎ (বিদ্বুত)
- ৪। শব্দের প্রথমে য-ফলার সাথে উ-কার, উ-কার, ও-কার থাকলে য-ফলার উচ্চারণ হয় না। যেমন- দুতি (দুতি)
- ৫। হ'-এর পর য-ফলা থাকলে য-ফলা 'জ্ব' উচ্চারিত হয়। যেমন- সহ্য (শোজ্বো)

অথবা

(খ) যেকোনো পাঁচটি শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ লেখো :

অসহ্য

উত্তর: অসহ্য = অশোজ্বো

বিকৃত

উত্তর: বিকৃত = বি-ক্রিতো

আহ্লাদ

উত্তর: আহ্লাদ - আল্হাদ

প্রকৃতি

উত্তর: প্রকৃতি = প্রোক্রিতি

অপ্রীতিকর

উত্তর: অপ্রীতিকর = ওপপ্রীতিঙ্কোর।

বিজ্ঞপ্তি

উত্তর: বিজ্ঞপ্তি = বিগ্গপ্তি

প্রায়শ্চিত্ত

উত্তর: প্রায়শ্চিত্ত = প্রায়োশ্চিত্তো

(১১)

(ক) 'সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ' বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর একটি সংলাপ রচনা করো।

উত্তরঃ 'সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ' বিষয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি

সচেতনতামূলক সংলাপ:

শিক্ষক: শুভ সকাল, তন্নয়। কেমন আছ?

শিক্ষার্থী: শুভ সকাল, স্যার। আমি ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন?

শিক্ষক: আমিও ভালো আছি। তবে ইদানীং একটি বিষয় আমাকে বেশ ভাবিয়ে তুলছে। বিশেষ করে ফেসবুক বা অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তোমাদের মতো তরুণদের বাংলা লেখার ধরন দেখে আমি কিছুটা চিন্তিত।

শিক্ষার্থী: কেন স্যার? আমরা তো নিয়মিতই বাংলায় মনের ভাব প্রকাশ করছি। সেখানে কী ধরনের সমস্যা হচ্ছে?

শিক্ষক: সমস্যাটা হচ্ছে ভাষার বিকৃতি ও অপপ্রয়োগের। আজকাল তোমরা ইংরেজি অক্ষরে বাংলা লিখছ, যাকে বলা হয় 'বাংলিশ'। আবার অনেক সময় দেখা যায় শুদ্ধ বাংলা বানানের তোয়াক্কা না করে এক অদ্ভুত জগাখিচুড়ি ভাষার সৃষ্টি করা হচ্ছে।

শিক্ষার্থী: স্যার, আসলে সামাজিক মাধ্যমে দ্রুত টাইপ করার জন্য কিংবা বন্ধুদের সাথে একটু অনানুষ্ঠানিক বা 'স্মার্ট' কথোপকথনের জন্য আমরা অনেক শব্দ সংক্ষেপ করি বা অন্যভাবে লিখি। এটাকে কি খুব বড় অপরাধ বলা যায়?

শিক্ষক: এটাকে অপরাধ না বললেও ভাষার জন্য এটি মারাত্মক ক্ষতিকর। দেখো, যে ভাষার জন্য আমাদের পূর্বপুরুষেরা রক্ত দিয়েছেন, সেই ভাষার বিকৃতি কোনোভাবেই কাম্য নয়। সামাজিক মাধ্যমে ভুল বানানের ছড়াছড়ি আর বিকৃত উচ্চারণের কারণে নতুন প্রজন্ম কিন্তু আসল শুদ্ধ বাংলাটাই ভুলে যাচ্ছে। অনেকে আবার বাংলার সাথে ইংরেজি ও হিন্দি মিশিয়ে এক জগাখিচুড়ি ভাষা ব্যবহার করছে।

শিক্ষার্থী: আপনি ঠিকই বলেছেন, স্যার। অনেক সময় আমিও খেয়াল করেছি, ফেসবুকে কোনো কোনো মন্তব্যে বা পোস্টে অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ ও মার্জিতহীন ভাষা ব্যবহার করা হয়। কোনো দ্বিমত থাকলেই মানুষ একে অপরকে অকথ্য ভাষায় আক্রমণ করে।

শিক্ষক: একদম ঠিক ধরেছ। ভাষার অপপ্রয়োগ শুধু বানানেই নয়, ব্যবহারের শালীনতাতেও প্রকাশ পায়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজের মতামত অবশ্যই প্রকাশ করা যাবে, তবে তা হতে হবে মার্জিত এবং যুক্তিপূর্ণ ভাষায়। ভাষা যখন তার সৌন্দর্য আর মর্যাদা হারায়, তখন তা সংস্কৃতির অবক্ষয় ঘটায়।

শিক্ষার্থী: স্যার, আমরা এই পরিস্থিতি থেকে কীভাবে উত্তরণ পেতে পারি? আমাদের কী করা উচিত?

শিক্ষক: প্রথমত, তোমাদের মতো তরুণদের সচেতন হতে হবে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লেখার সময় একটু সময় নিয়ে শুদ্ধ বানান ও সঠিক ব্যাকরণ মেনে লেখার অভ্যাস করতে হবে। এখন তো মোবাইলেই খুব সুন্দর বাংলা কিবোর্ড ব্যবহার করা যায়, তাই 'বাংলিশ' পরিহার করে সরাসরি বাংলা অক্ষরে লেখা উচিত। আর যেকোনো পরিস্থিতিতেই ভাষার শালীনতা বজায় রাখতে হবে।

শিক্ষার্থী: বুঝতে পেরেছি, স্যার। আজ থেকে আমি নিজেও সামাজিক মাধ্যমে শুদ্ধ বাংলা লিখতে সচেতন থাকব এবং আমার বন্ধুদেরও এই ব্যাপারে উৎসাহিত করব।

শিক্ষক: চমৎকার! তোমাদের মতো তরুণরা এগিয়ে আসলেই আমাদের মাতৃভাষার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।

শিক্ষার্থী: আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ, স্যার। আপনার মূল্যবান পরামর্শের জন্য কৃতজ্ঞ রইলাম।

অথবা

(খ) প্রদত্ত গল্পের সংকেত-সূত্র অবলম্বনে একটি খুদেগল্প রচনা করো। প্রতিদিন লাল সূর্যটা জানান দেয় কীভাবে নতুন প্রত্যয়ে এগিয়ে যেতে হয় -----

উত্তরঃ প্রতিদিন লাল সূর্যটা জানান দেয় কীভাবে নতুন প্রত্যয়ে এগিয়ে যেতে হয়। কিন্তু রনির জীবনটা যেন সেই ভোরের সূর্যের আলো থেকে অনেক দূরে, এক ঘন অন্ধকারের মধ্যে থমকে গিয়েছিল। তিন বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে সরকারি চাকরির শেষ ভাইভা পরীক্ষা থেকেও যখন সে খালি হাতে ফিরল, তখন চারপাশের চেনা পৃথিবীটা তার কাছে হঠাৎ করেই পর হয়ে গেল। হতাশার এক তীব্র কোণঠাসা অনুভূতি তাকে গ্রাস করেছিল। আত্মীয়-স্বজনদের অবহেলা আর বন্ধুদের এড়িয়ে চলা তাকে বাধ্য করেছিল ঘরের কোণে নিজেকে বন্দি করে ফেলতে।

একদিন গভীর রাতে রনি সিদ্ধান্ত নিল, এভাবে বেঁচে থাকার কোনো অর্থ নেই। সব কষ্টের চিরতরে অবসান ঘটানোই শ্রেয়। বিষণ্ণ মনে সে রাতের শেষ প্রহরে ছাদটিতে গিয়ে দাঁড়াল। চারদিক নিস্তব্ধ, শুধু হালকা কুয়াশার চাদর। ঠিক যখন সে এক চরম আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিতে যাবে, তখনই পূর্ব দিগন্তের মেঘের কোল ঘেঁষে এক ফালি লাল আভা ফুটে উঠল। রনি থমকে দাঁড়াল। সে দেখল, রাতের সমস্ত জমাট বাঁধা অন্ধকারকে এক তুড়িতে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে লাল টকটকে সূর্যটা পরম শক্তিতে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। প্রকৃতি যেন ফিসফিস করে তাকে বলল, "রাত যত গভীরই হোক না কেন, সকাল কিন্তু আসবেই।"

সূর্যের এই প্রতিদিনের লড়াই রনির মনের ভেতরের সুপ্ত জেদটাকে জাগিয়ে তুলল। সে ভাবল, প্রকৃতি যদি প্রতি নিয়ত অন্ধকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জিততে পারে, তবে সে কেন সামান্য এক ব্যর্থতার কাছে হেরে যাবে? চাকরি পাননি তো কী হয়েছে, নিজের মেধা তো এখনো ফুরিয়ে যায়নি! রনি ছাদ থেকে নেমে এলো এক নতুন মানুষ হয়ে। আত্মহত্যার কাপুরুষোচিত চিন্তা ঝেড়ে ফেলে সে তার জমানো অল্প কিছু টাকা এবং বন্ধুদের কাছ থেকে নেওয়া ধার দিয়ে শুরু করল একটি ক্ষুদ্র আইটি স্টার্ট-আপ ও ফ্রিল্যান্সিং এজেন্সি।

প্রথম কয়েক মাস ছিল চরম কঠিন ও লাভহীন। কিন্তু এবার রনির সাথে ছিল সূর্যের সেই হার না মানা প্রত্যয়। দিন-রাত এক করে কঠোর পরিশ্রম, নতুন দক্ষতা অর্জন আর সততার জোরে আস্তে আস্তে তার প্রতিষ্ঠানটি দাঁড়িয়ে গেল। দুই বছরের মাথায় রনির সেই ছোট্ট উদ্যোগটি এখন একটি সফল আইটি ফার্ম, যেখানে আরও দশজন বেকার তরুণের কর্মসংস্থান হয়েছে। এখন প্রতিদিন ভোরে যখন লাল সূর্যটা ওঠে, রনি তার অফিসের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সেটির দিকে তাকায়। সে মনে মনে হাসে আর কৃতজ্ঞতা জানায় সেই ভোরের সূর্যকে, যা তাকে শিখিয়েছিল—ভেঙে পড়া মানেই শেষ নয়, বরং নতুন করে দ্বিগুণ শক্তিতে জেগে ওঠার এক দুর্দান্ত শুরু।

(১০)

(ক) সারাংশ লেখো :

ক্রোধ মানুষের পরম শত্রু। ক্রোধ মানুষের মনুষ্যত্ব নাশ করে। যে লোমহর্ষক কাণ্ডগুলো পৃথিবীকে নরকে পরিণত করিয়াছে, তাহার মূল্যে ও রহিয়াছে ক্রোধ। ক্রোধ যে মানুষকে পশুভাবাপন্ন করে, তাহা একবার ক্রুদ্ধ ব্যক্তির মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। যে ব্যক্তির মুখখানা সর্বদা হাসিমাখা, উদারভাবে পরিপূর্ণ, দেখিলেই তোমার মনে আনন্দ ধরে না, কিন্তু একবার ক্রোধের সময় সেই মুখখানির দিকে তাকাইও; দেখিবে, সে স্বর্গের সুখমা আর নাই। নরকান্নিতে বিকট রূপ ধারণ করিয়াছে। সমস্ত মুখ কি এক কালিমায় ঢাকিয়া গিয়াছে। তখন তাহাকে আলিঙ্গন করা দূরে থাকুক, তাহার নিকটে যাইতেও ইচ্ছা হয় না। সুন্দরকে মুহূর্তের মধ্যে কুৎসিত করিতে অন্য কোনো রিপু ক্রোধের ন্যায় কৃতকার্য হয় না।

উত্তরঃ সারাংশ: ক্রোধ মানুষের বড়ো শত্রু। তা মনুষ্যত্ব অর্জনের পথে বড়ো বাধা। পৃথিবীতে যত অমানবিক ঘটনা ঘটে তার জন্য মূলত ক্রোধই দায়ী। মানুষকে পশুত্বের পর্যায়ে নিয়ে যায় ক্রোধ। এর কারণেই মানুষে মানুষে সৃষ্টি হয় অনাকাঙ্ক্ষিত দূরত্ব।

অথবা

(খ) ভাব-সম্প্রসারণ করো :

ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে

ধ্বনির কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।

উত্তরঃ **ভাবসম্প্রসারণঃ** বাস্তব বা প্রকৃতিতে প্রতিধ্বনির নিজস্ব কোনো আওয়াজ নেই। মূল ধ্বনি বা শব্দের কারণেই প্রতিধ্বনির জন্ম হয়। শব্দ ছাড়া প্রতিধ্বনি সম্পূর্ণ মূল্যহীন। অথচ এই সত্য আড়াল করতে প্রতিধ্বনি যেন মূল ধ্বনিকে উপহাস বা ব্যঙ্গ করে। কারণ, সে ভালো করেই জানে যে, মূল ধ্বনি ছাড়া তার অস্তিত্ব নেই এবং সে তার কাছে চিরঋণী।

মানবজীবনেও এমন বহু অকৃতজ্ঞ মানুষ দেখা যায়। সমাজে এমন অনেক ব্যক্তি রয়েছেন যারা পরোপকার বা অন্যের সাহায্যে জীবনে উন্নতি লাভ করেন। কিন্তু নিজের অক্ষমতা, দুর্বলতা ও হীনমন্যতা ঢাকতে তারা উল্টো তাদের সাহায্যকারী বা উপকারীরই সমালোচনা করেন। তারা দেখাতে চান যে, তারা কারও অনুগ্রহ ছাড়াই স্বাবলম্বী। নিজের স্বার্থ ও অহমিকা বজায় রাখতে তারা উপকারীর বদনাম করতেও দ্বিধা করেন না। মূলত, হীনমন্যতা ও অকৃতজ্ঞতা থেকেই এমন আচরণের জন্ম হয়।

উপসংহারঃ পরশ্রীকাতরতা এবং অকৃতজ্ঞতা মানুষের একটি নিকৃষ্ট স্বভাব। অন্যের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সেই সাহায্যকে অস্বীকার করা শুধু অনৈতিকই নয়, বরং নিজের নীচতা ও কাপুরুষতারই বহিঃপ্রকাশ।

(৯)

(ক) দুর্ঘটনায় আহতদের সাহায্যার্থে রক্ত ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা চেয়ে বন্ধুদের কাছে প্রেরণের জন্য একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লেখো।

উত্তরঃ **প্রেরকঃ** ahmed.rafi@email.com

প্রাপকঃ friends.group@email.com

তারিখঃ ১২ জুন, ২০২৬

বিষয়ঃ দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসায় জরুরি রক্ত ও আর্থিক সহায়তা প্রদান প্রসঙ্গে।

প্রিয় বন্ধুরা,

আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজ এক অত্যন্ত জরুরি ও মানবিক কারণে তোমাদের কাছে এই বৈদ্যুতিন চিঠি (ই-মেইল) লিখছি।

গতকাল বিকেলে আমাদের এলাকার ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে একটি ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় বেশ কয়েকজন সাধারণ যাত্রী গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। বর্তমানে তাদের স্থানীয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে ৩ জনের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক এবং তাদের জরুরি ভিত্তিতে অস্ত্রোপচার করা প্রয়োজন।

এই মুহূর্তে চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী তাদের জন্য জরুরি ভিত্তিতে ‘ও পজিটিভ’ (O+) এবং ‘বি নেগেটিভ’ (B-) রক্তের প্রয়োজন। একই সাথে, আহতদের পরিবারগুলো আর্থিকভাবে অত্যন্ত অসচ্ছল হওয়ায় অস্ত্রোপচার ও দামি ওষুধপত্র কেনার খরচ বহন করতে পারছে না।

এই সংকটময় মুহূর্তে আমাদের সবার সম্মিলিত সহযোগিতা তাদের প্রাণ বাঁচাতে পারে। তোমাদের কাছে আমার আকুল আবেদন:

রক্তদানঃ তোমাদের মধ্যে যাদের রক্তের গ্রুপ ‘O+’ বা ‘B-’, তারা অনুগ্রহ করে দ্রুত হাসপাতালে এসে রক্ত দিয়ে যান অথবা আপনাদের পরিচিত কোনো রক্তদাতাকে অবিলম্বে যোগাযোগ করতে বলুন।

আর্থিক সাহায্যঃ চিকিৎসার খরচ জোগাতে যে যার সামর্থ্য অনুযায়ী আর্থিক সহায়তা করুন। আপনাদের পাঠানো সাহায্য সরাসরি নিচে দেওয়া বিকাশ বা রকেট নম্বরে পাঠাতে পারেন।

সহায়তা পাঠানোর মাধ্যমঃ

বিকাশ/রকেট নম্বরঃ ০১৭XXXXXXXX (ব্যক্তিগত)

যোগাযোগের ঠিকানা: জরুরি বিভাগ, স্থানীয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

মোবাইল নম্বর: ০১৯XXXXXXXX (রাফি)

আমাদের সামান্য একটু অবদান হয়তো একটি পরিবারের মুখে হাসি ফিরিয়ে আনতে পারে। তোমাদের পরিচিত অন্যান্য গ্রুপ বা বন্ধুদের মাঝেও এই বার্তাটি দ্রুত শেয়ার করার অনুরোধ রইল।

তোমাদের উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।

ইতি,

আহমেদ রাফি

সদস্য, সচেতন তরুণ সমাজ।

অথবা

(খ) প্রশংসাপত্র চেয়ে কলেজ অধ্যক্ষের নিকট একটি আবেদনপত্র লেখো।

উত্তর: তারিখ: ১২ জুন, ২০২৬

বরাবর,

অধ্যক্ষ,

[কলেজের নাম লিখুন]

[কলেজের ঠিকানা লিখুন]

বিষয়: প্রশংসাপত্র পাওয়ার জন্য আবেদন।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমি আপনার কলেজের [শিক্ষাবর্ষ লিখুন, যেমন: ২০২২-২৩] শিক্ষাবর্ষের বিজ্ঞান/মানবিক/ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের একজন নিয়মিত ছাত্র/ছাত্রী ছিলাম। আমি [পরীক্ষার বছর লিখুন] সালের এইচএসসি পরীক্ষায় [বোর্ডের নাম] বোর্ডের অধীনে অংশগ্রহণ করে জিপিএ [আপনার প্রাপ্ত জিপিএ, যেমন: ৫.০০] পেয়ে সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছি। আমার রোল নম্বর [রোল নম্বর লিখুন] এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর [রেজিস্ট্রেশন নম্বর লিখুন]।

বর্তমানে উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে/বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য আমার একটি চারিত্রিক ও একাডেমিক প্রশংসাপত্র প্রয়োজন। কলেজ অধ্যয়নকালীন আমি সর্বদা শিষ্টাচার বজায় রেখেছি এবং কোনো প্রকার শৃঙ্খলাবিরোধী কাজে লিপ্ত ছিলাম না।

অতএব, মহোদয়ের নিকট বিনীত প্রার্থনা, উক্ত বিষয়টি বিবেচনা করে আমাকে একটি প্রশংসাপত্র প্রদান করতে আপনার সদয় মর্জি হয়।

নিবেদক,

আপনার অনুগত ছাত্র/ছাত্রী,

[আপনার নাম লিখুন]

বিভাগ: [আপনার বিভাগ]

এইচএসসি রোল নং: [রোল নম্বর]

সেশন: [শিক্ষাবর্ষ]

মোবাইল নম্বর: [আপনার নম্বর]

(৮)

(ক) সম্প্রতি সমাপ্ত চারদিনের সিলেট শিক্ষাসফরের বর্ণনা দিয়ে একটি দিনলিপি লেখো।

উত্তর: সিলেট শিক্ষাসফরের চমৎকার অভিজ্ঞতা নিয়ে চারদিনের একটি দিনলিপি নিচে দেওয়া হলো:

১১ জুন, ২০২৬

প্রথম দিন: চায়ের দেশে আগমন

সকাল ৮টায় আমাদের স্কুল বাস সিলেটের উদ্দেশে রওনা দেয়। দীর্ঘ যাত্রা শেষে দুপুরে আমরা সিলেট শহরে পৌঁছাই। দুপুরের খাবার ও বিশ্রামের পর আমরা যাই মালনীছড়া চা বাগানে। চারদিকের সবুজ পাহাড় আর চায়ের গাছ দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। শিক্ষকেরা আমাদের চা পাতা সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্পর্কে ধারণা দেন। সন্ধ্যায় হজরত শাহজালাল (র.)-এর মাজার জিয়ারত করে হোটেল ফিরে আসি।

১২ জুন, ২০২৬

দ্বিতীয় দিন: জাফলং ও পিয়াইন নদী

আজকের গন্তব্য ছিল জাফলং। সকালের নাশতা সেরেই আমরা রওনা হই। সেখানে গিয়ে ভারতের মেঘালয় পাহাড়ের কোল ঘেঁষে বয়ে চলা পিয়াইন নদী দেখে আমরা মুগ্ধ হই। স্বচ্ছ পানির নিচে পাথর আর পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝরনার দৃশ্য ছিল দেখার মতো। আমরা নৌকায় চড়ে নদীর চারপাশ ঘুরে দেখি এবং পাথর তোলার প্রক্রিয়া সশরীরে প্রত্যক্ষ করি। পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারলাম।

১৩ জুন, ২০২৬

তৃতীয় দিন: রাতারগুল ও সাদ পাথর

আজ আমরা প্রথমে যাই রাতারগুল সোয়াম্প ফরেস্ট বা জলমগ্ন বনে। নৌকায় করে বনের ভেতরে ঘোরার অভিজ্ঞতা ছিল রোমাঞ্চকর। পানির ওপর ভেসে থাকা হিজল-করচের বন এবং বন্যপ্রাণীর ডাক আমাদের এক ভিন্ন জগতে নিয়ে যায়। দুপুরের পর আমরা যাই ভোলাগঞ্জের 'সাদাপাথর' এলাকায়। ধবধবে সাদা পাথর আর মেঘালয়ের পাহাড় থেকে নেমে আসা শীতল পানির স্রোতে পা ভিজিয়ে আমাদের সব ক্লান্তি দূর হয়ে যায়।

১৪ জুন, ২০২৬

চতুর্থ দিন: শাহী ঈদগাহ ও বিদায়

সফরের শেষ দিন আজ। সকালে আমরা সিলেটের ঐতিহাসিক শাহী ঈদগাহ এবং ঐতিহ্যবাহী কীন ব্রিজ দেখতে যাই। এগুলোর স্থাপত্যশৈলী ও ইতিহাস আমাদের শিক্ষক শিক্ষণীয়ভাবে বুঝিয়ে বলেন। দুপুরের খাবার খেয়ে আমরা স্থানীয় মণিপুরি মার্কেট থেকে কিছু স্মারক উপহার কিনি। বিকেল ৪টায় আমরা ঢাকার উদ্দেশে রওনা হই। চারদিনের এই সফর আমাদের পড়াশোনার একঘেয়েমি দূর করে এক বিশাল বাস্তব অভিজ্ঞতা দিল।

অথবা

(খ) শিশুশ্রম বন্ধের আবশ্যিকতা তুলে ধরে একটি প্রতিবেদন রচনা করো।

উত্তরঃ নিজস্ব প্রতিবেদক

ঢাকা, ১৩ জুন, ২০২৬

ভূমিকা

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। একটি দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতি নির্ভর করে তার আগামী প্রজন্মের সঠিক বিকাশের ওপর। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের দেশে অর্থনৈতিক সংকটের কারণে বিপুলসংখ্যক শিশু তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে অকালেই শ্রমের বাজারে প্রবেশ করছে। ইটভাটা, ওয়েল্ডিং কারখানা, মোটর গ্যারেজ, হোটেল-রেস্তোরাঁ থেকে শুরু করে বাস-টেম্পোর হেলপারি পর্যন্ত সব ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুদের ব্যবহার করা হচ্ছে। এই অমানবিক শিশুশ্রম বন্ধ করা এখন সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি।

শিশুশ্রমের বর্তমান চিত্র ও কারণ

বাংলাদেশে শিশুশ্রমের মূল কারণ দারিদ্র্য। অসচ্ছল পরিবারের বাবা-মায়েরা বেঁচে থাকার তাগিদে তাদের সন্তানদের স্কুলে না পাঠিয়ে উপার্জনের জন্য কাজে পাঠিয়ে দেন। এছাড়া পারিবারিক ভাঙন, প্রাকৃতিক

দুর্যোগ এবং শিক্ষার অভাবও শিশুদের শ্রমিকে পরিণত করছে। নামমাত্র মজুরিতে দীর্ঘক্ষণ কাজ করিয়ে নেওয়ার সুবিধার কারণে অনেক মালিকও প্রাপ্তবয়স্কদের চেয়ে শিশুদের কাজে নিতে বেশি আগ্রহী হন।

শিশুশ্রমের ক্ষতিকর প্রভাব

শিশুশ্রম একটি শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়।

- **শিক্ষাবঞ্চিত প্রজন্ম:** শিশুরা বিদ্যালয়ে যাওয়ার বয়সে শ্রম দেওয়ার ফলে নিরক্ষর থেকে যাচ্ছে, যা জাতিকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।
- **স্বাস্থ্যঝুঁকি:** রাসায়নিক কারখানা, ডাইং বা ওয়েল্ডিংয়ের মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে অংশ নিয়ে শিশুরা ফুসফুসের রোগ, দৃষ্টিহীনতা ও পঙ্গুত্বের শিকার হচ্ছে।
- **মানসিক বিপর্যয়:** শৈশবের আনন্দ ও খেলাধুলা থেকে বঞ্চিত হয়ে এই শিশুরা চরম হীনম্মন্যতা ও মানসিক অবসাদে ভোগে। অনেকেই পরবর্তীতে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে।

শিশুশ্রম বন্ধের আবশ্যিকতা

একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গঠনে শিশুশ্রম বন্ধ করা অপরিহার্য। শিশুদের সুশিক্ষা নিশ্চিত না করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জন করা অসম্ভব। আন্তর্জাতিক শ্রম আইন ও বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সী শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ করা দণ্ডনীয় অপরাধ। শিশুদের অধিকার রক্ষা করা কোনো দয়া বা করুণা নয়, বরং এটি রাষ্ট্রের আইনি ও আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

উত্তরণের উপায় ও সুপারিশ

শিশুশ্রমের মতো একটি সামাজিক ব্যাধি রাতারাতি দূর করা সম্ভব নয়। তবে সুনির্দিষ্ট কিছু পদক্ষেপের মাধ্যমে এটি সম্পূর্ণ নির্মূল করা সম্ভব:

১. **দারিদ্র্য বিমোচন:** হতদরিদ্র পরিবারগুলোকে সামাজিক নিরাপত্তা বেস্তনীর আওতায় এনে আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে হবে।
২. **বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা:** প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিশুদের উপবৃত্তি ও বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ দিয়ে বিদ্যালয়ে ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
৩. **আইনের কঠোর প্রয়োগ:** শিশুশ্রম বিরোধী আইনের কঠোর বাস্তবায়ন করতে হবে। শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগকারী মালিকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
৪. **সচেতনতা বৃদ্ধি:** শিশুশ্রমের কুফল সম্পর্কে গণমাধ্যম, সেমিনার ও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে জনসচেতনতা তৈরি করতে হবে।

উপসংহার

শিশুদের হাত হাতুড়ি বা কালির বাটি ধরার জন্য নয়, বরং বই-খাতা আর কলম ধরার জন্য। তাদের শৈশবকে কারখানার অন্ধকার ঘরে বন্দি না রেখে মুক্ত আকাশে ডানা মেলায় সুযোগ করে দিতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগ এবং আমাদের সবার সচেতন প্রয়াসই পারে দেশকে শিশুশ্রমের অভিষাপ থেকে মুক্ত করতে।

(৭)

(ক) যেকোনো দশটি শব্দের পরিভাষিক রূপ লেখো :

অথবা

Walkover

উত্তরঃ Walkout - সভাবর্জন

Banch

উত্তরঃ Banch = শাখা

Nomination

উত্তরঃ Nomination = মনোনয়ন

Receipt

উত্তরঃ Receipt = প্রাপ্তিস্বীকার

Philology

উত্তরঃ Philology = ভাষাবিদ্যা

Portfolio

উত্তরঃ Portfolio = কার্যাবলি

Escort

উত্তরঃ Escort = দেহরক্ষী।

Outlet

উত্তরঃ Outlet = বিক্রয়কেন্দ্র

Folio

উত্তরঃ Folio = পাতা

Norm

উত্তরঃ Norm = আদর্শ

Gutter

উত্তরঃ Gutter = নর্দমা

Bailee

উত্তরঃ Bailee = জিম্মাদার

Tarrif

উত্তরঃ Tarrif = শুল্ক

Census

উত্তরঃ Census = আদমশুমারি

Litigant

উত্তরঃ Litigant = মামলাকারী

(খ) নিচের অনুচ্ছেদটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করো:

The love of mother is never exhausted. It never changes; it never tires. A father may turn his back on child; brothers and sisters may become deadly enemies; husbands may desert their wives; wives their husbands. But a mother's love endures through all;

in good repute in the face of the world's condemnation a mother still loves on, and still hopes that her child may yet turn from his evil ways and repent.

উত্তর: মায়ের ভালোবাসা কখনো শেষ হয় না। এটি কখনো পরিবর্তিত হয় না; কখনো ক্লান্ত হয় না। একজন বাবা তার সন্তানের প্রতি মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেন; ভাই ও বোনেরা মারাত্মক শত্রু হয়ে উঠতে পারে; স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের বর্জন করতে পারে; স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের। কিন্তু মায়ের ভালোবাসা সবকিছুর মধ্যেও টিকে থাকে; সুনাম কিংবা পৃথিবীর চরম নিন্দার মুখেও মা ভালোবেসে যান, এবং তখনও আশা করেন যে তার সন্তান হয়তো একদিন তার অসৎ পথ থেকে ফিরে আসবে এবং অনুতপ্ত হবে।

(৬)

(ক) নিচের যেকোনো পাঁচটি বাক্য শুদ্ধ করে লেখো:

অথবা

(i) শকুনের দোয়ায় হাতি মরে না।

উত্তর: শকুনের দোয়ায় হাতি মরে না। = শকুনের দোয়ায় গরু মরে না।

(ii) উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।

উত্তর: উপরোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়। = উপরিউক্ত/উপর্যুক্ত বাক্যটি শুদ্ধ নয়।

(iii) দুরাকাঙ্ক্ষা সর্বদা পরিত্যাজ্য।

উত্তর: দুরাকাঙ্ক্ষা সর্বদা পরিত্যাজ্য। = দুরাকাঙ্ক্ষা সর্বদা পরিত্যাজ্য।

(iv) বিবিধ প্রকার পুরস্কার।

উত্তর: বিবিধ প্রকার পুরস্কার। = বিভিন্ন প্রকার পুরস্কার।

(v) আমার আর বাঁচিবার স্বাদ নেই।

উত্তর: আমার আর বাঁচিবার স্বাদ নাই। = আমার আর বাঁচিবার সাধ নাই।

(vi) নদীর জলে অস্তমান সূর্যের ছায়া পড়েছে।

উত্তর: নদীর জলে অস্তমান সূর্যের ছায়া পড়েছে। = নদীর জলে অস্তায়মান সূর্যের ছায়া পড়েছে।

(vii) অদ্যবধি তাহার দেখা নাই।

উত্তর: অদ্যবধি তাহার দেখা নাই। = অদ্যবধি তাহার দেখা নাই।

(viii) পরবর্তীতে আপনি আবার আসবেন।

উত্তর: পরবর্তীতে আপনি আবার আসবেন। = আপনি আবার আসবেন।

(খ) অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখো :

পূর্ণিমার পরদিন। তখনো চাঁদ ওঠেনি। জ্যোৎস্নার পূর্বাভাস দেখা দিয়েছে পূর্ব দিগন্তে। সেই দিন সন্ধ্যার পর দ্বিতীয়বার দর্শন করতে গেলাম তাজমহলকে। অনুভূতিটা স্পষ্ট মনে আছে এখনো।

উত্তর: পূর্ণিমার পরদিন। তখনো চাঁদ ওঠেনি। জ্যোৎস্নার পূর্বাভাস দেখা দিয়েছে পূর্বদিগন্তে। সেই দিন সন্ধ্যার পর দ্বিতীয়বার দর্শন করতে গেলাম তাজমহলকে। অনুভূতিটা স্পষ্ট মনে আছে এখনো।

(৫)

(ক) বাগ্‌জি অনুসারে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ লেখো।

উত্তরঃ বাগ্‌জি শব্দের অর্থ হলো কথা বলার ভঙ্গি, বাকবৈশিষ্ট্য বা প্রকাশভঙ্গি। ব্যাকরণে বাগ্‌জি বা বক্তব্যের অর্থগত প্রকাশভঙ্গি অনুসারে বাক্যকে মূলত ৭টি ভাগে ভাগ করা হয়।

নিচে উদাহরণসহ বাগ্‌জি অনুসারে বাক্যের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করা হলো:

১. নির্দেশক বা বিবৃতিমূলক বাক্য (Declarative Sentence)

যে বাক্যের মাধ্যমে কোনো সাধারণ তথ্য, ঘটনা বা বক্তব্য সাধারণভাবে প্রকাশ করা হয়, তাকে নির্দেশক বাক্য বলে। এটি দুই প্রকার:

অস্তিত্ববোধক বা হ্যাঁ-বোধক (Affirmative): বাক্যটি ইতিবাচক অর্থ প্রকাশ করে।

উদাহরণ: আমরা প্রতিদিন বই পড়ি।

নেতিবাচক বা না-বোধক (Negative): বাক্যটি নেতিবাচক অর্থ প্রকাশ করে।

উদাহরণ: সে আজ স্কুলে যায়নি।

২. প্রশ্নবোধক বাক্য (Interrogative Sentence)

যে বাক্যের মাধ্যমে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা বা প্রশ্ন করা বোঝায়, তাকে প্রশ্নবোধক বাক্য বলে। এই বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) বসে।

উদাহরণ: তোমার নাম কী?

৩. অনুজ্ঞাসূচক বাক্য (Imperative Sentence)

যে বাক্যের দ্বারা আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, নিষেধ বা আমন্ত্রণ প্রকাশ করা হয়, তাকে অনুজ্ঞাসূচক বাক্য বলে।

উদাহরণ (আদেশ): এখনই পড়তে বসো।

উদাহরণ (অনুরোধ): দয়া করে আমাকে একটি কলম দিন।

৪. বিস্ময়সূচক বা আবেগসূচক বাক্য (Exclamatory Sentence)

যে বাক্যের মাধ্যমে বক্তার মনের আকস্মিক অনুভূতি, আনন্দ, দুঃখ, ভয়, ঘৃণা বা বিস্ময় প্রকাশ পায়, তাকে বিস্ময়সূচক বাক্য বলে।

উদাহরণ: বাহ! পাখিটি কী চমৎকার!

৫. ইচ্ছাসূচক বা প্রার্থনাবোধক বাক্য (Optative Sentence)

যে বাক্যের দ্বারা বক্তার কোনো ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, আশীর্বাদ বা প্রার্থনা প্রকাশ পায়, তাকে ইচ্ছাসূচক বাক্য বলে।

উদাহরণ: বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।

৬. সন্দেহসূচক বাক্য (Dubitative Sentence)

যে বাক্যের মাধ্যমে কোনো কাজের বা ঘটনার সত্যতা নিয়ে সন্দেহ, সংশয় বা সম্ভাবনা প্রকাশ পায়, তাকে সন্দেহসূচক বাক্য বলে।

উদাহরণ: হয়তো আজ বৃষ্টি হতে পারে।

৭. কার্যকারণাত্মক বা শর্তসাপেক্ষ বাক্য (Conditional Sentence)

যে বাক্যের একটি অংশের কাজ অন্য একটি অংশের কাজের ওপর বা শর্তের ওপর নির্ভর করে, তাকে কার্যকারণাত্মক বাক্য বলে।

অথবা

(খ) বন্ধনীর নির্দেশ অনুসারে যেকোনো পাঁচটির বাক্যসত্তর করো:

(i) তবু না বলা কথাটা সবাই মেনে নেয়।

উত্তরঃ তবু না বলা কথাটা সবাই মেনে নেয়। = কথাটা বলা হয় না, তবু সবাই মেনে নেয়।

(ii) যা তার প্রাপ্তি, তাই তার দান।

উত্তরঃ যা তার প্রাপ্তি তাই তার দান। = প্রাপ্তিই তার দান।

(iii) আমার কথা মনে রাখিও।

উত্তরঃ আমার কথা মনে রাখিও। = আমার কথা ভুলে যেও।

(iv) পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই।

উত্তরঃ পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই। = এমন কিছু নেই যা পৃথিবীতে অসম্ভব।

(v) অন্যায় করো না।

উত্তরঃ অন্যায় করো না। = অন্যায় করা অনুচিত।

(vi) এই গল্পটি ভোলা যায় না।

উত্তরঃ এই গল্পটি ভোলা যায় না। = এই গল্পটি এতই ভালো যে তা ভোলা যায় না।

(vii) ত্যাগের এ মহিমা অপূর্ব।

উত্তরঃ ত্যাগের এই মহিমা অপূর্ব। = কী অপূর্ব ত্যাগের মহিমা!

(viii) রীতিমতো চমকে উঠেছিলাম।

উত্তরঃ রীতিমতো চমকে উঠেছিলাম। = আমি বোধহয় রীতিমতো চমকে উঠেছিলাম।

(8)

(ক) উপসর্গ কাকে বলে। 'আম', 'নিম' ও 'কদ' উপসর্গের প্রয়োগ দেখিয়ে ২টি শব্দের উদাহরণ দাও।

উত্তরঃ উপসর্গ হলো কিছু অব্যয়বাচক শব্দাংশ, যাদের নিজস্ব কোনো অর্থ নেই। তবে এগুলো কোনো শব্দ বা ধাতুর পূর্বে যুক্ত হলে সাধিত শব্দের নতুন অর্থ তৈরি হয়, অর্থের পরিবর্তন, সম্প্রসারণ বা সংকোচন ঘটে এবং ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

নিচে 'আম', 'নিম' এবং 'কদ' উপসর্গের প্রয়োগ ও উদাহরণ দেওয়া হলো:

- আম (ফারসি/আরবি উপসর্গ - 'সাধারণ' বা 'পূর্ণ' অর্থে)
 ১. আম + জনতা = আমজনতা
 ২. আম + দরবার = আমদরবার
- নিম (ফারসি উপসর্গ - 'অর্ধেক' অর্থে)
 ১. নিম + রাজি = নিমরাজি
 ২. নিম + খুন = নিমখুন
- কদ (খাঁটি বাংলা উপসর্গ - 'নিন্দিত' বা 'খারাপ' অর্থে)
 ১. কদ + বেল = কদবেল
 ২. কদ + আকার = কদাকার

অথবা

(খ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করো : (যেকোনো পাঁচটি)

তপোবন

তপোবন = তপের নিমিত্ত বন (চতুর্থী তৎপুরুষ)।

উত্তরঃ

হিতৈষী

উত্তরঃ হিতৈষী = হিত (কল্যাণ) এষণা (ইচ্ছা) করে যে (উপপদ তৎপুরুষ সমাস)

দম্পতি

উত্তরঃ দম্পতি - জায়া ও পতি (দ্বন্দ্ব সমাস)

জয়ধ্বনি

উত্তরঃ জয়ধ্বনি = জয়সূচক ধ্বনি (মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস)

উদ্বেল

উত্তরঃ উদ্বেল = বেলাকে অতিক্রম করা (অব্যয়ীভাব সমাস)

মৃত্যুঞ্জয়

উত্তরঃ মৃত্যুঞ্জয় = মৃত্যুকে জয় করেছে যে (উপপদ তৎপুরুষ সমাস)

কাজলকালো

উত্তরঃ কাজলকালো = কাজলের মতো কালো (উপমান কর্মধারয়)

ইন্দ্রজিৎ

উত্তরঃ ইন্দ্রজিৎ = ইন্দ্রকে জয় করেছে যে (উপপদ তৎপুরুষ সমাস)

(৩)

(ক) আবেগ শব্দের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ লেখো।

উত্তরঃ প্রকাশ অনুসারে আবেগ শব্দকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন:

- সিদ্ধান্তবাচক আবেগ শব্দ: এই জাতীয় আবেগ শব্দের সাহায্যে অনুমোদন প্রকাশ পায়। যেমন: বেশ, তাই হবে।
- প্রশংসাবাচক আবেগ শব্দ: এ ধরনের আবেগ শব্দ প্রশংসা প্রকাশ করে। যেমন: বাঃ! বড় ভালো কথা বলেছ।
- বিরজ্জিবাচক আবেগ শব্দ: এ ধরনের আবেগ শব্দ ঘৃণা প্রকাশ করে। যেমনঃ ছিঃ ছিঃ, তুমি এত নীচ!
- যন্ত্রণাবাচক আবেগ শব্দ: এ ধরনের আবেগ শব্দ আতঙ্ক প্রকাশ করে। যেমন: আঃ, কী আপদ।
- সম্বোধনবাচক আবেগ শব্দ: এ ধরনের আবেগ শব্দ আহ্বান করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন: হে বন্ধু, তোমাকে অভিনন্দন। বিস্ময়বাচক আবেগ শব্দ: এ ধরনের আবেগ আশ্চর্য হওয়ার ভাব প্রকাশ করে। যেমন: আরে, তুমি আবার এলে!

অথবা

(খ) নিম্নরেখা যেকোনো পাঁচটি শব্দের ব্যাকরণিক শ্রেণি নির্দেশ করো।

(i) বিপদ কখনো একা আসে না।

উত্তরঃ বিপদ কখনও একা আসে না। = বিশেষ্য

(ii) বসার সময় নেই, তাই যেতে হচ্ছে।

(iii) তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

(iv) মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা।

(v) সাদা কাপড় পরলেই মন সাদা হয় না।

(vi) হুরিয়ে যাওয়া সম্পদ ফিরে পেয়েছি।

(vii) অত সাত-পাঁচ ভেবে লাভ কী?

(viii) রান্নার জন্য রাঁধুনি ব্যাকুল।

(২)

(ক) বাংলা বানানে 'ই'-কার ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো।

উত্তরঃ বাংলা বানানে ই-কার ব্যবহারের পাঁচটি নিয়ম নিচে দেওয়া হলো:

- যেসব তৎসম শব্দের বানানে ই, ঙ্গ-কার উভয়ই শুদ্ধ সেসব শব্দে কেবল ই-কার হবে। যেমন-কিংবদন্তি, শ্রেণি, তরুণি, পদবি ইত্যাদি।
- সকল অ-তৎসম (তদ্ভব, দেশি, বিদেশি) শব্দে কেবল ই-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন-বাড়ি, স্প্রিং, পাখি, শাড়ি ইত্যাদি।
- বিশেষণবাচক আলি প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। যেমন-বর্ণালি, গীতালি, সোনালি ইত্যাদি।
- পদাশ্রিত নির্দেশক টি-তে ই-কার বসবে। যেমন-ছেলেটি, বইটি, কলমটি, মেয়েটি ইত্যাদি।
- সকল জাতি ও ভাষার নামের শেষে কেবল ই-কার বসবে। যেমন- আরবি, ইংরেজি, জাপানি ইত্যাদি।

অথবা

(খ) যেকোনো পাঁচটি শব্দের বানান শুদ্ধ করে লেখো :

গ্রন্থসত্ত্ব

উত্তরঃ গ্রন্থসত্ত্ব = গ্রন্থসত্ত্ব

কুপমন্ডুক

উত্তরঃ গ্রন্থসত্ত্ব = গ্রন্থসত্ত্ব।

প্রত্নতাত্ত্বিক

উত্তরঃ প্রত্নতাত্ত্বিক = প্রত্নতাত্ত্বিক

ন্যাক্কারজনক

উত্তরঃ ন্যাক্কারজনক = ন্যাক্কারজনক।

স্বতঃস্ফূর্ত

উত্তরঃ স্বতঃস্ফূর্ত = স্বতঃস্ফূর্ত

স্বত্বাধিকারী

উত্তরঃ স্বত্বাধিকারী = স্বত্বাধিকারী

প্রজ্জ্বলন

উত্তরঃ প্রজ্জ্বলন = প্রজ্জ্বলন

(১২) নিচের যেকোনো একটি বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ লেখো :

(ক) মূল্যবোধের অবক্ষয় ও যুবসমাজ

উত্তরঃ **ভূমিকা**

একটি দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সম্ভাবনাময় সম্পদ হলো তার যুবসমাজ। যুবকরাই সমাজ পরিবর্তনের কারিগর এবং দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব। কিন্তু বর্তমান সময়ে আধুনিকতা ও বিশ্বায়নের যুগে যুবসমাজের মধ্যে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের এক চরম সংকট বা অবক্ষয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নৈতিক মূল্যবোধের এই পতন কেবল একজন তরুণকে বিপথগামী করছে না, বরং পুরো সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে এক অনিশ্চিত অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

মূল্যবোধ কী?

দেহ ও আত্মার সমন্বিত চাহিদার নিয়ন্ত্রিত স্ক্ররণ এবং মানুষের অভ্যন্তরীণ আচার-আচরণ পরিচালনাকারী অদৃশ্য শক্তিই হলো মূল্যবোধ। এটি মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিষয়, যা ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় এবং উচিত-অনুচিতের পার্থক্য নির্ধারণ করে। সত্যবাদিতা, সততা, পরোপকার, গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা, পরমতসহিষ্ণুতা এবং ন্যায়পরায়ণতা হলো মানবিক মূল্যবোধের মূল ভিত্তি।

মূল্যবোধের অবক্ষয় কী?

যখন কোনো সমাজের মানুষ প্রচলিত ইতিবাচক নীতি, আদর্শ, নৈতিকতা ও সামাজিক রীতিনীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে, তখন তাকে মূল্যবোধের অবক্ষয় বলে। যুবসমাজের ক্ষেত্রে এর অর্থ হলো—সততা বর্জন করা, অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়া, গুরুজনদের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন এবং সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে না চলা।

যুবসমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের প্রধান কারণসমূহ

যুবসমাজের এই নৈতিক অধঃপতন রাতারাতি বা একদিনে তৈরি হয়নি। এর পেছনে বহুমুখী সামাজিক, পারিবারিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণ রয়েছে:

- **পারিবারিক শিক্ষার অভাব:** পরিবার হলো নৈতিকতা শিক্ষার প্রথম পাঠশালা। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে মা-বাবারা সন্তানদের বস্তুগত সফলতার পেছনে যতটা ছুটছেন, নৈতিক চরিত্র গঠনে ততটা সময় দিচ্ছেন না।
- **অপসংস্কৃতির প্রভাব ও প্রযুক্তির অপব্যবহার:** তথ্যপ্রযুক্তির অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলে ইন্টারনেটে অশ্লীল ও সহিংস কনটেন্টের অবাধ বিস্তার ঘটছে। পশ্চিমা বা বিনোদনমুখী সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ তরুণদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।
- **মাদকের বিস্তার:** মাদকের বিষাক্ত ছোবল বর্তমান যুবসমাজ ধ্বংসের অন্যতম প্রধান কারণ। মাদকাসক্তি একজন তরুণকে চুরি, ছিনতাই, হত্যা ও ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধের দিকে ধাবিত করে।
- **ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা:** বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা অনেকাংশেই কেবল জিপিএ বা ভালো ফলের ওপর জোর দেয়। বিদ্যালয়গুলোতে চরিত্র গঠন ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার মতো শিক্ষার অভাব রয়েছে।
- **বেকারত্ব ও হতাশা:** উচ্চশিক্ষা শেষ করার পরও যখন একজন তরুণ উপযুক্ত কর্মসংস্থান পায় না, তখন তার মধ্যে তীব্র হতাশা জন্ম নেয়। এই হতাশা থেকে মুক্তি পেতে অনেকেই ভুল পথে পা বাড়ায়।
- **সঙ্গদোষ বা সমবয়সীদের চাপ:** অনেক সময় বন্ধু-বান্ধবদের দলছুট হওয়ার ভয়ে বা তাদের গ্রহণ যোগ্যতা পাওয়ার আশায় তরুণরা অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ে।

অবক্ষয়ের ভয়াবহ পরিণতি ও সামাজিক প্রভাব

মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে সমাজে নানামুখী নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে:

- **অপরাধের মাত্রা বৃদ্ধি:** সমাজে কিশোর গ্যাং কালচার, ইভটিজিং, ধর্ষণ, খুন এবং আত্মহত্যার মতো অপরাধ আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে।
- **পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন শিথিলতা:** মা-বাবা ও সন্তানের মধ্যকার পবিত্র সম্পর্কে ফাটল ধরছে এবং প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ হারিয়ে যাচ্ছে।
- **জাতীয় অগ্রযাত্রায় বাধা:** দেশের চালিকাশক্তি যুবসমাজ যদি নেশা আর অপরাধে ডুবে থাকে, তবে দেশের অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন ম্লান হয়ে যায়।

মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে প্রয়োজনীয় প্রতিকার

যুবসমাজকে এই অন্ধকারের হাত থেকে রক্ষা করতে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করা অপরিহার্য:

1. **পারিবারিক সচেতনতা বৃদ্ধি:** মা-বাবাকে সন্তানের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। ছোটবেলা থেকেই সন্তানকে ধর্মীয় অনুশাসন ও নৈতিকতা শিক্ষা দিতে হবে।
2. **মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষা:** শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কেবল প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ্যক্রম নয়, বরং চরিত্র গঠনমূলক ও নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন।
3. **সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা:** আকাশ সংস্কৃতির বিষাক্ত ছোবল থেকে যুবসমাজকে বাঁচাতে দেশীয় ঐতিহ্য, সুস্থ ধারার বিনোদন, সাহিত্য চর্চা এবং খেলাধুলার সুযোগ বাড়াতে হবে।
4. **মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান:** মাদক চোরাচালান ও বিক্রির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রকে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করতে হবে এবং আসক্তদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।
5. **কর্মসংস্থান সৃষ্টি:** বেকারত্ব দূরীকরণে তরুণদের জন্য কারিগরি ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে তারা হতাশামুক্ত জীবন গড়তে পারে।

উপসংহার

যুবসমাজ একটি দেশের বর্তমান শক্তি এবং ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। তাদের এই নৈতিক অবক্ষয় কোনো একক ব্যক্তির সমস্যা নয়, এটি পুরো জাতির অস্তিত্বের সংকট। তাই আজই রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারকে একযোগে এগিয়ে আসতে হবে। তরুণদের মাঝে বিবেক, দেশপ্রেম ও নৈতিকতার আলো জ্বেলে দিতে পারলে তবেই একটি সুন্দর, নিরাপদ ও সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

(খ) কৃষিকাজে বিজ্ঞান

উত্তরঃ **ভূমিকা:** বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের নতুন নতুন উদ্ভাবন মানুষের জীবনে নিয়ে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। বিজ্ঞানের প্রায়োগিক দিকের নাম প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তি মানুষের জীবনযাত্রাকে করে তুলেছে আরামদায়ক। কৃষিক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের জয়যাত্রা লক্ষণীয়। অসংখ্য কৃষি প্রযুক্তি কৃষিকাজকে করে তুলেছে সহজসাধ্য। অজস্র উচ্চফলনশীল জাতের ফসল আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে কৃষিপণ্যও হয়েছে সহজলভ্য।

কৃষির অতীত-কথা: কৃষি হলো মানব সভ্যতার আদিম পেশা। জীবন ধারণের তাগিদে আদিম মানুষ প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন ফলমূল গুহায় নিয়ে আসতো এবং বনজঙ্গলের পশু-পাখি শিকার করতো। প্রকৃতির উপরে পূর্ণ নির্ভরশীলতার কারণে প্রায়ই তাদের খাদ্য-সংকটে পড়তে হতো। বছরের কিছু সময়ে তাদের কোনো খাবার জুটত না। ফলে খাদ্যের সন্ধানে তাদের একস্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াতে হতো। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে আদিম মানুষ এক পর্যায়ে পশুপালন ও বীজ বপন করতে শেখে। এর ফলে খাদ্যদ্রব্য সুলভ হয় এবং জীবনযাত্রা হয়ে ওঠে অপেক্ষাকৃত সহজ ও নিশ্চিত। তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বৈপ্লবিক পরিবর্তনের আগে পর্যন্ত কৃষিকাজ ছিল অত্যন্ত শ্রমসাপেক্ষ এবং প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল।

কৃষি ও বিজ্ঞান: বিজ্ঞানের অবদানে ধীরে ধীরে কৃষি ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির আবির্ভাব ঘটছে। কৃষিকাজকে সহজ ও কম শ্রমসাধ্য করতে কৃষি-বিজ্ঞানীরা নিরন্তর গবেষণা করছেন। ফলে একদিকে যেমন চাষ পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসছে, ফসল নির্বাচন ও নতুন নতুন ফসল তৈরির কাজেও অগ্রগতি হচ্ছে। কৃষি-বিজ্ঞানের এসব গবেষণা পৃথিবীকে আজ শস্যে ও ফসলে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। পৃথিবীর মানুষের জন্য এখন যতটা ফসল দরকার, তার চেয়ে অনেক বেশি ফসল পৃথিবীতে ফলছে। জমিকে উর্বর করতে

আবিষ্কৃত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের সার। পুরানো প্রযুক্তির লাঙল-মই প্রভৃতির পরিবর্তে ব্যবহৃত হচ্ছে ট্রাক্টর। উদ্ভাবিত হয়েছে উন্নত জাতের বীজ ও উচ্চ ফলনশীল ফসলের জাত। এতে অল্প সময়ে ও অল্প পরিশ্রমে অধিক ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। ফসল ও বীজ উৎপাদন এবং তা সংরক্ষণেও বিজ্ঞান সহযোগিতা করছে। সেচ ব্যবস্থায় এসেছে পরিবর্তন। পশু-পাখি ও মাছের রোগজনিত মৃত্যুর হারও হ্রাস পেয়েছে কৃষি-চিকিৎসার অগ্রগতির কারণে। এভাবে কৃষি-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কৃষিকাজের জন্য আশীর্বাদ হয়ে উঠেছে।

উন্নত বিশ্বে কৃষি: উন্নত দেশগুলোর কৃষি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিজ্ঞাননির্ভর। জমিতে বীজ বপন থেকে শুরু করে ঘরে ফসল তোলা পর্যন্ত সমস্ত কাজেই রয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার। বিভিন্ন ধরনের আধুনিক যন্ত্রপাতি যেমন মোয়ার (শস্য ছেদনকারী যন্ত্র), রপার (ফসল কাটার যন্ত্র), বাইন্ডার (ফসল বাঁধার যন্ত্র), থ্রেসিং মেশিন (মাড়াই যন্ত্র), ফিড গ্রাইন্ডার (পেষক যন্ত্র), ম্যানিউর স্পেডার (সার বিস্তারণ যন্ত্র), মিস্কার (বৈদ্যুতিক দোহন যন্ত্র) ইত্যাদি উন্নত দেশগুলোর কৃষিক্ষেত্রে অত্যন্ত জনপ্রিয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের খামারে ট্রাক্টরের মাধ্যমে একদিনে ১০০ একর পর্যন্ত জমি চাষ করা সম্ভব হয়। একই ট্রাক্টর আবার একসঙ্গে ফসল কাটার যন্ত্র হিসেবেও কাজ করে। এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে চীন, জাপান, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশও কৃষি ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর করে গড়ে তুলেছে।

কৃষি ও বাংলাদেশ: কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৩৮ শতাংশ আসে কৃষি থেকে এবং রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় ১৪ শতাংশ আসে কৃষিজাত দ্রব্য রপ্তানি থেকে। এছাড়া কর্মসংস্থান ও শিল্পের ভিত্তি হিসেবেও বাংলাদেশে কৃষি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের মাটি ও জলবায়ু কৃষিকাজের জন্য খুবই অনুকূল। এদেশের মাটি অত্যন্ত উর্বর এবং রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাকৃতিক জল-ভাণ্ডার। আধুনিক প্রযুক্তি উন্নত দেশগুলোর মাটির অনুর্বরতাকে এবং পানির দুর্লভতাকে যেভাবে দূর করেছে, তাতে আধুনিক প্রযুক্তি বাংলাদেশের জন্য আরো বেশি সুবিধা নিয়ে আসবে, তা স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থা এখনো অনেকাংশে প্রকৃতির উপরে নির্ভরশীল। ফলে বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে এখানে প্রচুর ফসল নষ্ট হয়, আবার অনেক সময়ে প্রত্যাশার তুলনায় কম ফসল ফলে। কৃষকের কাছে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও কৃষি-বিজ্ঞানের জ্ঞান সঠিকভাবে পৌঁছে না দিতে পারাই এর প্রধান কারণ। কৃষিক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এসব বাধা দূর করা যায় এবং উন্নত দেশগুলোর মতো বাংলাদেশকেও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলা যায়।

বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা: কৃষির উন্নতির উপরেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতি অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই কৃষি-বিজ্ঞান ও কৃষি-প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। এটা অত্যন্ত আশার কথা যে, বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা ইতিমধ্যে বহু নতুন নতুন উচ্চ ফলনশীল ফসল উদ্ভাবন করেছে, বহু কৃষিবান্ধব প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছে এবং বহু ধরনের কৃষিপণ্যকে বাজারজাত করণের ব্যাপারে নতুন নতুন কৌশল বের করেছে। অর্থাৎ কৃষি গবেষণায় বাংলাদেশ কোনোক্রমে পিছিয়ে নেই। তবে এখন প্রয়োজন এসব উদ্ভাবনকে দেশের সর্বত্র সহজলভ্য করে তোলা এবং কৃষককে এসব উদ্ভাবনের সঙ্গে পরিচিত করে তোলা। শিক্ষিত জনবলকে কৃষিকাজের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে পারলে এবং কৃষিকাজের সঙ্গে তাদের যুক্ত করতে পারলে এই কাজ অনেকটা সহজ হয়। তাতে আধুনিক কৃষি-প্রযুক্তির ব্যবহার এবং এর যথাযথ প্রয়োগ সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে। বর্তমানে সরকারের কৃষি সম্প্রসারণ দপ্তর তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত কৃষকদেরকে নিয়মিতভাবে পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

উপসংহার: কৃষিকাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি দিন দিন মজবুত হচ্ছে। বাংলাদেশ সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের এই অগ্রগতিকে টেকসই করতে প্রয়োজন কৃষি সংক্রান্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারকে সহজলভ্য করা। এছাড়া বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে যাতে ফসলহানির আশঙ্কা তৈরি না হয় অথবা উৎপাদিত ফসলের বাজারজাতকরণে যাতে কোনো সমস্যা না হয়, সেক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অন্যান্য শাখাকেও কৃষির স্বার্থে এগিয়ে আসা দরকার। তবে সবার আগে

দরকার শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে কৃষিপেশায় আকৃষ্ট করা এবং শিক্ষিত জনশক্তিকে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত করা। কেননা শিক্ষিত জনশক্তি কৃষিকাজে এগিয়ে এলে কৃষি-বিজ্ঞান ও কৃষি-প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার সম্ভব হবে। এজন্য সরকারের উচিত কৃষিপেশার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের, বিশেষভাবে কৃষিকাজে সফল হওয়া ব্যক্তিদের রাষ্ট্রীয়ভাবে পুরস্কৃত করা ও সম্মানিত করা। এতে তাদের সামাজিক মর্যাদা বাড়বে এবং অধিক সংখ্যক শিক্ষিত লোক কৃষিপেশায় আকৃষ্ট হবে। কৃষিকাজের সঙ্গে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সম্পর্ক মজবুত করতে এমন পরিবেশই জরুরি।

(গ) সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বাংলাদেশ

উত্তরঃ

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বাংলাদেশ

ভূমিকা

সাম্প্রদায়িকতা হচ্ছে যা সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে ঝগড়া-বিভেদ সৃষ্টি করে সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করা। এতে সৃষ্টি হয় মানুষের মনে অমানবিক বিদ্বেষ ও ঘৃণা। তাই সাম্প্রদায়িকতা কোনো শুভবুদ্ধির উনোষ ঘটায় না। মানুষের মনকে করে সংকীর্ণ। বিশেষ করে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতার কারণে হত্যা, দাঙ্গা, লুণ্ঠন প্রভৃতি ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটে। সভ্যতার অগ্রগতিতে সাম্প্রদায়িকতা একটি কঠিন বাধার সৃষ্টি করে। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব - "আশরাফুল মাখলুকাত"। এ শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে হলে মানুষকে অবশ্যই মানবতাবাদী হয়ে হবে।

সাম্প্রদায়িকতা কী

'সম্প্রদায়' শব্দ থেকে সাম্প্রদায়িকতা শব্দটির সৃষ্টি। সম্প্রদায় শব্দের আভিধানিক অর্থ দল বা গোষ্ঠী, সুতরাং সাম্প্রদায়িকতা শব্দের যথার্থ অর্থ হলো দলীয় বা গোষ্ঠীগত মত বা মনোভাব। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা শব্দটি ইদানীং উগ্র ধর্মবিশ্বাসীদের অনিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপের অর্থ বহন করে। ধর্মের মহৎ উদ্দেশ্য বিচ্যুত হয়ে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থে কেউ যখন ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয় তখনই সাম্প্রদায়িকতার বিষবাস্পে পথ হারায় সুস্থ ও সুন্দর জীবনবোধ। একদল মানুষ যখন নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বকে জোর করে অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে বা প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তখন সাম্প্রদায়িকতার অবশ্যম্ভাবী আবির্ভাব ঘটে। অনুদার জাত্যভিমান, সংকীর্ণ গোষ্ঠীচেতনা জন্ম দেয় ধৈর্যহীনতা ও অসহিষ্ণুতার। ফলে ধ্বংসের নেশায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে মানুষ। তখন তাদের স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি লুপ্ত হয়ে যায়, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে।

সাম্প্রদায়িকতা কেন

মানুষে-মানুষে কোনো ভেদাভেদ নাই। বর্তমানে সাম্প্রদায়িকতার কারণে এ নীতিবাক্য ধূলিসাৎ হয়ে পড়েছে। নানা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সমাজের নেতৃস্থানীয় কিছু লোক সর্বসাধারণের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাস্প ছড়িয়ে দেয়। এর মধ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই প্রধান। ধর্মের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে নাড়া দিতে পারলেই তাদের সুপ্ত উদ্দেশ্য হাসিল হয়। 'এক ধর্মের লোক অন্য ধর্মের লোককে শাসন করবে এটা কখনও মেনে নেয়া যায় না' এটাই হয় সুবিধা ভোগীদের উসকানিমূলক বক্তব্য। ফলে শুরু হয়ে যায় দাঙ্গা, খুনাখুনি আর হানাহানি। আর এই ঘোলা জলে সুবিধাভোগী রাজনীতিবিদগণ মৎস্য শিকারে তৎপর হয়ে ওঠেন। নিজেদের আসন পাকাপোক্ত করার ব্যবস্থা করেন। বিশ্বের বহু দেশে আজ এ অবস্থা দেখা যায়।

উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িকতা

এ উপমহাদেশে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা বিশ্বের ইতিহাসে এক কলঙ্কিত অধ্যায় হয়ে আছে। বিহারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল ১৯৪৬ সালের ২৪ অক্টোবর থেকে ১১ নভেম্বর পর্যন্ত, যেখানে হিন্দু জনতা মুসলিম পরিবারগুলিকে টার্গেট করেছিল। যা ১৯৪৬ বিহার দাঙ্গা নামে পরিচিত। মোগল আমলে ১৭৩০ সালে দোল খেলাকে কেন্দ্র করে হিন্দু- মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা লেগেছিল এবং লক্ষ লক্ষ লোকের রক্তক্ষয় হয়েছিল। ১৯২০ থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে বাংলাদেশের নানা জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটে। ১৯২২ থেকে ১৯২৭-এর মধ্যে ১৯২টি দাঙ্গার কথা জানা যায়

এবং এতে অসংখ্য লোকের প্রাণহানি ঘটে। ১৯৩০ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত প্রতি বছরই ভারতে দাঙ্গা সংঘটিত হয়। ১৯৪৬, ১৯৯০ সালেও ছোটখাটো দাঙ্গা লেগেছিল। ভারতের বাবরী মসজিদকে কেন্দ্র করে যে দাঙ্গা হয় তা অবর্ণনীয়। হাজার হাজার লোক সে দাঙ্গায় জীবন দিয়েছে। এর পেছনে ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের অদৃশ্য হাত ছিল। এসব দাঙ্গার রেশ আজও কাটেনি।

সাম্প্রদায়িকতার কালো ছোবল

সাম্প্রদায়িকতা মানবকল্যাণে কখনো সুফল বয়ে আনেনি। বরং মানুষে- মানুষে বিভেদ সৃষ্টির বিষবাস্প সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দিচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রভৃতি পড়ছে মুখ খুবড়ে। মানুষ শান্তি বিসর্জন দিয়ে যেন অশান্তির বাঁশি বাজিয়ে চলেছে। সাম্প্রদায়িকতার যুপকাঠে অগণিত শিশু-কিশোর-যুবা-বৃদ্ধ বলি হচ্ছে। পৃথিবীকে স্বর্গ করার প্রতিশ্রুতি গ্রহণের পরিবর্তে মানুষ যেন শাস্ত্রশান করার রত গ্রহণ করেছে। মানুষ তার মানবিক বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে

সাম্প্রদায়িকতার কুফল

জীবন হল গতিশীল। প্রগতিই হল সমাজ উন্নয়নের চাবিকাঠি। এ যাত্রাপথে পাড়ি দিতে হলে মানুষকে ভ্রাতৃত্ববোধে আবদ্ধ হতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে সমাজ প্রগতির পথকে রুদ্ধ করে দেয়। অথচ কোন ধর্ম, কোন আদর্শই পৃথিবীতে এ সর্বনাশা ভেদবুদ্ধিকে সমর্থন করে নি। এখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির গুরুত্বের ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজও দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে সীমাহীন ভেদবুদ্ধি। আজও বিভেদ ও হিংসার অগ্নিদহন। সাম্প্রদায়িকতার জন্যেই একদিন হিটলারের গ্যাসচেম্বারে লক্ষ লক্ষ ইহুদি প্রাণ দিল। সেই ইহুদি অজ্ঞাঘাতেই আজ আবার কত প্যালেস্টাইনবাসী রক্তাপ্লুত। এখনও শ্বেতাঙ্গের কৃষ্ণাঙ্গ নির্যাতনের কলঙ্কিত ইতিহাস। এই সেদিনও ইংল্যান্ডের মাটিতে ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে সাম্প্রদায়িক আগুন জ্বলে উঠেছিল। ভারতেও মাঝে মাঝে তারই নগ্ন বিভীষিকার চেহারা। ১৯৯২ সালে ভারতের কটুর হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি অযোদ্ধার ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ভেঙে দিলে বাংলাদেশেও এর তীব্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়।

প্রতিকারের উপায়

কিছু স্বার্থপর-কুৎসিত স্বভাবের মানুষ সাম্প্রদায়িকতা উসকে দিয়ে উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায়। এদেরকে চিহ্নিত করে জনগণের সামনে এদের মুখোশ খুলে দিতে হবে। ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে জাতিকে উদ্ধারের জন্য মৌলবাদী রাজনৈতিক দলসমূহ নিষিদ্ধ করতে হবে। দেশের মধ্যে জনসংখ্যানুপাতে সরকার গঠনে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকেরই প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। এতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে এবং দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে। দেশের মানুষ সুখে ও শান্তিতে বসবাস করতে পারবে।

বিভেদ নয়, এক্যই মুক্তির পথ

আমরা আজ উন্নয়নমুখী। আমাদের জাতীয় জীবনে গঠনমূলক কাজের উৎকৃষ্ট উদাহরণ সৃষ্টি করতে হবে। চাষি, জেলে, কামার, কুমার, মুচি, ডোম, সকলকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেই জাতির উন্নয়নের জন্য গঠনমূলক পদক্ষেপ নিতে হবে। এক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা আমাদের জন্যে অপরিহার্য।

বিশ্বব্যাপী সাম্প্রদায়িকতার প্রসার

বর্তমানে বিশ্বের দিকে তাকালে সাম্প্রদায়িকতার স্বরূপ চোখে পড়ে। ভারত, পাকিস্তান, প্যালেস্টাইন, সার্বিয়া, বসনিয়া, হার্জেগোভেনিয়া, মিয়ানমার প্রভৃতি দেশে শুধু ভিন্ন ধর্মের নয়, গোত্রে গোত্রেও সংঘটিত হচ্ছে দাঙ্গা। তবে বিশ্বের বর্তমান দৃশ্যে শুধু মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঙ্গার দৃশ্যগুলোই চোখে পড়ার মতো। ইসরাইলের ইহুদি সম্প্রদায় বছরের পর বছর ধরে প্যালেস্টাইনি মুসলমানদের নির্মূল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। মিয়ানমারে নির্যাতিত হচ্ছে রোহিঙ্গা মুসলমানরা। ভারতের দৃশ্যও তাই। পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যে শিয়া-সুন্নির দাঙ্গা। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থামার পরিবর্তে আরো যেন প্রসারিত হচ্ছে। ফলে মানুষের মনে অস্থিতিশীলতা এবং অস্থিরতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপিত না হলে সে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা চরমভাবে বিরাজ করে। ফলে দীর্ঘস্থায়ী বিনিয়োগের মাধ্যমে কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। দেশের আইনশৃঙ্খলার উন্নতি ঘটানোও সম্ভব হয় না। উপরন্তু দেশপ্রেমের মনোভাব জনসাধারণের মধ্যে জাগ্রত হয় না। বহিঃশত্রুর আক্রমণের ভয় থাকে। দেশের মানুষের মনে গড়ে ওঠে বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসামূলক মনোভাব যার সবগুলোই স্বাধীনতা ও উন্নয়নের পরিপন্থী। দেশকে কল্যাণমুখী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে হলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নে এর ভূমিকা অপরিসীম।

জাতীয় জীবনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তা

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যেমন অপরিহার্য তেমনি আমাদের জাতীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্যেও এটি একান্ত প্রয়োজনীয়। আমরা যতই উন্নয়ন পরিকল্পনা আর অর্থনৈতিক উন্নতির ঘোষণা দেই না কেন, জাতীয় অর্থনৈতিক এবং সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অপরিহার্য। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি হল আমাদের মত উন্নয়নকামী দেশের উন্নতির চাবিকাঠি। বিশ্বজনীন সামাজিক সম্প্রীতি তথা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করেই পৃথিবীতে শান্তি ও প্রগতি স্থাপন সম্ভব। এই সম্প্রীতিই কেবলমাত্র মানব-জীবনের শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের প্যারান্টি দিতে পারে। তাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সকলের কাম্য হওয়া উচিত।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বাংলাদেশ

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অন্যতম পীঠভূমি হল বাংলাদেশ। এটি আমাদের গৌরব। পার্শ্ববর্তী বৃহৎ রাষ্ট্র ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হয়েও মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়ছে। চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এর বিষময় প্রতিফলন ঘটেনি আমাদের দেশে। এদেশের মানুষের সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা এখানে লক্ষণীয়। এ সচেতন মনোবৃত্তি আছে বলেই এ দেশের বুকে পার্শ্ববর্তী দেশের চরম সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ড এবং ঘটনাবলির কোনো অশুভ প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয় নি। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনগোষ্ঠীর সাথে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সকলেই মিলেমিশে বসবাস করে আসছে।

শুধু আজ নয়, সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এ উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের নজিরটি এ দেশ বহন করেছে। খেতে- খামারে, কলে-কারখানায়, অফিস-আদালত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নানা সম্প্রদায় কাজ করেছে। একে অন্যের দুঃখে-আনন্দে শরিক হয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে গভীর সংহতি ও ঐক্য জাতীয় ইতিহাসে গৌরবময় ঐতিহ্য ও ইতিহাস হয়ে আছে। আমাদের গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধ তারই স্বাক্ষর। ১৯৭১ সালে এদেশের হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

১৯৭২ সালের সংবিধানে বাংলাদেশ ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসেবে ঘোষিত হয়। আমরা তাই গৌরবান্বিত। জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এ সম্প্রীতি সংরক্ষণের পরিস্থিতিটি খুবই উপযোগী। এ ক্ষেত্রে আমাদের দেশ একটি উদাহরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। এ দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মহান মন্ত্রে দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল। জাতীয়তাবোধের দৃঢ়বন্ধনে তারা আবদ্ধ।

বিশ্ব-শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

মানুষ আজ আর বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করতে পারে না। তার মঙ্গল নিহিত রয়েছে বিশ্বজনীন শান্তি ও সম্প্রীতির মধ্যে। বর্ণভেদ, ধর্মভেদ, সাদা-কালোর দম্ব আজকের পৃথিবীতে স্থান পেতে পারে না। শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের পাশাপাশি আজ কৃষ্ণাঙ্গ নিগ্রো জাতি তার আপন অবস্থানের স্বীকৃতি আদায় করে নিচ্ছে, আমরা আজ এ সত্যের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য।

অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ, ছাত্রসমাজের ভূমিকা ও শিক্ষা সংস্কার

সাম্প্রদায়িকতা এক দুরারোগ্য ব্যাধি। এই ব্যাধির জীবাণু জাতির জীবনের গভীরে প্রোথিত। শুধুমাত্র আইন-শৃঙ্খলার কঠোরতার মধ্যেই এর সমাধান সূত্র নেই। তরুণ শিক্ষার্থীরাই হল দেশের সবচেয়ে

আদর্শপ্রবণ, ভাবপ্রবণ অংশ। ছাত্র-সমাজই দেশের ভবিষ্যৎ, জাতির কাণ্ডারী। তাদের মধ্যে আছে অফুরান প্রাণশক্তি। পারস্পরিক শ্রদ্ধার মনোভাব, আন্তরিক মেলামেশা, ভাবের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে অভ্যুদয় হবে এক নতুন প্রজন্মের। এরই মধ্য দিয়ে ছাত্ররা নতুন করে অনুভব করবে মানবতার উদার মহিমা। শুনবে সেই মহামিলনের মন্ত্র। ছাত্রাবস্থায়ই সাম্প্রদায়িকতার রাহু মুক্তির শপথ নিতে হবে। সম্প্রীতির মহাব্রত অনুষ্ঠানের তারাই হবে প্রধান পুরোহিত। শুধু পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া নয়, সুকুমার বৃত্তিগুলো যথাযথ বিকশিত হলেই তাদের শিক্ষার পূর্ণতা, সার্থকতা। মনুষ্যত্বের অধিকার অর্জনই হবে তাদের শিক্ষানুশীলনের পরম প্রাপ্তি। শিক্ষার নিবেদিত প্রাঙ্গণে তারা নতুন করে উপলব্ধি করবে সবার উপরে মানুষই সত্য। মানুষে মানুষে প্রীতি-বন্ধনই হবে তার শেষ কথা।

উপসংহার

সাম্প্রদায়িকতা বিশ্ববিবেকের কাছে নিঃসন্দেহে ঘণ্য বিষয়। মানবকল্যাণ পরিপন্থী এবং সভ্যতাবিধ্বংসী সাম্প্রদায়িকতা বেশি দিন স্থায়ী হতে পারে না। আমরা যদি একটু সচেতন হই তাহলে এ হানাহানি সমাজ থেকে নির্মূল করা অবশ্যই সম্ভব হতে পারে। এ বিষয়বস্তু অপসারিত হলেই মানবসমাজে সম্প্রীতির শান্তির হাওয়া বইবে এবং 'মানুষ মানুষের জন্য' কথাটি সার্থকতা পাবে। আমাদের জীবন হয়ে উঠবে আরো সুন্দর, আরো সুখময়। বিশ্বের বুকে একটি সত্য ও আদর্শ জাতি হিসেবে স্বীকৃতি পাব আমরা।

(ঘ) একুশ আমার অহংকার

উত্তরঃ

একুশ আমার অহংকার

ভূমিকা:

'একুশ' কেবল একটি সংখ্যা বা ক্যালেন্ডারের পাতার কোনো নির্দিষ্ট দিন নয়; এটি বাঙালি জাতির চেতনা, আত্মমর্যাদা এবং জাতীয়তাবোধের এক অবিদ্বন্দ্ব প্রতীক। পৃথিবীর ইতিহাসে একমাত্র জাতি হিসেবে বাঙালি ভাষার জন্য বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছিল। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার প্রমুখ বীর সন্তানের আত্মত্যাগের মাধ্যমে যে ইতিহাস রচিত হয়েছিল, তা আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। তাই একুশ আমার অহংকার।

ভাষা আন্দোলনের পটভূমি:

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের ওপর জোরপূর্বক উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করে। "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা"— মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর এই ঘোষণার প্রতিবাদে বাংলার দামাল ছেলেরা ফুঁসে ওঠে। শুরু হয় মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

একুশের রক্তাক্ত ইতিহাস:

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি (৮ ফাল্গুন ১৩৫৮) বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ থেকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের হয়। মিছিলে পুলিশ নির্বিচার গুলিবর্ষণ করে। রাজপথে লুটিয়ে পড়েন রফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ নাম না-জানা অনেকে। তাদের রক্তে রঞ্জিত হয় ঢাকার রাজপথ, রচিত হয় ভাষার জন্য আত্মত্যাগের অনন্য ইতিহাস।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি:

বাঙালির ভাষার এই আত্মত্যাগ শুধু নিজ ভূখণ্ডেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। দীর্ঘ আন্দোলনের পর ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। ২০১০ সাল থেকে জাতিসংঘ কর্তৃক এই দিনটি বিশ্বজুড়ে অত্যন্ত মর্যাদার সাথে পালিত হচ্ছে। এটি আমাদের জন্য এক পরম গৌরবের বিষয়।

স্বাধীনতা সংগ্রামে একুশের প্রভাব:

একুশের চেতনা কেবল ভাষার অধিকারে সীমাবদ্ধ ছিল না। এই চেতনা বাঙালিকে স্বাধিকার আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। একুশের পথ ধরেই ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি অর্জন করে তার

চূড়ান্ত স্বাধীনতা । ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগ আমাদের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখিয়েছে ।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একুশ:

একুশ আমাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা নত না করার প্রেরণা । কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আজ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মাঝে বাংলা ও ইংরেজির মিশ্রণে ভাষা বিকৃতির এক প্রবণতা দেখা যায় । শহীদদের আত্মত্যাগের প্রতি সম্মান জানিয়ে আমাদের উচিত প্রমিত বাংলার চর্চা করা এবং সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করা ।

উপসংহার:

একুশ মানেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এবং মাথা নত না করা । একুশের অম্লান চেতনা আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে শক্তি জোগায় । যতদিন বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতি টিকে থাকবে, ততদিন ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগ ও একুশের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে অহংকার হয়ে জ্বলজ্বল করবে ।

(ঙ) জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন

উত্তর: **ভূমিকা :** জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান বিশ্বের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপনীত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় কারণ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি- যার ফলে আবহাওয়া পরিবর্তিত হয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়েছে এবং বিশ্ব নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ার কারণ বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং এই তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার প্রধান কারণ গ্রিন হাউজ ইফেক্ট। সূর্য থেকে আগত তাপশক্তি পৃথিবীপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে এবং এ বিকিরিত তাপশক্তির অধিকাংশই পুনরায় বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। কিন্তু মানবসৃষ্ট দূষণ এবং বনভূমি উজাড় করার ফলে বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে, যা কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইডের সমন্বয়ে গঠিত। এর ফলে বিকিরিত তাপশক্তি পুনরায় বায়ুমণ্ডলে ফিরে যাওয়ার পথে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং এভাবেই বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। আধুনিককালে ব্যাপক হারে জীবাশ্ম জ্বালানি দহন, বনাঞ্চল ধ্বংস, শিল্পায়নের ফলে গ্রিন হাউজ ইফেক্টের মাত্রা অনেক বেশি বেড়ে গেছে। এর ফলে ১৮৫০-১৯৬০ সালের মধ্যে পৃথিবীর তাপমাত্রা প্রায় পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অতিরিক্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে বর্তমান বিশ্ব প্রতিনিয়ত বিভিন্ন পরিবেশগত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে। পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণ : পৃথিবী বেষ্টনকারী আবহাওয়ামণ্ডলের কারণে পৃথিবী প্রাণ ধারণ ও বসবাস উপযোগী হয়েছে। মহাশূন্যের আবহাওয়ামণ্ডলে ‘ওজোন স্তর’ নামে অদৃশ্য এক বেষ্টনী বিদ্যমান, যা পৃথিবীতে সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুণি রশ্মি প্রবেশ রোধ করে এবং বিকিরণ প্রক্রিয়ায় পৃথিবী থেকে আসা তাপ মহাশূন্যে পুনরায় ফিরে যেতে সহায়তা করে। কিন্তু মানব সৃষ্ট দূষণ ও বনাঞ্চল ধ্বংসের ফলে প্রকৃতি প্রদত্ত নিরাপত্তা বেষ্টনী, ওজোন স্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। গৃহস্থালি পণ্য যেমন- ফ্রিজ, এয়ারকন্ডিশনার, বিভিন্ন ধরনের স্প্রে ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয় ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (সিএফসি) গ্যাস, যা শিল্পকারখানাতেও ব্যবহৃত হয়। এই অবমুক্ত সিএফসি মহাশূন্যের ওজোন স্তর ক্ষয়ের অন্যতম কারণ। এছাড়া গৃহস্থালি ও শিল্পবর্জ্য, কলকারখানা ও যানবাহনের ধোঁয়া প্রভৃতি থেকে ক্রমবর্ধমান হারে নির্গত হচ্ছে কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড ও মিথেন গ্যাস। একদিকে পরিবেশ দূষণ ও অপর দিকে বনভূমি উজাড় করার ফলে অতিরিক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষিত হচ্ছে না। এর ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি দেখা দিচ্ছে, যা সূর্য থেকে আগত তাপ বায়ুমণ্ডলে ধরে রাখে। এভাবে একদিকে ওজোন স্তরের ক্ষয়জনিত কারণে মাত্রাতিরিক্ত সূর্যের অতিবেগুণি রশ্মি পৃথিবীতে পৌঁছাচ্ছে, অন্যদিকে বায়ুমণ্ডলে প্রতিনিয়ত তাপ সঞ্চিত হচ্ছে। এভাবে পৃথিবী হয়ে উঠেছে উত্তপ্ত। সামগ্রিকভাবে পরিবেশ বিপন্ন হওয়ার ফলে পৃথিবী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও বাংলাদেশে এর প্রভাব : পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে যেসব বড় ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে তা মূলত জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেই দেখা দিচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিই মূলত এ পরিবর্তিত জলবায়ুর জন্য দায়ী। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে বাংলাদেশের সম্ভাব্য ভয়াবহ পরিণতিসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি : বিশ্ব উষ্ণায়নের একটি সম্ভাব্য পরিণতি হলো সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি। বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ফেলে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে সমুদ্রের পানির উত্তাপ বৃদ্ধি পাবে এবং পানি সম্প্রসারিত হলে সমুদ্রের আয়তন ও পরিধিকে বাড়িয়ে তুলবে। উষ্ণায়নের ফলে হিমালয়সহ অন্যান্য পর্বতচূড়ায় জমে থাকা বরফ গলে যাবে এবং সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যাবে। এর ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্লাবিত এলাকার পরিমাণও বেড়ে যাবে। উত্তর ও দক্ষিণমেরুর গ্রীনল্যান্ড, অ্যান্টার্কটিকাসহ অন্যান্য ভূ-ভাগের বরফ গলে যাবে, যা সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা আশঙ্কাজনকভাবে বাড়িয়ে তুলবে। এভাবে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ব-দ্বীপ, যেখান অসংখ্য নদ-নদী বয়ে চলেছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের ১৯ শতাংশ ভূমি সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। এর ফলে ৫৫ মিলিয়ন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বাংলাদেশে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতিবছর ৭ মিমি হারে বাড়ছে, যেখানে ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার ৫-৬ মিমি/বছর। এর ফলে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার ১-২ মিমি/বছর। *Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC)*-এর এক সমীক্ষায় বলা হয় বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতি দশকে ৩.৫ থেকে ১৫ মিমি বৃদ্ধি পেতে পারে। এমনকি ২১০০ সাল নাগাদ তা ৩০ সেমি থেকে ১০০ সেমি এ পৌঁছাতে পারে। তাই সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি বাংলাদেশের জন্য ভয়াবহ বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।

২. মরুভূমির বৈশিষ্ট্য : বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে একদিকে যেমন পৃথিবীর নিচু এলাকাসমূহ সমুদ্র গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে তেমনি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মরুভূমির বৈশিষ্ট্য দেখা দেবে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে ভূ-পৃষ্ঠে পানির পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পাবে। ফলে সমগ্র ভূমি মরুভূমিতে পরিণত হবে। এর ফলে কৃষিকাজ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং জীববৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন হবে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ইতোমধ্যে মরুভূমির বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে। এর ফলে খাদ্য উৎপাদন ব্যাহতসহ তা দেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

৩. নিম্নভূমিতে প্লাবন : বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য নিম্নভূমি সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে অ্যান্টার্কটিকার বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাবে এবং উপকূলীয় এলাকাসমূহ ক্রমেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার বর্গ কিমি এলাকা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হবে। পরিবেশবিজ্ঞানীদের মতে, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত থাকলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা এই শতাব্দীর শেষ দিকে ২০-৬০ সেমি পর্যন্ত বাড়তে পারে। জলবায়ু পরিবর্তিত হলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেড়ে যাবে এবং নদ-নদীর পানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। আমাদের দেশের অধিকাংশ নদীর উৎস দেশের বাইরে ভারত ও নেপালে। তাই একদিকে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও অপরদিকে ব্যাক ওয়াটার ইফেক্ট যুক্ত হয়ে ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি করবে।

৪. জীববৈচিত্র্য ধ্বংস : বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে জীববৈচিত্র্য মারাত্মক হুমকির মুখে পড়েছে। বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার প্রভাবে বনাঞ্চলসমূহ ধ্বংস হওয়ার আশংকা দেখা দিচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও জলজ প্রাণী বিলুপ্তির পথে। পরিবেশ ও ভূ-বিজ্ঞানীদের মতে, সমুদ্রের উচ্চতা মাত্র ১ মিটার বৃদ্ধি পেলে সুন্দরবনের ৭০ ভাগ তলিয়ে যাবে। জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়ে গেলে তা বিশ্বের জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ ফলাফল বয়ে আনবে। পরিবেশ তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে।

৫. নদ-নদীর প্রবাহ-হ্রাস এবং পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি : বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। জমিতে সেচ ও নৌ-চলাচলের জন্য নদ-নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নদ-নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বিঘ্নিত হয়। এর ফলে প্রধান প্রধান নদীর প্রবাহ হ্রাস পাবে এবং নদীর ক্ষীণ প্রবাহের কারণে সামুদ্রিক লোনা পানি সহজে দেশের অভ্যন্তরীণ নদীপ্রবাহে প্রবেশ করে নদ-নদীর পানিতে লবণাক্ততা বাড়িয়ে দেবে। ফলে সামুদ্রিক লোনা পানি উজান অঞ্চলে প্রবেশ করায় কৃষিতে প্রয়োজনীয় মৃদু পানির অভাব দেখা দেবে এবং দেশের সম্পদের বিপুল পরিমাণ ক্ষতি সাধিত হবে। বর্তমানে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ও দূরবর্তী দ্বীপসমূহের প্রায় ১.৪ মিলিয়ন হেক্টর এলাকায় লোনা পানি প্রবেশ করায় উন্মুক্ত জলাশয় ও ভূগর্ভস্থ পানি লবণাক্ত হয়ে পড়েছে। জলবায়ু পরিবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে এই লবণাক্ততার মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাবে।

৬. আকস্মিক বন্যা : পাহাড়ি ঢলের কারণে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিশেষত মেঘনা অববাহিকায় প্রতিবছর আকস্মিক বন্যা দেখা যায়। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রায় ৪ হাজার বর্গ কিলোমিটার এবং দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের প্রায় ১ হাজার ৪০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা এ ধরনের আকস্মিক বন্যার শিকার। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ি ঢলের পরিমাণ আরো বেড়ে যাচ্ছে। ফলে আকস্মিক বন্যার পৌনঃপুনিকতা, ক্ষতির পরিমাণ ও তীব্রতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে দেশের উত্তরাঞ্চলে বিশেষত সিরাজগঞ্জ ও এর আশপাশের এলাকাসমূহে বন্যা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে।

৭. নদী ভাঙন : বাংলাদেশে মোট সমুদ্র তটরেখার পরিমাণ ৭১১ কিলোমিটার এর মধ্যে সুন্দরবন উপকূল ঘিরে রয়েছে ১২৫ কিলোমিটার এবং কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত ১২০ কিলোমিটার দীর্ঘ (সূত্র-বাংলাপিডিয়া)। এছাড়া সমুদ্র উপকূল বরাবর রয়েছে গঙ্গা ও মেঘনা অববাহিকায় অবস্থিত অসংখ্য প্রশস্ত জোয়ার ভাটা সমভূমি এবং নদী মোহনায় রয়েছে বদ্বীপ। নদীসঙ্গমে অবস্থিত এসব বদ্বীপ ও সমুদ্র তটরেখা বরাবর ভূখণ্ড প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। কিন্তু এ পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্যের মাঝে এক বিশেষ ভারসাম্য বজায় থাকে। কিন্তু বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে এ ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে। বর্তমানে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে নদী ভাঙনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে মেঘনা ও পদ্মার তীরবর্তী এলাকাসমূহে নদী-ভাঙনের ফলে বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণ জনগোষ্ঠী সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে।

৮. খরা : মাটিতে আর্দ্রতার অভাব অর্থাৎ বৃষ্টিপাতের তুলনায় বাষ্পীভবনের মাত্রা বেশি হলে খরা দেখা দেয়। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে জলবায়ু পরিবর্তিত হচ্ছে যার প্রভাব বাংলাদেশেও দেখা দিচ্ছে। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বর্ষাকালে প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাত ও পানির অভাবে কৃষিকাজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে এবং ফসল উৎপাদনও ক্রমাগতভাবে হ্রাস পাচ্ছে। শীতকালেও এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের তুলনায় বাষ্পীভবনের হার বেশি। এর ফলে মাটির আর্দ্রতা হ্রাস পায় এবং কৃষিকাজের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে সাথে খরার প্রকোপ আরো বৃদ্ধি পাবে এবং বর্তমানের মাঝারি ধরনের খরা উপদ্রুপ এলাকা মারাত্মক খরা উপদ্রুপ এলাকায় পরিণত হবে।

৯. সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাস : সাধারণত সামুদ্রিক ঝড় সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত বায়ু ও ঘূর্ণিবায়ু থেকে। ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির পেছনে অন্যান্য প্রক্রিয়া সক্রিয় থাকলেও পানির উত্তাপ বৃদ্ধিই মূল কারণ। বাংলাদেশে প্রতিবছর মে-জুন মাসে যে সামুদ্রিক ঝড় হয় তাতে উপকূলীয় জেলাসমূহে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে সমুদ্রের পানির তাপমাত্রাও ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে যাবে। স্বাভাবিকভাবেই সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতাও বেড়ে যাবে। সাম্প্রতিক সময়ে 'সিডর' বাংলাদেশে যে ধ্বংসযজ্ঞের চিহ্ন রেখে গেছে তা বর্ণনাতীত। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে এটা বাংলাদেশের জন্য বড় ধরনের আঘাত। সিডর, সুনামি, সাইক্লোনসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ মূলত জলবায়ুর দ্রুত পরিবর্তনেরই ফলাফল। আর পরিবেশ দূষণের ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিই জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী। মানব সৃষ্ট দূষণের ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের যে ধারা সৃষ্টি হয়েছে, বাংলাদেশের জন্য তা সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ। দূষণের জন্য বিশ্বের শিল্পায়িত দেশগুলোর দায়ভার সবচেয়ে বেশি। কিন্তু এখন পর্যন্ত অনেক ধনী রাষ্ট্রই 'কিয়োটো প্রটোকল, ১৯৯৭' কার্যকর করেনি।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও বাংলাদেশে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি : বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাবে সম্ভাব্য ক্ষয়-ক্ষতি ইতোমধ্যে বিশ্বজুড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। বাংলাদেশ ও তার প্রতিবেশী দেশসমূহে ক্ষয়-ক্ষতির মাত্রা অত্যন্ত ব্যাপক হবে বলে পরিবেশ ও ভূ-বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বাংলাদেশের উচ্চতা কম থাকার কারণে বাংলাদেশে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরও ভয়াবহ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছে যা জলবায়ু পরিবর্তনেরই ফলাফল। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশে যে সকল ক্ষতি হতে পারে তা নিম্নরূপ:

ক. বিপন্ন জনগোষ্ঠী : বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থার প্রেক্ষিতে কোনো মাঝারি ধরনের প্লাবনে দেশের ৬৫ শতাংশ জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়বে এবং প্লাবন এলাকার পরিধি ক্রমেই বাড়তে থাকবে। ফলে বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা বিপন্ন হয়ে পড়বে।

খ. অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতি : ১৯৯০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট বাস্তবগত সম্পদের পরিমাণ ১৮০০০ বিলিয়ন টাকা। এর মধ্যে ভৌত অবকাঠামো রয়েছে ২৮০ বিলিয়ন টাকা মূল্যের। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে প্লাবনের তীব্রতা বাড়বে এবং অবকাঠামোগত ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হবে। IPCC-এর সমীক্ষা অনুযায়ী ২০১০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে প্লাবনজনিত কারণে বাস্তবগত সম্পদের ক্ষতির পরিমাণ হবে ২৪২ বিলিয়ন টাকা।

গ. বিপন্ন কৃষি : বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের কৃষি খাত মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হবে। কৃষিখাতের ওপর এ বিপর্যয় দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ওপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। IPCC-এর সমীক্ষা অনুযায়ী প্লাবনের কারণে দেশে আমন ধানের উৎপাদন ১৩.৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন হ্রাস পাবে। এমনকি জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দেশের কৃষি উৎপাদন বর্তমানের তুলনায় প্রায় ৭০ শতাংশ কমে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। শীত মৌসুমে বাংলাদেশে প্রায় ৩৬০০ বর্গ কিমি এলাকা খরার কবলে পড়ে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে সাথে খরার ব্যাপ্তি আরো বেড়ে তা ২২০০ কিমি পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে। গত কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বর্ষা মৌসুমের ফসলের ওপর খরার প্রতিকূল প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন হলে দেশের মধ্য-দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গমের আবাদ অসম্ভব হয়ে পড়বে এবং আলুর চাষও ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়বে। এছাড়া প্রয়োজনীয় সেচের অভাবে দেশের উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলে চাষাবাদ ব্যাপকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

ঘ. লোনা পানির অনুপ্রবেশ : দেশের মোট জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করে। IPCC-এর সমীক্ষা অনুযায়ী সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১০০ সেমি বৃদ্ধি পেলে ২৫,০০০ বর্গ কিমি এলাকায় লোনা পানির অনুপ্রবেশ ঘটবে। ফলে দেশের প্রায় ৩ কোটি ৫০ লাখ লোকের জীবন ও জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এছাড়া লোনা পানি প্রবেশের ফলে দেশের চিংড়ি শিল্প ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। দেশের নদ-নদীতে লোনা পানির অনুপ্রবেশ ঘটলে স্বাদু পানির মৎস্য সম্পদ ধ্বংস হবে এবং জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবন বিপন্ন হবে।

ঙ. পরিবেশ বিপর্যয় : বাংলাদেশের জনসংখ্যার তুলনায় প্রাকৃতিক সম্পদ অত্যন্ত অপ্রতুল। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে জলবায়ুতে যে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে তা বাংলাদেশের জন্য ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনবে। জলবায়ু পরিবর্তিত হলে সম্পদের অপ্রাপ্যতা আরো বেড়ে যাবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ দ্রুত বিনষ্ট হবে। ইতোমধ্যে দেশের বৃহৎ বনভূমি সুন্দরবন ও হাওর অঞ্চলের পরিবেশীয় ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে।

বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে আমাদের করণীয় : বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি শুধুমাত্র বাংলাদেশের জন্য নয় বরং সমগ্র বিশ্ব ও মানবজাতির জন্য হুমকিস্বরূপ। ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক অবকাঠামো বাংলাদেশকে যতটা কুফলভোগী করেছে, এ সংকট সৃষ্টিতে আমাদের দেশের ভূমিকা শিল্পোন্নত দেশের তুলনায় খুবই নগণ্য। এখনই সময় এ সংকট মোকাবিলায় এগিয়ে আসার। বৈশ্বিক উষ্ণতা রোধে আমাদের সবচেয়ে যে বিষয়গুলোর ওপর জোর দিতে হবে তা হলো-

১. ব্যাপকভাবে বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। এ ধারাবাহিকতায় দেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় ও নদী তীরবর্তী এলাকাসমূহে বনায়ন কর্মসূচি যত দ্রুত সম্ভব শুরু করতে হবে। ফলে নদী ভাঙন ও সামুদ্রিক ঝড়ের তীব্রতা কমে যাবে।
২. বৃক্ষনিধন রোধ করতে হবে। কারণ বৃক্ষই প্রকৃতি থেকে ক্ষতিকর কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস শোষণ করে এবং অক্সিজেন নির্গমন করে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে।
৩. বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ বাড়ায়, এমন ক্ষতিকর গ্যাসের নির্গমন কমাতে হবে।
৪. পরিবেশ সহায়ক জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে হবে।
৫. শিল্পকারখানার জ্বালানি সাশ্রয় করতে হবে এবং উৎপন্ন বর্জ্য বিশুদ্ধকরণের ব্যবস্থা নিতে হবে।
৬. সর্বোপরি দেশের সবাইকে এ ভয়াবহ দুর্যোগ মোকাবিলায় এগিয়ে আসতে হবে।

উপসংহার : একবিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে মানবজাতি যখন সভ্যতার চরম শিখরে, ঠিক তখনই এ মানবজাতি তার পরিবেশকে ঠেলে দিচ্ছে চরম বিপর্যয়ের দিকে। মানুষ তার প্রয়োজনে একদিকে যেমন পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করছে অপরদিকে পরিবেশকে করে তুলছে বিষাক্ত। পরিবেশ দূষিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত এবং পরিবেশের ভারসাম্য দ্রুত বিনষ্ট হচ্ছে। এ বিশ্ব আমাদেরই, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তাই এ ভয়াবহ বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাতে আমাদেরই এগিয়ে আসতে হবে।

✨ ধন্যবাদ! ✨

কোন প্রশ্নের বানান বা উত্তর ভুল থাকলে রিপোর্ট করুন | *Thank you for reading!*

আরও দেখুন: sattacademy.com

⚠️ Sattacademy -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ

🌐 sattacademy.com | 📞 +880 1306 446390



মডেল ৫

লিখিত প্রশ্ন

(১)

(ক) উদাহরণসহ 'অ' ধ্বনি উচ্চারণের পাঁচটি নিয়ম লেখো।

- উত্তরঃ ১। শব্দের আদিতে যদি 'অ' থাকে এবং তারপরে 'ই'-কার, 'উ'-কার, থাকে তবে সে- 'অ' এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'-কারের মতো হয়। যথাঃ অভিধান (ওভিধান), অভিযান (ওভিজান), অতি (ওতি), মতি (মোতি), অতীত (ওতিত), অধীন (অধীন) ইত্যাদি।
- ২। শব্দের আদ্য-অ' এর পরে 'য'-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে সেক্ষেত্রে 'অ'-এর উচ্চারণ প্রায়শ 'ও'-কারের মতো হয়। যেমনঃ অদ্য (ওদ্যো), অন্য (ওন্যো), অত্যাচার (ওত্যাচার), কন্যা (কোন্না), বন্যা (বোন্না) ইত্যাদি।
- ৩। শব্দের আদ্য-অ' এর পর 'ক্ষ', 'জ্ঞ', থাকলে, সে 'অ'পের উচ্চারণ সাধারণত 'ও'-কারের মতো হয়ে থাকে। যথাঃ অক্ষ (ওক্খো), দক্ষ (দোক্খো), যক্ষ (জোক্খো), লক্ষণ (লোক্খো), যজ্ঞ (জোগ্গো), লক্ষ (লোক্খো), রক্ষা (রোক্খা) ইত্যাদি।
- ৪। শব্দের প্রথমে যদি 'অ' থাকে এবং তারপর 'ঋ'-কার যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলেও, সেই 'অ'-এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'-কারের মতো হয়। যথাঃ মসৃণ (মোস্ণ), বজ্রতা (বোজ্জতা), যকৃত (জোকৃত)।
- ৫। শব্দের প্রথমে 'অ' যুক্ত 'র'-ফলা থাকলে সেক্ষেত্রেও আদ্য 'অ'-এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও'-কার হয়ে থাকে। যথাঃ ক্রম (ক্রোম), গ্রহ (গ্রোহো), গ্রন্থ (গ্রোন্থো), ব্রত (ব্রোতো) ইত্যাদি।

অথবা

(খ) যেকোনো পাঁচটি শব্দের প্রমিত উচ্চারণ লেখো :

অসহ্য

উত্তরঃ অসহ্য = অশোজ্ঝো

আহ্বান

উত্তরঃ আহ্বান = আওভান্

খেলা

উত্তরঃ খেলা = খ্যালা

চিহ্ন

উত্তরঃ চিহ্ন = চিন্হ

বিস্ময়

উত্তরঃ বিস্ময় = বিশ্শ্য

বিশ্বাস

উত্তরঃ বিশ্বাস = বিশ্শাশ্

শ্রম

উত্তরঃ শ্রম = শ্রমো

সত্য

উত্তরঃ সত্য = শোততো

(১১)

(ক) এইচএসসি পরীক্ষার পর করণীয় বিষয়ে দুই বন্ধুর কথোপকথন রচনা করো।

উত্তরঃ **সোহেল** : কেমন আছ? **আরমান** : ভালো বন্ধু। তুমি কেমন আছ?

সোহেল : ভালো আছি। তবে পরীক্ষা নিয়ে খুব চিন্তিত আছি।

আরমান : তুমি তোমার রসায়ন বিষয়টি সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনতে পারনি?

সোহেল : রসায়নে আমি সব পড়ে ফেলেছি। বুঝেও পড়েছি কিন্তু তবুও মনে হচ্ছে সবই ভুলে যাচ্ছি।

আরমান : চিন্তা করো না বন্ধু, পরীক্ষার আগে এমনই হয়। আমারও মনে হচ্ছে সব ভুলে যাচ্ছি। দেখবে পরীক্ষায় ঠিকই সব লিখতে পারবে। শ্রেণি পরীক্ষার সময়ও এমনই হয়েছিল, না?

সোহেল : হ্যা, কিন্তু এইচএসসি পরীক্ষাটি মনে একটি বাড়তি চাপ সৃষ্টি করেছে। তোমার রসায়নে প্রস্তুতি কেমন?

আরমান : ভালো। আমি ভয় পাচ্ছি বাংলা প্রথম পত্র নিয়ে। সৃজনশীল বিষয়ে কেমন উদ্দীপক হয়, তাই নিয়ে।

সোহেল : উদ্দীপক যেমনই হোক, সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হলো মূল বইয়ের প্রতিটি অংশ ভালোভাবে পড়া। এমন উদ্দীপকই দেবে, যেটা পাঠ্যবইয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ অথবা বৈসাদৃশ্যপূর্ণ অথবা পাঠ্যবিষয়ের খণ্ডাংশের চিত্র। এই সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য ও খণ্ডাংশকে তুমি তখনই যথার্থভাবে চিত্রিত করতে পারবে, যখন তুমি মূল বই ভালোভাবে পড়বে।

আরমান : ঠিক বলেছ বন্ধু, আর চিন্তা করব না। আমি এভাবেই পড়ব।

সোহেল : আমিও রসায়ন নিয়ে আর ভাববো না। শুধু পড়ব আর লিখব। তাহলেই আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

আরমান : পড়ার মাঝখানে বিশ্রাম নেবে। এতে পড়াটা ভালোভাবে মনে থাকবে।

সোহেল : ধন্যবাদ বন্ধু।

আরমান : তোমাকেও ধন্যবাদ।

অথবা

(খ) নিচের গল্পসংকেত অনুসরণে 'গ্রিনকার্ড' শিরোনামে একটি খুদেগল্প রচনা করো।

ছোটবেলা থেকেই মনে মনে একটি স্বপ্ন লালন করছি। সেই স্বপ্ন সফল করতে -----

উত্তরঃ ছোটবেলা থেকেই মনে মনে একটি স্বপ্ন লালন করছি। সেই স্বপ্ন সফল করতে কত রাত যে না ঘুমিয়ে পার করেছি, তার ইয়ত্তা নেই। মধ্যবিত্ত পরিবারের বড়ো সন্তান হিসেবে আমার কাঁধে ছিল অনেক দায়িত্ব, কিন্তু চোখের কোণে জমা ছিল আমেরিকার সেই জাদুকরী 'গ্রিনকার্ড' পাওয়ার তীব্র আকুলতা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পার হয়েই শুরু হলো আসল লড়াই। দিন-রাত এক করে উচ্চশিক্ষার আবেদন, বৃত্তির চেষ্টা আর চাকুরির প্রস্তুতি নিতে লাগলাম। অবশেষে ভাগ্য সহায় হলো। একটি নামী বিদেশি সংস্থায় উচ্চপদে চাকরি পেয়ে পাড়ি জমালাম স্বপ্নের দেশে।

সেখানে গিয়েও বিশ্রামের সুযোগ ছিল না। কাজের দক্ষতা প্রমাণ, করোনাকালীন মন্দা পার করা আর অভিবাসন আইনের জটিল গোলকধাঁধা পেরিয়ে কেটে গেল দীর্ঘ সাতটি বছর। প্রতিটা দিন কেটেছে এক অজানা আশঙ্কায়— এই বুঝি স্বপ্নের প্রাসাদ ভেঙে পড়ে!

অবশেষে আজ সকালে সেই কাঙ্ক্ষিত খামটি হাতে পেলাম। চকচকে সবুজ কার্ডটি হাতের মুঠোয় নিয়ে অদ্ভুত এক শূন্যতা আমায় গ্রাস করল। এই একটা কার্ডের পেছনে ছুটতে গিয়ে ফেলে এসেছি মায়ের হাতের রান্না, বাবার শেষ দিনগুলো আর শৈশবের চেনা বন্ধুদের আড্ডা। কার্ডটি আজ আমার পকেটে, কিন্তু বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। স্বপ্নের জয় হলো ঠিকই, কিন্তু জীবনের অনেকটা অংশই যেন হেরে গেল।

(১০)

(ক) সারাংশ লেখো :

জাতি শুধু বাইরের ঐশ্বর্য-সম্ভার, দালানকোঠার সংখ্যাবৃদ্ধি কিংবা সামরিক শক্তির অপরাজেয়তায় বড়ো হয় না, বড়ো হয় অন্তরের শক্তিতে, নৈতিক চেতনায় আর জীবনপণ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ক্ষমতায়। জীবনের মূল্যবোধ ছাড়া জাতীয় সত্তার ভিত কখনো শক্ত আর দৃঢ়মূল হতে পারে না। মূল্যবোধ জীবনশ্রী হয়ে জাতির সর্বাস্থে ছড়িয়ে পড়লে জাতি অর্জন করে মহত্ত্ব আর মহৎ কর্মের যোগ্যতা।

উত্তরঃ সারাংশ:জাতির অগ্রগতির মাপকাঠি বাইরের ঐশ্বর্য সম্ভার বা শক্তিতে নয়; বরং অন্তরের ঐশ্বর্যে। মনের এই ঐশ্বর্যের অন্য নাম সামাজিক মূল্যবোধ। তার প্রকাশ ঘটে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন ও নৈতিক চেতনার। জাতির ভিত্তিকে দৃঢ় করতে হলে এই মূল্যবোধের প্রসার ঘটতে হবে। মাতৃভাষা মাধ্যমে সর্বত্র তা সঞ্চারিত করার দায়িত্ব লেখকদের।

অথবা

(খ) ভাবসম্প্রসারণ করো :

কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর?

মানুষেরি মাঝে স্বর্গ-নরক- মানুষেতে সুরাসুর।

উত্তরঃ **মূলভাব:** অপার্থিব জগতে স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্ব কল্পনা করা হলেও প্রকৃতপক্ষে স্বর্গ ও নরকের অবস্থান পার্থিব জগতের মানুষের মাঝেই বিরাজ করছে। মানুষের আচার-আচরণ আর হৃদয়বৃত্তির বহিঃপ্রকাশের মাঝেই স্বর্গ ও নরক নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণা করে।

সম্প্রসারিত ভাব: যুগ-যুগান্তরের ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী মানুষ মনে করে- পৃথিবীর বহু উপরে অনন্ত জ্যোতিপুঞ্জের মাঝে স্বর্গের অবস্থান, আর অধোলোকে এক ভয়ংকর অন্ধকার স্থানে নরক বিরাজিত। স্বর্গে বাস করে পুণ্যবান, ভোগ করে অনন্ত সুখ; আর নরকে বাস করে পাপাচারীরা, ভোগ করে কঠিন শাস্তি। ধারণা করা হয়, এ স্বর্গ-নরকের অস্তিত্ব আছে পরলোকে। কিন্তু এ জগতে আমরা এ স্বর্গ-নরকের অস্তিত্ব প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করি। পৃথিবীতে মানুষের মাঝেও এ স্বর্গ-নরকের অবস্থান লক্ষণীয়। নিজের কর্মফলের মধ্য দিয়েই মানুষ এখানে স্বর্গ-নরকের ফল ভোগ করে। লোভ-লালসা ইত্যাদি মানুষকে অন্যায়ের পথে ঠেলে দেয়। অন্যায় আচরণ এবং পাপাচার-বৃত্তির ফলে সমাজে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার ও চরম অশান্তি। ফলে সমাজ নরকের ক্ষুদ্র সংস্করণ হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে, হিংসা, দ্বেষ, লোভ-লালসা অন্তর থেকে বিদূরিত করে ঐক্য এবং শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে কর্মের পথে অগ্রসর হলে এ ধূলি মাটির সংসারেই নেমে আসে স্বর্গীয় সুখমা ও শান্তি। মাটির পৃথিবী তখন হয়ে ওঠে স্বর্গীয় লীলা-নিকেতন।

মন্তব্য: পৃথিবীর মানুষ তার কর্মফলের মাধ্যমেই স্বর্গের সুখা ও নরকের যন্ত্রণা ভোগ করে থাকে। মানুষের অপকর্মের ফল

(৯)

(ক) মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হওয়ায় তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি বৈদ্যুতিন চিঠি লেখো।

উত্তরঃ মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করায় বন্ধুকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি ইমেইল (বৈদ্যুতিন চিঠি) নিচে দেওয়া হলো:

বিষয়: মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হওয়ায় আন্তরিক অভিনন্দন!

প্রিয় [বন্ধুর নাম],

আশা করি ভালো আছিস। আজই মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। তুই সারা বাংলাদেশে প্রথম স্থান অধিকার করেছিস শুনে আমার আনন্দের কোনো সীমা নেই! এই অভাবনীয় সাফল্যের জন্য তোকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

তুই যে মেধা, একাগ্রতা আর কঠোর পরিশ্রম দিয়ে বিগত মাসগুলোতে প্রস্তুতি নিয়েছিস, এই ফলাফল তারই যোগ্য স্বীকৃতি। তোর এই গৌরবময় অর্জন আমাদের সবাইকে অত্যন্ত গর্বিত করেছে। আমি জানতাম তোর এই সাধনা বৃথা যাবে না। ভবিষ্যতে একজন মহান চিকিৎসক হয়ে তুই দেশের মানুষের সেবা করবি, এই দোয়াই করি।

তোর এবং তোর বাবা-মায়ের জন্য অনেক শুভকামনা। শিগগিরই তোর বাসায় আসছি মিষ্টি খেতে। ভালো থাকিস।

তোর প্রিয় বন্ধু,

[তোর নাম]

অথবা

(খ) ক্যাডেট কলেজের বাংলা বিভাগের 'প্রভাষক' পদে নিয়োগ লাভের জন্য 'সভাপতি, ক্যাডেট কলেজ পরিচালনা পরিষদ' বরাবর একটি আবেদনপত্র লেখো।

উত্তরঃ ক্যাডেট কলেজের বাংলা বিভাগের 'প্রভাষক' পদে নিয়োগের জন্য সভাপতি বরাবর একটি আদর্শ আবেদনপত্রের নমুনা নিচে দেওয়া হলো:

তারিখ: ১২ জুন, ২০২৬

বরাবর,

সভাপতি,

ক্যাডেট কলেজ পরিচালনা পরিষদ,

ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।

বিষয়: বাংলা বিভাগের 'প্রভাষক' পদে নিয়োগের জন্য আবেদন।

মহোদয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে, গত ০১ জুন, ২০২৬ তারিখে দৈনিক 'ইত্তেফাক' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, আপনার পরিচালনাধীন ক্যাডেট কলেজসমূহের জন্য বাংলা বিভাগে কিছুসংখ্যক 'প্রভাষক' নিয়োগ করা হবে। আমি উক্ত পদের একজন আগ্রহী প্রার্থী হিসেবে নিচে আমার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও শিক্ষাগত যোগ্যতা আপনার সদয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করছি:

১. নাম:
২. পিতার নাম:
৩. মাতার নাম:
৪. বর্তমান ঠিকানা:
৫. স্থায়ী ঠিকানা:
৬. জন্ম তারিখ:
৭. জাতীয়তা: বাংলাদেশী
৮. ধর্ম:
৯. মোবাইল নম্বর:

১০. শিক্ষাগত যোগ্যতা:

পরীক্ষার নাম	পাসের সন	বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়	বিভাগ/জিপিএ/সিজিপিএ
এম.এ (বাংলা)	২০২৪	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৩.৫০ (স্কেল ৪.০০)
বি.এ (অনার্স, বাংলা)	২০২৩	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৩.৬০ (স্কেল ৪.০০)
এইচ.এস.সি	২০১৯	ঢাকা বোর্ড	জিপিএ ৫.০০
এস.এস.সি	২০১৭	ঢাকা বোর্ড	জিপিএ ৫.০০

১১. অভিজ্ঞতা (যদি থাকে): একটি নামকরা কলেজে বাংলা বিষয়ের খণ্ডকালীন প্রভাষক হিসেবে ১ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

১২. অন্যান্য যোগ্যতা: কম্পিউটারে এমএস ওয়ার্ড, পাওয়ার পয়েন্ট ও ইন্টারনেট ব্রাউজিংয়ে দক্ষ এবং ইংরেজিতে কথা বলা ও লেখায় পারদর্শী।

অতএব, মহোদয়ের নিকট আকুল প্রার্থনা, আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করে আমাকে উক্ত পদের জন্য লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দানে বাধিত করবেন।

নিবেদক,

(আবেদনকারীর স্বাক্ষর)

নাম:

সংযুক্তিসমূহ:

১. সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র ও নম্বরপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি।
২. নাগরিকত্ব ও চারিত্রিক সনদের সত্যায়িত অনুলিপি।
৩. ৪ কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত রঙিন ছবি।
৪. নির্ধারিত মূল্যের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার।

(৮)

(ক) 'অমর একুশে বইমেলা' সম্পর্কে অনুভূতি ব্যক্ত করে একটি দিনলিপি রচনা করো।

উত্তরঃ ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

রাত ১১:৩০ মিনিট

ধানমন্ডি, ঢাকা।

প্রিয় ডায়েরি,

আজকের দিনটি আমার জীবনের অন্যতম একটি সেরা এবং স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে। আজ বিকেলে আমি গিয়েছিলাম বাঙালির প্রাণের উৎসব, 'অমর একুশে বইমেলা'য়। প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাস এলেই মনটা কেমন যেন ব্যাকুল হয়ে ওঠে বাংলা একাডেমি আর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের এই চত্বরটির জন্য। আজ অবশেষে সেই চিরচেনা মেলা প্রাঙ্গণে পা রাখলাম।

মেলায় প্রবেশ করতেই এক অদ্ভুত ভালো লাগায় মনটা ভরে গেল। চারদিকে শুধু বই আর বইয়ের সুবাস। চারদিকে রঙের মেলা, যেন বসন্তের হাওয়া লেগেছে সবার মনে। লাল-সাদা-কালো শাড়ি আর পাঞ্জাবি পরে শত শত মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে স্টল থেকে স্টলে। শুধু তরুণ-তরুণীই নয়, ছোট শিশু থেকে শুরু করে প্রবীণ মানুষেরাও বইয়ের পাতা উল্টে দেখছেন। এই দৃশ্যটি এক অন্যরকম তৃপ্তি দেয়। মনে হয়, প্রযুক্তির এই যুগেও আমাদের বাঙালি জাতির বইয়ের প্রতি ভালোবাসা এতটুকু কমেনি।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের বিশাল প্রাঙ্গণে কবি, লেখক, সাহিত্যিক ও পাঠকদের এই মিলনমেলা দেখে আবেগ আপ্লুত না হয়ে পারা যায় না। লেখক কর্নারে প্রিয় একজন লেখকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল এবং তাঁর অটোগ্রাফসহ একটি নতুন বই সংগ্রহ করলাম—এটি ছিল আজকের দিনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। এছাড়া নিজের পছন্দের বেশ কয়েকটি উপন্যাসের বই এবং ছোট ভাইয়ের জন্য একটি কমিকস বই কিনেছি।

বইমেলায় প্রতিটি ধূলিকণায় যেন জড়িয়ে আছে আমাদের বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের শহিদদের রক্তে ভেজা ইতিহাস ও চেতনা। এটি কেবল নতুন বই কেনার মেলা নয়, এটি আমাদের সংস্কৃতির শিকড়, আমাদের আত্মপরিচয়ের উৎসব।

সন্ধ্যায় মেলা প্রাঙ্গণে যখন বাতিগুলো জ্বলে উঠল, তখন চারপাশের পরিবেশটা এক মায়াবী রূপ নিল। লিটল ম্যাগাজিন চত্বরে আড্ডা, চা-এর কাপে চুমুক আর বইয়ের আলোচনা—সব মিলিয়ে এক অপার্থিব অনুভূতি নিয়ে বাড়ি ফিরেছি। মেলা থেকে ফিরে এলেও আমার মনটা এখনও সেখানেই পড়ে আছে। আজকের এই সুন্দর দিনটির স্মৃতি আমি দীর্ঘদিন হৃদয়ে লালন করব।

এখন ঘুমোতে যাওয়ার সময়, কিন্তু বালিশের পাশে রাখা নতুন বইগুলোর সুবাস আমাকে বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছে—আমি একজন গর্বিত বাঙালি।

অথবা

(খ) মনে করো, তোমার নাম তাহমিদ। তুমি 'দৈনিক সমকাল' পত্রিকার রাজশাহী জেলার সংবাদ প্রতিবেদক। সম্প্রতি বরেন্দ্র অঞ্চলে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় তীব্র পানিসংকট নিয়ে একটি সংবাদ প্রতিবেদন রচনা করো।

উত্তরঃ বরেন্দ্র অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর বিপর্যয়: তীব্র পানিসংকটে লাখো মানুষ

তাহমিদ, রাজশাহী জেলা প্রতিনিধি | দৈনিক সমকাল

রাজশাহী, ১২ জুন, ২০২৬

রাজশাহীর বরেন্দ্র অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর আশঙ্কাজনকভাবে নিচে নেমে গেছে। ফলে গোদাগাড়ী, তানোর ও তানোরের আশেপাশের বিস্তীর্ণ এলাকায় তীব্র খাবার ও সেচের পানির সংকট দেখা দিয়েছে। প্রতি বছর শুষ্ক মৌসুমের পর বর্ষা এলেও পানির স্তর আশানুরূপ ওপরে উঠছে না।

সংকটের মূল চিত্র

- পানির স্তর পতন: বরেন্দ্র এলাকায় পানির স্তর প্রতি বছর ১ থেকে ২ ফুট নিচে নামছে।
- নলকূপ অকেজো: সাধারণ অগভীর নলকূপগুলোতে (টিউবওয়েল) এখন আর কোনো পানি উঠছে না।
- পাম্প বিপর্যয়: সাবমার্সিবল পাম্পগুলোও পর্যাপ্ত পানি তুলতে হিমশিম খাচ্ছে।
- পিপাসার্ত গ্রাম: শত শত গ্রামের মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে খাবার পানি সংগ্রহ করছেন।

কারণ ও প্রভাব

- অতিরিক্ত উত্তোলন: ইরি-বোরো চাষে ভূগর্ভস্থ পানির ওপর শতভাগ নির্ভরতা প্রধান কারণ।
- জলবায়ু পরিবর্তন: অপরিষ্পত্ত বৃষ্টিপাত এবং তীব্র দাবদাহে পানির উৎস শুকিয়ে যাচ্ছে।
- কৃষিতে বিপর্যয়: সেচের পানির অভাবে ব্যাহত হচ্ছে ফসল উৎপাদন।
- জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি: দূষিত ও দূরবর্তী উৎসের পানি পানের কারণে বাড়ছে পেটের পীড়া।

মাঠপর্যায়ের চিত্র ও মন্তব্য

স্থানীয় বাসিন্দা রহিমুদ্দিন জানান, "আগে ১০০ ফুটের মধ্যে পানি মিলত। এখন ১০০০ ফুট গভীর করেও ঠিকমতো পানি পাওয়া যাচ্ছে না।"

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের মতে, বরেন্দ্র অঞ্চলের পানির স্তর সুরক্ষায় ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার অবিলম্বে কমাতে হবে। এর বিকল্প হিসেবে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং পদ্মা নদীর উপরিভাগের পানি (সারফেস ওয়াটার) ব্যবহারের পরিধি বাড়ানো জরুরি।

প্রতিবেদনটি আরও তথ্যবহুল করতে চাইলে আমাকে জানাতে পারেন:

- কোনো নির্দিষ্ট উপজেলার বিশেষ তথ্য যোগ করতে হবে কি না
- স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তা বা গবেষকদের কোনো বিশেষ বক্তব্য যুক্ত করতে হবে কি না
- প্রতিবেদনটির শব্দ সংখ্যা নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন আছে কি না

(৭) যেকোনো ১০টি শব্দের পারিভাষিক রূপ লেখো :

(ক) যেকোনো ১০টি শব্দের পারিভাষিক রূপ লেখো :

অথবা

autonomous

উত্তরঃ Autonomous = স্বায়ত্তশাসিত

co-ordinator

উত্তরঃ co-ordinator = সমন্বয়কারী

deputation

উত্তরঃ Deputation = প্রেষণ

eye-witness

উত্তরঃ eye-witness = প্রত্যক্ষদর্শী

famine

উত্তরঃ Famine = দুর্ভিক্ষ

gratuity

উত্তরঃ Gratuity = আনুতোষিক/পারিতোষিক

honorary

উত্তরঃ Honorary = অবৈতনিক

interim

উত্তরঃ Interim = অন্তর্বর্তীকালীন / মধ্যকালীন

jail-code

উত্তরঃ Jail-code = কারা সংহিতা/কারাবিধি

leap year

উত্তরঃ Leap year = অধিবর্ষ

manifesto

উত্তরঃ Manifesto = ইশতেহার

ordinance

উত্তরঃ Ordinance = অধ্যাদেশ

pass-word

উত্তরঃ Pass-word = গুপ্তসংকেত

reform

উত্তরঃ Reform = সংস্কার

sabotage

উত্তরঃ Sabotage = অন্তর্ঘাত

(খ) নিচের অনুচ্ছেদটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করো :

Bangladesh's students have made history by leading the world's first Gen Z revolution, marking a new chapter for the nation. This movement, driven by a generation rejecting corruption, inequality and oppression, has shown the transformative power of youth in shaping the future. Despite threats, state repression, and violence, these students remained resolute in their pursuit of justice and systemic change.

উত্তরঃ বিশ্বের প্রথম 'জেনারেশন জেড' বা 'জেন জি' বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়ে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা ইতিহাস রচনা করেছে, যা জাতির জন্য এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। দুর্নীতি, বৈষম্য ও নিপীড়নকে প্রত্যাখ্যান করা একটি প্রজন্মের দ্বারা পরিচালিত এই আন্দোলন ভবিষ্যৎ গঠনে যুবসমাজের পরিবর্তনকামী শক্তিকে প্রদর্শন করেছে। হুমকি, রাষ্ট্রীয় দমনপীড়ন এবং সহিংসতা সত্ত্বেও এই শিক্ষার্থীরা ন্যায়বিচার ও পদ্ধতিগত পরিবর্তনের অশেষাশে অবিচল ছিল।

(ঙ)

(ক) নিচের যেকোনো পাঁচটি বাক্যের অপপ্রয়োগ শুদ্ধ করে লেখো:

অথবা

(i) এটি লজ্জাকর ব্যাপার।

উত্তরঃ এটি লজ্জাকর ব্যাপার। = এটি লজ্জাজনক ব্যাপার।

(ii) মাতাহীন শিশুর কী দুঃখ!

উত্তরঃ মাতাহীন শিশুর কী দুঃখ! = মাতৃহীন শিশুর কী দুঃখ!

(iii) তিনি আজ সভায় থাকবে।

উত্তরঃ তিনি আজ সভায় থাকবেন = তিনি আজ সভায় উপস্থিত থাকবেন।

(iv) অশ্রুজলে বুক ভেসে গেল।

উত্তরঃ অশ্রুজলে বুক ভেসে গেল। = অশ্রুতে বুক ভেসে গেল।

(v) রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য।

উত্তরঃ রচনাটির উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য = রচনাটির উৎকর্ষ অনস্বীকার্য

(vi) ওভারলোড বহন দুর্ঘটনার কারণ।

উত্তরঃ ওভারলোড বহন দুর্ঘটনার কারণ। = ওভারলোড দুর্ঘটনার কারণ।

(vii) আমৃত্যু পর্যন্ত দেশের সেবা করে যাব।

উত্তরঃ আমৃত্যু পর্যন্ত দেশের সেবা করে যাব। = আমৃত্যু দেশের সেবা করে যাব।

(viii) সবাই মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ।

উত্তরঃ সবাই মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ। = 'দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ'।

(খ) অনুচ্ছেদটি শুদ্ধ করে লেখো :

গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশের রূপান্তর পর্বে প্রবেশ করার অধিকার অর্জন করেছি। আমাদের এই কাঙ্ক্ষিত রূপান্তরের লক্ষ্য হবে সব ধরনের বৈষম্যসমূহ অবসানের রাজনৈতিক আয়োজন নিশ্চিত করা, এদেশে গণতান্ত্রিক ও নাগরিক সাম্যতা ভিত্তিক একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এক্ষেত্রে আমাদের সবার মধ্যে ঐক্যমত প্রয়োজন।

উত্তরঃ গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশের রূপান্তর পর্বে প্রবেশ করার অধিকার অর্জন করেছি। আমাদের এই কাঙ্ক্ষিত রূপান্তরের লক্ষ্য হবে সব ধরনের বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে রাজনৈতিক আয়োজন নিশ্চিত করা এবং এ দেশে গণতান্ত্রিক ও নাগরিক সাম্যভিত্তিক একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এ ক্ষেত্রে আমাদের সবার মধ্যে ঐক্যমত প্রয়োজন।

(৫)

(ক) বাক্য কাকে বলে? গঠন অনুসারে বাক্য কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লেখো।

উত্তরঃ বাক্য হলো এক বা একাধিক শব্দের সমষ্টি যা সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে। বাক্যের মাধ্যমে একটি ভাব, চিন্তা, প্রশ্ন বা নির্দেশ প্রকাশ করা হয়। যেমন, "সে স্কুলে যায়।" এটি একটি সম্পূর্ণ বাক্য কারণ এটি একটি সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করছে।

বাক্যের গঠন অনুসারে শ্রেণিবিভাগ:

বাক্যের গঠন অনুসারে বাক্যকে সাধারণত তিনটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করা যায়:

1. সরল বাক্য
2. মিশ্র বাক্য
3. জটিল বাক্য

১. সরল বাক্য:

সরল বাক্য হলো এমন একটি বাক্য যা একটি প্রধান ভাব বা তথ্য প্রকাশ করে। এই ধরনের বাক্যে সাধারণত একটি মাত্র প্রধান ক্রিয়া থাকে এবং তা একটি স্বাধীন বাক্যাংশ দ্বারা গঠিত হয়।

উদাহরণ:

- আমি বই পড়ি।
- সে গান গায়।

২. মিশ্র বাক্য:

মিশ্র বাক্য হলো এমন একটি বাক্য যা দুটি বা ততোধিক সরল বাক্যকে সংযোজক (যেমন এবং, কিন্তু, অথবা, তাই) দ্বারা যুক্ত করে গঠিত হয়। এখানে প্রতিটি অংশ স্বাধীনভাবে দাঁড়াতে পারে।

উদাহরণ:

- সে স্কুলে যায় এবং আমি বাড়িতে থাকি।
- রুবেল লেখাপড়া করছে, কিন্তু তার মন বসছে না।

৩. জটিল বাক্য:

জটিল বাক্য হলো এমন একটি বাক্য যা একটি প্রধান বাক্যাংশ এবং এক বা একাধিক গৌণ বাক্যাংশ দ্বারা গঠিত। গৌণ বাক্যাংশগুলি প্রধান বাক্যাংশের উপর নির্ভর করে এবং তা সম্পূর্ণভাবে অর্থ প্রকাশ করতে পারে না।

উদাহরণ:

- যখন আমি ঘুমাচ্ছিলাম, তখন সে এসেছিল।
- আমি জানি যে তুমি সত্য কথা বলছো।

অথবা

(খ) বন্ধনীর নির্দেশানুসারে বাক্যান্তর করো: (যেকোনো পাঁচটি)

(i) এদেশ বড়ো বিচিত্র।

উত্তর: এদেশ বড়ো বিচিত্র। = কী বিচিত্র এ দেশ!

(ii) শহিদদের মৃত্যু নেই।

উত্তর: শহিদদের মৃত্যু নেই। = শহিদ অমর।

(iii) মানুষ সামাজিক জীব।

উত্তর: মানুষ সামাজিক জীব। = মানুষ অসামাজিক জীব নয়।

(iv) আইন মেনে চলা উচিত।

উত্তর: আইন মেনে চলা উচিত। = আইন মেনে চলো।

(v) সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত।

উত্তর: সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত। = যাঁরা সুশিক্ষিত, তাঁরাই স্বশিক্ষিত।

(vi) ছেলেটি গরিব হলেও মেধাবী।

উত্তর: ছেলেটি গরিব হলেও মেধাবী। = ছেলেটি গরিব, কিন্তু মেধাবী।

(vii) আমরা সবাই দেশকে ভালোবাসি।

উত্তর: আমরা সবাই দেশকে ভালোবাসি। = আমরা কি সবাই দেশকে ভালোবাসি না?

(viii) যারা তরুণ, তারাই গড়বে আগামীর বাংলাদেশ।

উত্তরঃ যারা তরুণ, তারাই গড়বে আগামীর বাংলাদেশ। = তরুণরাই গড়বে আগামীর বাংলাদেশ।

(8)

(ক) 'উপসর্গের অর্থবাচকতা নেই, কিন্তু অর্থদ্যোতকতা আছে।' - উদাহরণসহ আলোচনা করো।

উত্তরঃ 'উপসর্গ' শব্দটির অর্থ হলো উপসৃষ্টি বা নতুন সৃষ্টি। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত যে সকল অব্যয় জাতীয় বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি কোনো ধাতু বা শব্দের পূর্বে বসে ঐ ধাতু বা শব্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটাতে পারে তাদেরকে উপসর্গ বলে। নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করতে পারলেও উপসর্গের নিজস্ব পূর্ণাঙ্গ অর্থ নেই। এজন্য এদের অর্থ প্রকাশের ক্ষমতা তথা অর্থবাচকতা নেই। কিন্তু এরা অন্য ধাতু বা শব্দের অর্থকে প্রভাবিত করতে পারে। তাই এদের অর্থের রেশ তথা অর্থদ্যোতকতা আছে।

যেমন: 'হার' একটি ধাতু। এর পূর্বে 'উপ', 'পরি', 'অনা', 'প্র', 'বি' প্রভৃতি উপসর্গ যুক্ত হয়ে যথাক্রমে

- উপ হার = উপহার:
- পরি+হার= পরিহার
- অন্য + হার = অনাহার:
- প্র + হার = প্রহার এবং
- বি+হার= বিহার

নামক নতুন অর্থবোধক শব্দ তৈরি করতে পেরেছে। লক্ষ করলে দেখা যায় যে, এখানে ব্যবহৃত উপসর্গগুলোর ('উপ', 'পরি', 'অনা', 'প্র', 'বি') নিজস্ব কোনো অর্থ নেই; কিন্তু এগুলো 'হার' ধাতুর পূর্বে যুক্ত হয়ে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করেছে। তাই এ কথা প্রমাণিত যে, উপসর্গের অর্থবাচকতা না থাকলেও অর্থদ্যোতকতা আছে।

অথবা

(খ) ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করো: (যেকোনো পাঁচটি)

বকধার্মিক

উত্তরঃ বকধার্মিক = বকের ন্যায় ধার্মিক (উপমিত কর্মধারয় সমাস)

সুহৃদ

উত্তরঃ সুহৃদ = শোভন (সুন্দর) হৃদয় যার (বহুব্রীহি সমাস)

অহি-নকুল

উত্তরঃ অহি-নকুল = অহি ও নকুল (দ্বন্দ্ব সমাস)।

শিক্ষামন্ত্রী

উত্তরঃ শিক্ষামন্ত্রী = শিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী (মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস)

রূপান্তর

উত্তরঃ রূপান্তর = অন্য রূপ (নিত্য সমাস)

নবরত্ন

উত্তরঃ নবরত্ন = নব রত্নের সমাহার (দ্বিগু)।

আমরণ

উত্তরঃ আমরণ = মরণ পর্যন্ত (অব্যয়ীভাব সমাস)

রাজপথ

উত্তরঃ রাজপথ = পথের রাজা (ষষ্ঠী তৎপুরুষ বা সম্বন্ধ তৎপুরুষ সমাস)।

(৩)

(ক) আবেগ শব্দ কাকে বলে? উদাহরণসহ আবেগ শব্দের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করো।

উত্তরঃ যে শব্দের মাধ্যমে মনের নানা ভাব ও আবেগকে প্রকাশ করা হয়, তাকে আবেগ শব্দ বলে।

প্রকাশ অনুসারে আবেগ শব্দকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন:

- সিদ্ধান্তবাচক আবেগ শব্দ: এই জাতীয় আবেগ শব্দের সাহায্যে অনুমোদন প্রকাশ পায়। যেমন: বেশ, তাই হবে।
- প্রশংসাবাচক আবেগ শব্দ: এ ধরনের আবেগ শব্দ প্রশংসা প্রকাশ করে। যেমন: বাঃ! বড় ভালো কথা বলেছ।
- বিরক্তিবচক আবেগ শব্দ: এ ধরনের আবেগ শব্দ ঘৃণা প্রকাশ করে। যেমন: ছিঃ ছিঃ, তুমি এত নীচ!
- যন্ত্রণাবাচক আবেগ শব্দ: এ ধরনের আবেগ শব্দ আতঙ্ক প্রকাশ করে। যেমন: আঃ, কী আপদ।
- সম্বোধনবাচক আবেগ শব্দ: এ ধরনের আবেগ শব্দ আহ্বান করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। যেমন: হে বন্ধু, তোমাকে অভিনন্দন। বিস্ময়বাচক আবেগ শব্দ: এ ধরনের আবেগ আশ্চর্য হওয়ার ভাব প্রকাশ করে। যেমন: আরে, তুমি আবার এলে!

অথবা

(খ) নিচের অনুচ্ছেদ থেকে নিম্নরেখাঙ্কিত যেকোনো পাঁচটি শব্দের শব্দশ্রেণি নির্ণয় করো :

নারকেলের ঐ লম্বা মাথায় হঠাৎ দেখি কাল ডাবের মতো চাঁদ উঠেছে ঠান্ডা ও গোলাগাল। ছিটকিনিটা আস্তে খুলে পেরিয়ে গেলাম ঘর ঝিমধরা এই মস্ত শহর কাঁপছিলো থরথর।

উত্তরঃ উদ্ধৃত কবিতাংশটি আল মাহমুদের 'নোলক' বা 'পাখির কাছে ফুলের কাছে' কাব্যের অন্তর্গত। অনুচ্ছেদের মূল শব্দগুলো থেকে ব্যাকরণিক শব্দশ্রেণি (Parts of Speech) নিচে নির্ণয় করা হলো:

- ঐ: সর্বনাম (নির্দেশক সর্বনাম)
- মতো: অনুসর্গ (সাদৃশ্যবাচক অনুসর্গ)
- গোলাগাল: বিশেষণ (অবস্থাবাচক বিশেষণ)
- আস্তে: ক্রিয়াবিশেষণ (ধরণবাচক ক্রিয়াবিশেষণ)
- গেলাম: ক্রিয়া (সমাপিকা ক্রিয়া)
- ঝিমধরা: বিশেষণ (অবস্থাবাচক বিশেষণ)
- শহর: বিশেষ্য (জাতিবাচক বিশেষ্য)
- থরথর: ক্রিয়াবিশেষণ (অনুকর বা অনুভূতিমূলক ক্রিয়াবিশেষণ)

(২)

(ক) বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানানের যেকোনো পাঁচটি নিয়ম উদাহরণসহ লেখো।

উত্তরঃ বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানের পাঁচটি নিয়মঃ

১. তৎসম অর্থাৎ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের বানান যথাযথ ও অপরিবর্তিত থাকবে।
২. যে সব তৎসম শব্দে ই, ঙ্গ বা উ, উ উভয়ই শুদ্ধ, সেসব শব্দে কেবল ই বা উ এবং তার -কার চিহ্ন ই-কার, উ-কার ব্যবহৃত হবে। যেমনঃ কিংবদন্তি।
৩. রেফ-এর পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন: অর্চনা; অর্জন।
৪. সন্ধির ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত ম স্থানে অনুস্বার হবে। যেমনঃ অহম + কার = অহংকার।
৫. শব্দের শেষে বিসর্গ থাকবে না।

অথবা

(খ) যেকোনো পাঁচটি শব্দের বানান শুদ্ধ করে লেখো :

অপরূহ

উত্তরঃ অপরাহু = অপরাহু

দন্দ

উত্তরঃ দন্দ = দন্দ

প্রতিযোগীতা

উত্তরঃ প্রতিযোগীতা - প্রতিযোগিতা।

বিভিষিকা

উত্তরঃ বিভিষিকা = বিভীষিকা

মুমূর্ষু

উত্তরঃ 'মুমূর্ষু' = মুমূর্ষু।

শুশ্রূষা

উত্তরঃ শুশ্রূষা = শুশ্রূষা।

শান্তনা

উত্তরঃ শান্তনা = সান্তনা।

স্টেশন

উত্তরঃ স্টেশন = স্টেশন।

(১২) নিচের যেকোনো একটি বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ রচনা করো :

(ক) স্বাধীনতার চেতনা

উত্তরঃ **সূচনাঃ**

বাংলাদেশের স্বাধীনতা তথা মুক্তিযুদ্ধ হলো ১৯৭১ সালে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত বাংলার মানুষের একটি বিপ্লব ও সশস্ত্র সংগ্রাম। বাঙালির আবহমান কালের ইতিহাসের এক মাইলফলক ১৯৭১। এক মহিমান্বিত ইতিহাস রচিত হয়েছে ১৯৭১ সালে। স্বাধীনতা প্রতিটি মানুষের আজন্ম লালিত স্বপ্ন। পাকিস্তানিদের অধীনে দাস হয়ে থাকতে চায়নি বাঙালির। তক্ত, অশ্রু আর অপারিসীম আত্মত্যাগের ভেতর দিয়ে একাত্তরের আমরা অর্জন করেছি স্বাধীনতা। আর বীরত্বপূর্ণ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে অভ্যুদয় হয়েছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। মুক্তিযুদ্ধ তাই আমাদের জাতীয় জীবনে এক অহংকার, গৌরবের এক বীরত্বগাঁথা।

মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটঃ

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে জন্ম নেয় জরত ও পাকিস্তান নামের দুইটি পৃথক রাষ্ট্র। পাকিস্তান রাষ্ট্রের ছিল দুটি অংশ পশ্চিম পাকিস্তান আর পূর্ব পাকিস্তান। স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক-বেসামরিক ও রাজনৈতিকসহ সকল ক্ষেত্রে বৈষম্যে জর্জরিত করতে থাকে পূর্ব পাকিস্তানকে। শিল্প কারখানার কাঁচামালের জন্য পশ্চিম পাকিস্তান নির্ভর করতো পূর্ব পাকিস্তানের ওপর। পুজিবাদী অবধারায় শ্রমিকদের অল্প বেতন দিয়ে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় অপরদিকে উৎপাদনের কাজ করাহত। অপরদিকে রাজস্ব থেকে আয়, রপ্তানি আয় প্রভৃতির সিংহভাগ বায় হতো পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিরক্ষায় যেখানে ৯৫% ব্যয় হতো, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষায় ব্যয় হতো মাত্র ৫ শতাংশ।

পরবর্তীতে ১৯৭০ এর নির্বাচনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী কোনোভাবে বাঙালির হাতে শাসনভার ভুলে দিতে চায়নি। পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার অভাব, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ, অবকাঠামোগত উন্নয়নে অবহেলা, মৌলিক নাগরিক অধিকারে হস্তক্ষেপসহ সকল প্রকার বৈষম্য স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র গঠনের দাবিকে জোরালো করে তোলে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও বিকাশ

বাঙালি জাতির রাজনৈতিক সচেতনতা ও জাতীয়তাবাদের সূচনা হয় ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই। তৎকালীন পাকিস্তানের ৫৬ শতাংশেরই বাস ছিল পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানে। কিন্তু, শাসন ক্ষমতার চাবিকাঠি কুক্ষিগত ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। ক্রমেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর- শাসন শোষণের স্বরূপ পূর্ববাংলার জনগণের সামনে স্পষ্ট হতে থাকে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েক মাসের মধ্যেই শতকর ৫৬ জনের মাতৃভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে পাকিস্তানি শাসকরা শতকর ৭ ভাগ লোকের ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহম্মদ আলী জিন্নাহর উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার ঘোষণা পূর্ব বাংলার মানুষের মাঝে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ১৫৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ববাংলার প্রতিবাদী জনত দেশের যুক্তিমস্তে দীক্ষা নেন। জামা ও সংস্কৃতির ওপর এই আঘাতের পরই বাঙালি বুঝতে পারে তাদের স্বাভাবিক। তারা বাঙালি জাতি এই পরিচয় তাদের মধ্যে দৃঢ় হতে শুরু করে।

দেশ মাতৃকার কল্যাণে বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে এসময় গঠিত হয় বেশ কিছু সংগঠন। ১৯৫৪ এর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, ১৯৬৬ এর শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন ১৯৬৬ এর ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ এর নির্বাচনে বিপুল ভোটে ১৬৭ টি আসনে আওয়ামী লীগের বিজয়, এই প্রত্যেকটি ঘটনার মাধ্যমে বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটে এবং ১৯৭১ সালের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সেই জাতীয়তাবাদ চূড়ান্ত স্বীকৃতি লাভ করে।

স্বাধীনতার ডাক

১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিপুল ভোটে আওয়ামী লীগ জয়ী হলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি। বরা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সরকার তখন ষড়যন্ত্র শুরু করে। এর ফলে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতায় উল্লুখ দশ লক্ষাধিক মানুষের সামনে বক্তৃকর্মে ঘোষণা করেন। "আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। গণসূর্যের মধ্য কাঁপিয়ে কবি শুনিয়েছিলেন তাঁর অমর-কবিতাখানি:

"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের।

এরপর থেকেই গড়ে ওঠে তীব্র অসহযোগ আন্দোলন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে সৃষ্টি হয়েছিল অনন্য এক ইতিহাস। তাঁর সেই ১৯ মিনিটের বক্তবোই স্বাধীনতার বীজ লুকায়িত ছিল।

২৫ এ মার্চের কালরাত্রি এবং স্বাধীনতার ঘোষণা

নির্বাচনে এমন বিপুল জয়ের পরেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে টালবাহানা শুরু করে। এরই মধ্যে ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে গোপনে পূর্ব পাকিস্তানে আসতে থাকে অস্ত্র আর সামরিক বাহিনী। এরপর পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ নয়, মাটি চাই বলে হানাদার বাহিনীকে নির্দেশ প্রদান করে ঢাকা আগ করে পৃথিবীর অন্যতম জঘন্য গণহত্যার হোতা ইয়াহিয়া খান।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারেই শুরু হয় ইতিহাসের ঘূর্ণিত হত্যাজঙ্ক, যা অপারেশন সার্চ লাইট নামে পরিচিত। এ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অতর্কিতে হামলা চালায় নিরস্ত্র বাঙালির ওপর। ভার নির্বিচারে হত্যাজঙ্ক চালায় পিলখানা, রাজারবাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে।

মধ্যরাতের পর হানাদার বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। গ্রেফতারের পূর্বেই অর্থাৎ ২৯৬ এ মার্চের প্রথম প্রহরে গোপন তারবার্তায় তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তার স্বাক্ষরিত ঘোষণাবার্তাটি তৎকালীন ইপিআর এর ট্রান্সমিটারের সাহায্যে চট্টগ্রামে প্রেরণ করা হয়। এরপর চট্টগ্রামের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে ২৬ ও ২৭ এ মার্চ বঙ্গবন্ধুর নামে প্রচারিত হয় স্বাধীনতার ঘোষণা। ২৬শে মার্চ দুপুরে এম এ হান্নান ও চট্টগ্রামের কালুরঘাটের স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেন। সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রাম।

মুক্তিবাহিনী ও মুক্তিযুদ্ধ

১২ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে সিলেটের তেলিয়াপাড়ার চা বাগানে কর্নেল এম এ.জি ওসমানীর নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী গঠন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য পুরো দেশকে ১৯ টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এর সর্বাধিনায়ক। জুন মাসের শেষের দিকে গেরিলারা সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। আগস্টে গঠিত নৌ

কমান্ডে বীরত্ব ও কৃতিত্বের সাথে যুদ্ধ শুরু করে। ৩ ডিসেম্বর থেকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাঙালিদের সাথে ভারতীয় সেনারাও যোগ দেয়। মিলিতভাবে গঠিত হয় মিত্রবাহিনী।

মুজিবনগর সরকার গঠন

১০ এপ্রিল ১৯৭১ কুষ্টিয়ার বর্তমান মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতল ইউনিয়নের ভবের পাড়া গ্রামের আম্রকাননে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়। এই জায়গার নতুন নামকরণ করা হয় মুজিবনগর। তাই এই সরকারকে বলা হয় মুজিবনগর সরকার। সে সময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দীন আহমেদকে প্রধানমন্ত্রী করে, রাষ্ট্রপতি শাসিত এই সরকার ১৭ এপ্রিল শপথ গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন। এই দিনই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। পরবর্তীতে এই ঘোষণাপত্র অনুযায়ী মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হতে থাকে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সবচেয়ে বেশি কার্যকর ও সুদূরপ্রসারী সাংবিধানিক পদক্ষেপ ছিল মুজিবনগর সরকার গঠন। এই সরকারের নেতৃত্বে নয় মাসের মহান মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। বিশ্বব্যাপী জনসমর্থন আদায়ে এই সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ ও জনযুদ্ধ

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ নিরস্ত্র জনগণের ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আক্রমণ চালানোর পর বাঙালি ছাত্র, জনতা, পুলিশ, ইপিআরসহ সর্বস্তরের মানুষ সাহসিকতার সাথে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দেশের জন্য যুদ্ধ করতে গিয়ে বহু মুক্তিযোদ্ধা রণাঙ্গনে শহিদ হন, আবার অনেকে পঙ্গুত্ব বরণ করেন। মাতৃভূমির প্রতি তাই মুক্তিযোদ্ধাদের এ ঋণ কোনোদিন শোধ হবে না। এদেশের মানুষ চিরকাল জাতির এই সূর্য সন্তানদের মনে রাখবে। মুক্তিযুদ্ধের মূল নিয়ামক শক্তি ছিল জনগণ। তাই মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, মাত্র, পেশাজীবী, সাংস্কৃতিক কর্মীসহ সর্বস্তরের জনসাধারণ নিজ নিজ অবস্থান থেকে যুদ্ধে ভূমিকা নেয়।

মুক্তিসংগ্রাম ও কৃষক

আমাদের ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে এদেশের মানুষ, এদেশের কৃষক শ্রমিকগণ যে ভূমিকা রেখেছিলেন স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছিল, তারা অস্ত্রহাতে যেমন ছিলেন যুদ্ধের মাঠে, তেমনি দেশের অভ্যন্তরেও প্রতিরাধে ও সশস্ত্র অবরোধে অংশ নিয়েছিলেন ব্যাপকভাবে। মুক্তিসংগ্রাম ধারণার মধ্যে দুটি উপাদান আছে। একটি হলো জাতীয় মুক্তি এবং অন্যটি অর্থনৈতিক, সামাজিক, শ্রেণিগত শোষণমুক্তি। আর এই মুক্তির মস্তক দিল আমাদের কৃষকসমাজ। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে যারা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তাদের বেশিরভাগই ছিলেন গ্রামের সাধারণ কৃষিজীবী মানুষ। প্রাদের বীরত্বগাথা ইতিহাসের এক সোনালি অধ্যায়। সুদীর্ঘ বন্ধনার পথ পেরিয়ে এসে তারা নিজের জীবনকে তুচ্ছ করেছেন। তাই যে হাতে তারা লাজল ঠেলেছেন, ধান কেটেছেন, নৌকার দাড় টেনেছেন, জীবিকার জন্য প্রাণান্ত শ্রম দিয়েছেন সে হত তাদের উদ্যত হয়েছি শত্রুর মোকাবিলায়।

মুক্তিযুদ্ধ ও ছাত্র সমাজ

মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রসমাজের ভূমিকা ছিল অহঙ্কার করার মতো। একক গোষ্ঠী হিসেবে ছাত্রদের সংখ্যা ছিল বেশি। গোটা জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছিলেন বিভিন্ন স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। দেশের সব আন্দোলনে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছে এদেশের ছাত্র সমাজ। মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রদের অবদানের কথা বলতে গেলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলা, সোপট্রিক স্বাধীনতা ভাস্কর্য। বাংলাদেশে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬২ ও ৬৪ সালের শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৮ সালে ১১ দফা আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅ্যুত্থান, ১৯৭০ এর নির্বাচন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে করনগার্ড হিসেবে তৎকালীন মাত্রসমাজের ভূমিকা অপরিসীম। একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বড় অংশ সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়।

মুক্তিযুদ্ধ ও রাজনৈতিক দল

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী প্রধান রাজনৈতিক দল হলো আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগই সর্বপ্রথম পূর্ববাংলার জনগণকে স্বাধিকার আন্দোলনে সংগঠিত করে। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা যুদ্ধের ডাকে সাড়া দিয়েই এদেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। বস্তুত, তিনি দিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় আওয়ামী লীগ ছাড়াও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- ন্যাপ (জসানী), ন্যাপ (মোজাফফর), কমিউনিস্ট পার্টি, জাতীয় কংগ্রেস ইত্যাদি। তবে

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাকবাহিনীর সমর্থনে মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, পিডিপিসহ কতিপয় বিপথগামী রাজনৈতিক দল মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে।

মুক্তিযুদ্ধ ও গণমাধ্যম

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকালে মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতে এবং জনমত গঠনে দেশ বিদেশ থেকে অসংখ্য পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল, মুজিবনগর সরকার ও প্রবাসী বাঙালিদের প্রকাশিত পত্রপত্রিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহতয়, ধর্ষণ, ধ্বংসলীলা, সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ, শরণার্থী শিবিরের বর্ণনা ও মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহের বিবরণ গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরে। যুদ্ধের সময়ে দেশপ্রেম জাগ্রতকরণ, মনোবল বৃদ্ধিসহ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে শিল্পী- সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা ও অবদান ছিল খুবই প্রশংসনীয়। পত্রপত্রিকায় লেখা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে খবর পাঠ, দেশাত্মবোধক ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান, আবৃত্তি, নাটক, কাথিকা, জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'চরমপত্র ইত্যাদি মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়ত করেছে।

মুক্তিযুদ্ধে নারী

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীর আশ্রয় ও সহযোগিতা ছিল অনন্য অনবদ্য। নারী সক্রিয় ছিল কখনও সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে, কখনো বা যুদ্ধক্ষেত্রের আড়ালে। মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস জুগিয়েছেন, প্রেরণা জুগিয়েছেন এমন নারীর সংখ্যা অসংখ্য। অজানা-অচেনা আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেক শুশ্রূষা করেছেন বহু নারী। চরম দুঃসময়ে পাকিস্তানি হানাদারের হাত থেকে রক্ষা করতে নিজেদের ঘরে আশ্রয় দিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধাদের। অনেক সময়ে শত্রুর কাছে নিজেদের সস্ত্রম এবং প্রাণও দিতে হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিদের অবদান

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিরা সর্বতোভাবে পাশে ছিলেন। বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। বিভিন্ন দেশে তারা মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন। বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায়ে বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দের কাছে ছুটে গিয়েছেন। তারা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেছেন। পাকিস্তানকে অস্ত্র, গোলাবারুদ সরবরাহ না করতে বিশ্বের বিভিন্ন সরকারের নিকট আবেদন করেছেন। এক্ষেত্রে ব্রিটেনের প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মুক্তিযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক বিশ্ব

১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানিদের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের কাহিনি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে বিশ্ব জনমত বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের পক্ষে দাঁড়ায়। প্ররত সে সময় এক কোটিরও বেশি শরণার্থীকে আশ্রয় দেয়। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন দিয়ে বিশ্বজনমত তৈরিতে এগিয়ে এসেছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন দেয়। তৎকালীন মার্কিন প্রশাসন বাংলাদেশের বিরোধিতা করলেও সে দেশের জনগণ বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদরা বাংলাদেশকে সমর্থন দেয়। তাদের প্রতিরোধের মুখে মার্কিন প্রশাসন পাকিস্তানে অস্ত্র রপ্তানি বন্ধ করতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশকে সাহায্য করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিটলস এর জর্জ হ্যারিসন এবং ভারতীয় পণ্ডিত রবি শংকর 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ এর আয়োজন করেছিলেন। ফরাসি সাহিত্যিক আন্দ্রে মারোখা, জ্যা পল সাত্রে সহ অনেকেই বাংলাদেশকে সমর্থন দিয়েছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধে যৌথ বাহিনী

১৯৭১ সালে যুদ্ধের প্রায় শেষদিকে ২১ নভেম্বর এরতীয় পূর্বাঞ্চল কমান্ডার লে. জে জগজিৎ সিং অরোরার অধিনায়কত্বে ঘোষিত হয় বাংলাদেশ ভারত যৌথ কমান্ড। ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনী মিত্রবাহিনী নাম নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যুক্ত হওয়া ভারতীয় বিমান হামলায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

মুক্তিযুদ্ধ ও বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড

মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি ও যৌথবাহিনীর দুর্বীর প্রতিরোধ ও আক্রমণের মুখে পশ্চিমা হানাদার বাহিনী যখন কোণঠাসা হয়ে পড়েছে তখন পরাজয় নিশ্চিত জেনে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে এ দেশের সূর্য সন্তানদের ওপর। আর এ কাজে তাদেরকে সাহায্য করে তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার আলবদর আল শামস কাহিনী। পরাজয় নিশ্চিত জেনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী দেশের মুক্তিকামী ও মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনকারী শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, সাংবাদিক

বুদ্ধিজীবীদের ধরে নিয়ে প্রহর করা হয়। তাদের বেশিরভাগের ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে পাওয়া যায়।

আত্মসমর্পণ এবং বাঙালির বিজয়

সংগ্রামী বাঙালি আর মিত্র বাহিনীর সাথে যুদ্ধে হানাদার বাহিনী বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১, বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদয়নে অর্থাৎ, তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে প্রায় ৯৩০০০ সৈন্য নিয়ে জেনারেল নিয়াজি সম্মিলিত বাহিনীর প্রধান জগজিৎ সিং আরোরার নিকট আত্মসমর্পণ করেন। এসময় বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন একে খন্দকার। এর মধ্য দিয়ে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে অভ্যুদয় ঘটে বাংলাদেশের।

"রক্তের অফনে মোড়া কুকুরে খেয়েছে যারে,

শকুনে খেয়েছে যারে সে আমার ভাই, সে আমার মা, সে আমার প্রিয়তম পিতা।

স্বাধীনতা, সে আমার স্বজন, হারিয়ে পাওয়া একমাত্র স্বজন-

স্বাধীনতা, সে আমার প্রিয় মানুষের রক্তে কেনা অমূল্য ফসল।"

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশের মানুষের স্বপ্ন ছিল স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ক্ষুণ্ণদারিদ্র-অশিক্ষা-কুসংস্কার থেকে মুক্ত অসাম্প্রদায়িক একটি দেশের বঙ্গবন্ধু যার নাম দিয়েছিলেন 'সোনার বাংলা'। এই সোনার বাংলা গঠনের চেতনাই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। নতুন প্রজন্মের কাছে এই চেতনাকে পৌঁছে দেওয়া জরুরি। কেনন উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে এই চেতনার কোনো বিকল্প নেই।

উপসংহার

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির অহংকার। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ জাতিকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র এনে দেয়। এই স্বাধীনত ত্রিশ লক্ষ ভাইয়ের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত, লক্ষ মা-কেনের সমভ্রমের বিনিময়ে পাওয়া। তাই এই স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আমাদের নিবেদিতপ্রাণ হওয়া উচিত। নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানানো যেমন জরুরি, তেমনি নাগরিকদের নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কেও সচেতন হওয়া উচিত। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কর্তব্যবোধে, ন্যায়নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের মাধ্যমে বাংলাদেশের যথার্থ অগ্রগতি নিশ্চিত করা সম্ভব।

(খ) বাংলাদেশের পোশাক শিল্প

উত্তরঃ

বাংলাদেশের পোশাক শিল্প

ভূমিকা

আধুনিক বিশ্বে শিল্পায়নের ধারণা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষের পরিধেয় কাপড়ের উৎপাদন এক সময় শিল্প হিসেবেও পরিচিত ছিল। আজ অনেক দেশে শিল্পায়নের ক্ষেত্রে পোশাক শিল্প নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে। এই সম্ভাবনার সংযোজন আমাদের বাংলাদেশেও ঘটেছে। বাংলাদেশ বর্তমানে বিদেশে পোশাক রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। প্রকৃতপক্ষে, পোশাক শিল্প জাতীয় আয়ের প্রায় ৬৪ শতাংশ জোগান দেয়। তাছাড়া এই শিল্প অনেক বেকারের কর্মসংস্থান করেছে। তাদের অধিকাংশই নারী। এর ফলে একদিকে যেমন নারীদের অর্থায়ন ও ক্ষমতায়নের কিছু সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, অন্যদিকে পুরুষের লাঞ্ছনার হাত থেকেও রক্ষা পাচ্ছে। পোশাক শিল্পের উদ্যোক্তাদের দ্বারা শোষিত হলেও সামগ্রিকভাবে এই শিল্প আমাদের দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের অতীত অবস্থা

সুদূর অতীত থেকেই বিশ্ববাজারে বাংলার পোশাক শিল্পের যথেষ্ট চাহিদা ছিল। বিশেষ করে মসলিন ও জামদানি নামক সুস্বাদু কাপড় ছিল বিশ্ব বিখ্যাত। কিন্তু ব্রিটিশদের আগমনে পোশাক শিল্প অনেকাংশে ধ্বংস হয়ে যায়। তারা তাঁতশিল্পকে ধ্বংস করার জন্য নানা পরিকল্পনা করে। কাপড়ের বাজার তৈরির জন্য তারা মেশিনের মাধ্যমে বস্ত্র তৈরি শুরু করে। ফলে এক পর্যায়ে পোশাক শিল্প তার নিজস্ব স্বকীয়তা হারাতে থাকে।

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের বর্তমান অবস্থা

দীর্ঘ যাত্রার পর বাংলাদেশ তার তৈরি পোশাক শিল্পের মাধ্যমে বস্ত্র খাতে তার হারানো গৌরব ফিরে পেতে চাইছে। এই শিল্প দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি উৎসাহব্যঞ্জক অবদান রেখে চলেছে। তবে বস্ত্র খাতের

হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের ইতিহাস খুব বেশি দিনের নয়। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ কিছু শিল্প পণ্য বিদেশে রপ্তানি শুরু করে। 1977 সালে, বেসরকারী শিল্প উদ্যোক্তাদের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের বিকাশ ঘটে। তখন মাত্র কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল।

1985 সালে তৈরি পোশাক শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটে। শুরুতে 1৫০টি পোশাক কারখানা ছিল। এই সীমিত সংখ্যক কারখানা দিয়ে পোশাক শিল্পের সূচনা হলেও শিল্পপতিরা ধীরে ধীরে কারখানার সংখ্যা ও শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ান। দেশীয় উদ্যোক্তাদের সক্রিয় ভূমিকার কারণে এসব শিল্পের সংখ্যা বেড়ে চাঁড়িয়েছে তিন হাজারের বেশি। এসব প্রতিষ্ঠানে প্রায় 1৮ লাখ লোক কর্মসংস্থান করেছে, যার মধ্যে নারী শ্রমিকের সংখ্যা বেশি, প্রায় ৮৫%।

পোশাক শিল্পের ইতিহাস

জীবনধারণের জন্য যেমন খাদ্যের প্রয়োজন, তেমনি সমাজে বসবাসের জন্য মানুষের বস্ত্রের প্রয়োজন। প্রাচীনকালে, লোকেরা লতা, পাতা, বাকল এবং পশুর চামড়া দিয়ে তাদের বস্ত্রের চাহিদা মেটাতে এবং পরবর্তীতে ধীরে ধীরে তন্তু, সুতা এবং কাপড়ের প্রচলন হয়। কবে, কবে এবং কোথায় প্রথম কাপড়ের ব্যবহার শুরু হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও এক সময় মানুষ সুই সুতো দিয়ে সেলাই করে নিজেদের কাপড় তৈরি করত। ধীরে ধীরে মানুষ সেলাই মেশিনের সাহায্যে কাপড় তৈরি করতে থাকে। সেলাই মেশিনের সাহায্যে মানুষের কাপড় সেলাইয়ের ইতিহাস মাত্র 260 বছর আগের গল্প। সেলাই মেশিন উদ্ভাবকদের প্রাচীন ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে ইংল্যান্ডের চার্লস ফ্রেডরিক 1755 সালে প্রথম যান্ত্রিক সেলাই মেশিন আবিষ্কার করেন। তারপর সেলাই মেশিন হাতের সেলাইয়ের মতো সেলাই তৈরি করতে পারে। আইজ্যাক মেরিট সিঙ্গার 1851 সালে বাণিজ্যিকভাবে সফল সেলাই মেশিন আবিষ্কার করেছিলেন।

বাংলাদেশের পোশাক শিল্প এবং এর ভবিষ্যৎ

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরু হয় ষাটের দশকে। বর্তমানে এটি বাংলাদেশের বৃহত্তম রপ্তানিমুখী শিল্প। 1960 সালে, বাংলাদেশের প্রথম পোশাক ঢাকার উর্দু রোডে রিয়াজ স্টোর নামে যাত্রা শুরু করে। 1967 সালে, রিয়াজ স্টোরের উৎপাদিত 10,000 পিস শার্ট প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ থেকে দেশের বাইরে (যুক্তরাজ্য) রপ্তানি করা হয়েছিল। এরপর 1973 সালে তিনি "রিয়াজ স্টোর" এর নাম পরিবর্তন করে "রিয়াজ গার্মেন্টস" করেন। এছাড়া এ যুগের আরও একটি পোশাকের কথা শোনা যায়, তা হলো 'দেশ গার্মেন্টস'। দেশ গার্মেন্টস তখনকার 100% রপ্তানিমুখী পোশাক ছিল। ৭০ এর দশকের শেষের দিকে এদেশে মাত্র ৯টি রপ্তানিমুখী কোম্পানি ছিল যারা ইউরোপের বাজারে প্রতি বছর ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ব্যবসা করত। সে সময় দেশে বড় ও বিখ্যাত পোশাক কারখানা ছিল ৩টি। সেগুলো হলো- রিয়াজ গার্মেন্টস, প্যারিস গার্মেন্টস, জুয়েল গার্মেন্টস।

পোশাক শিল্পের বাজার

যেকোনো উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পণ্যের বাজার তৈরি করা। তা না হলে পণ্য যতই ভালো হোক না কেন তা কোনো কাজে আসে না। আশার কথা, বাংলাদেশের পোশাক শিল্প বিশ্ববাজারে যথেষ্ট চাহিদা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের তৈরি পোশাকের প্রধান বাজার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চম। কানাডা, ইইসি দেশ, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, বেলজিয়াম এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ ছাড়াও ২৩টি দেশে বাংলাদেশ তার পোশাক রপ্তানি করে। এসব পোশাকের মধ্যে রয়েছে শার্ট, পায়জামা, জিন্স প্যান্ট, জ্যাকেট, ল্যাবরেটরি কোট, গেঞ্জি, সোয়েটার, পুল ওভার, খেলাধুলার পোশাক, নাইট ড্রেস ইত্যাদি। বর্তমানে বাংলাদেশের পোশাকের বাজার বিভিন্ন দেশে বিস্তৃত হচ্ছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পোশাক শিল্পের অবদান

পোশাক শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সুদূরপ্রসারী অবদান রেখে চলেছে। এই সেক্টরের অবদানের প্রধান দিকগুলি নিম্নরূপ:

অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং রপ্তানি বৃদ্ধি

পোশাক শিল্পের বিকাশের সাথে সাথে দেশের রপ্তানি পণ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের দেশের প্রায় শতাধিক বায়িং হাউস পোশাক ক্রয়-বিক্রয়ের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। জাতীয় আয়ের প্রায় ৬৪% আসে এই খাত থেকে। তবে এই আয় নির্ভর করে রপ্তানি বাণিজ্যের ওপর।

বেকার সমস্যা সমাধান

এই শিল্প বেকারত্ব হ্রাস এবং জাতীয় জীবনে স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে কারণ এই খাতে দরিদ্র, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের এক মিলিয়নেরও বেশি নারী শ্রমিককে কর্মসংস্থান করা যেতে পারে।

দ্রুত শিল্পায়ন

পোশাক শিল্প দ্রুত শিল্পায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ফলে এদেশে বিভিন্ন স্পিনিং, উইভিং, নিটিং, ডাইং, ফিনিশিং, প্রিন্টিং ইত্যাদি শিল্প গড়ে উঠছে। এ ছাড়া গার্মেন্টস, জিপার, বাটাম, ব্যাগলা ইত্যাদি শিল্পের প্রসার ঘটছে

পরিবহন এবং পোর্ট ব্যবহার

পোশাক শিল্পের আমদানি-রপ্তানি বন্দর থেকে কারখানায় পরিবহন শিল্পের অগ্রগতি এবং এগুলোর যথাযথ ব্যবহারে নেতৃত্ব দিয়েছে।

অন্যান্য অবদান

পোশাক শিল্পে বিনিয়োগ করে ব্যাংকগুলো লাভবান হচ্ছে। বীমা কোম্পানির প্রিমিয়ামের পরিমাণ বাড়ছে। বাংলাদেশে আসছে নতুন নতুন প্রযুক্তি।

ফ্যাশন শিল্পে সমস্যা

1 জানুয়ারী, 2005 থেকে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) দ্বারা প্রবর্তিত টেক্সটাইল এবং পোশাক সংক্রান্ত চুক্তি কার্যকর হয়। মাল্টিফাইবার অ্যারেঞ্জমেন্ট (MFA) চুক্তি বাতিল করা হয়েছে। ফলে পোশাক শিল্প কোটা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। আসলে কোটামুক্ত বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতার জন্য আমাদের দেশ এখনো প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি তৈরি করতে পারেনি। যেখানে সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, চীন, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ কম খরচে মানসম্মত পোশাক উৎপাদন করছে, সেখানে বাংলাদেশ এখনো অনেক পিছিয়ে। এই পশ্চাৎপদতার মূলে রয়েছে নানা সমস্যা।

পোশাক শিল্পের সম্ভাবনা

বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। তবে আজকের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে। বাংলাদেশের পোশাক শিল্পকে টিকে থাকতে অনেক দূর যেতে হবে। এর জন্য আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের ISO সার্টিফিকেশন গ্রহণ করা উচিত। ক্রেতারা যেহেতু বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। সর্বোপরি, আমাদের টেক্সটাইল ও পোশাকের মান উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে দাম কমিয়ে চ্যালেঞ্জকে সুযোগ হিসেবে নিতে হবে। সে লক্ষ্যে সরকার, উদ্যোক্তা ও ব্যাংকগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে।

বাংলাদেশে পোশাক শিল্পের অবস্থান

2021 সালের শেষে, পোশাক রপ্তানিতে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ভিয়েতনামের তুলনায় বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি বেড়েছে 4.72 বিলিয়ন ডলার। এর ফলে পোশাক রপ্তানিতে ভিয়েতনামকে টপকে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। ২০২১ সালে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাজারে ৩ হাজার ৫৮০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। একই সঙ্গে পোশাক শিল্পের বিশ্ব বাণিজ্যে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ভিয়েতনামের রপ্তানি মূল্য ছিল ৩ হাজার। 108 মিলিয়ন ডলার। তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বিশ্বে চীনের অবস্থান প্রথম। আর বাংলাদেশ থেকে এক ধাপ নিচে অর্থাৎ প্রধান প্রতিযোগী দেশ ভিয়েতনাম চলে গেছে তৃতীয় স্থানে।

উপসংহার

মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং দেশের বেকারত্ব সমস্যা সমাধানে পোশাক শিল্পের ভূমিকা অনন্য। 1977 সালে হাতে গোনা কয়েকটি কারখানা নিয়ে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের সূচনা হয়েছিল, আজ এর সংখ্যা কয়েকগুণ বেড়েছে। জাতীয় আয়ের পাঁচ শতাংশের বেশি আসছে এ শিল্প থেকে। তাই এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সব ক্ষেত্রে সরকারি অনুগ্রহ পেলে এই শিল্প আরও সমৃদ্ধ হবে এবং বাংলাদেশের জন্য অসীম সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে। আর পোশাক শিল্প ভবিষ্যতে আরও আধুনিক হয়ে উঠবে।

(গ) বাংলাদেশের উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তি

উত্তরঃ

বাংলাদেশের উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তি

ভূমিকা : মানব কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে বিজ্ঞান । বিজ্ঞানকে কাজে লাগানোর কৌশলই হলো প্রযুক্তি । আধুনিককালে মানব জীবনের সাথে প্রযুক্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িত । তথ্য ও প্রযুক্তি প্রতি মুহূর্তে আমাদের কাজে লাগে । মানুষ বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে তথ্যপ্রযুক্তির সেবা গ্রহণ করে আসছে । যেমন- মোবাইল, টেলিফোন, কম্পিউটার, সফটওয়্যার, নেটওয়ার্ক, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি । তথ্যপ্রযুক্তি বিশ্বজুড়ে যেমন অভাবনীয় পরিবর্তন এনেছে, তেমনি দেশ ও জাতির অগ্রগতিতে অপরিহার্য অবদান রাখছে । তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে বেকার মানুষ কর্মসংস্থানের সন্ধান পেয়েছে, আর্থনীতিক উন্নতি হয়েছে, জনশক্তি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে ।

তথ্যপ্রযুক্তি : তথ্যপ্রযুক্তি হলো তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা, প্রক্রিয়াকরণ এবং সরবরাহের জন্য ব্যবহৃত প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মিলিত ও সুশৃঙ্খল রূপ । তথ্য-প্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো হলো- কম্পিউটিং, মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন, ডাটাবেস উন্নয়ন, বিনোদন, তথ্যভান্ডার, নেটওয়ার্ক, সফটওয়্যার উন্নয়ন, মুদ্রণ ও রিপোগ্রাফিক, ডিশ অ্যান্টেনা ইত্যাদি ।

তথ্যপ্রযুক্তি ও বাংলাদেশ : আধুনিককালে বিশ্বজুড়ে তথ্যপ্রযুক্তির জয়জয়কার ধ্বনিত হচ্ছে । তথ্যপ্রযুক্তির হাত ধরে বিশ্ব এখন মানুষের হাতের মুঠোয় । বাংলাদেশও এ প্রযুক্তি থেকে পিছিয়ে নেই । গত দশ বছর ধরে বাংলাদেশে ক্রমান্বয়ে প্রযুক্তির বিকাশ ঘটেছে । স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ দেশব্যাপী তরুণ প্রজন্ম তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপারে খুবই আগ্রহী । বাংলাদেশের বিভিন্ন জরিপ সংস্থার তথ্যসূত্রে জানা যায়- গত দশ বছরে আমাদের দেশ তথ্যপ্রযুক্তির প্রতিটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছে ।

জাতীয় উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তি : আধুনিক বিশ্বে দেশ ও জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার অপরিহার্য । বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রতিটি দেশেই দিন দিন তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বেড়ে চলেছে । বিভিন্ন দেশে এখন অসংখ্য তথ্যপ্রযুক্তির প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে । শিক্ষা, চিকিৎসা, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসায়-বাণিজ্য, ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে । কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, ইন্টারনেট ও তথ্যপ্রযুক্তির দোকান দিয়ে মানুষ খুব ভালো ব্যবসাও করছে । তাছাড়া তথ্যপ্রযুক্তির নানা প্রোগ্রামের ওপর মেলা প্রদর্শনী, প্রতিযোগিতা, সেমিনার ইত্যাদির আয়োজনে করা হয় । আর এই জন্যই তথ্যপ্রযুক্তি দ্রুত দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে এবং দেশ ও জাতির উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে ।

তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশে সরকারের অবদান : তথ্যপ্রযুক্তি দেশের উন্নয়নে অবদান রাখে বলে বাংলাদেশ সরকার তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশের জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেছে :

১. তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার দেশের অভ্যন্তরীণ গ্রাম এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করে প্রায় | সারা দেশকে ডিজিটাল টেলিফোন ও ইন্টারনেটের আওতায় এনেছে ।
২. বাংলাদেশ সরকার তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশে জাতীয় যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালা অনুমোদন করে ঢাকার | কারওয়ান বাজারে অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত একটি আইসিটি ইনকিউবেটর স্থাপন করেছে । এটি ১০ হাজার বর্গফুট এলাকা জুড়ে অবস্থিত ।
৩. বাংলাদেশ থেকে সফটওয়্যার ও তথ্যপ্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট পণ্য বিদেশে বাজারজাতকরণের জন্য বাংলাদেশ সরকার 'আইসিটি বিজনেস প্রমোশন সেন্টার স্থাপন করেছে ।
৪. তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য গাজীপুরের কালিয়াকৈরে হাইটেক পার্ক স্থাপন করা হয় । পার্কটি ২৬৫ একর জমির ওপর অবস্থিত । এতে প্রযুক্তির বিভিন্ন স্থাপনা রয়েছে ।
৫. দেশের প্রতিটি স্কুলে সরকারি উদ্যোগে কম্পিউটার প্রদান করা হয়েছে এবং মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে কম্পিউটার

শিক্ষা কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছে। তাছাড়া কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য আইসিটি ইন্টারশীপ' কর্মসূচি চালু করা হয়েছে।

জাতীয় জীবনে তথ্যপ্রযুক্তির গুরুত্ব : এক সময়কার দরিদ্র বাংলাদেশ বর্তমানে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সালের মধ্যে এই দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত করার ঘোষণা দিয়েছেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকারের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করতে হলে তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার একান্ত প্রয়োজন। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া এত দ্রুত জাতীয় উন্নয়নে বিপ্লব ঘটানোর সম্ভব হবে না। সুতরাং অর্থনীতি শিক্ষা, চিকিৎসাসহ সকল ক্ষেত্রেই দ্রুতগতিতে তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার ঘটাতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব দিতে হবে :

আর্থিক উন্নতি : আমাদের দেশ ও জাতির উন্নয়নের জন্য সর্বাত্মক আর্থিক উন্নতির প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। কেননা অর্থনীতিই পারে দেশের উন্নতির চাকা ঘোরাতে। আর্থিক উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখছে তথ্যপ্রযুক্তি। এশিয়া মহাদেশের দেশগুলোর মধ্যে যে দেশগুলোতে তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের জোয়ার বইছে তার মধ্যে ভারত শীর্ষে। এদিক থেকে বাংলাদেশ একটু পিছিয়ে থাকলেও বাংলাদেশের আর্থিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখছে তথ্যপ্রযুক্তি। আমাদের দেশে এখন কম্পিউটার সফটওয়্যার তৈরি হচ্ছে। আমাদের দেশ থেকে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকার সফটওয়্যার বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে। আগামী দিনে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি প্রয়োগে : বিশ্বব্যাপী প্রতিনিয়তই চলছে টিকে থাকার প্রতিযোগিতা। বিশ্ব দরবারে টিকে থাকার জন্য আমাদের প্রয়োজন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক কোর্স চালু করা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক শিক্ষা কোর্স চালু করতে হবে। বিশ্বব্যাপী চাহিদার কথা বিবেচনা করে তথ্যপ্রযুক্তির নবায়ন করতে হবে। তাছাড়া সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের তথ্যপ্রযুক্তিতে জ্ঞানার্জনের সুযোগ দিতে হবে এবং প্রতিটি স্কুল-কলেজে কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে বেকারত্বের অবসান : আমাদের দেশে যুব-সমাজে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হলো বেকারত্ব। বাংলাদেশে দিন দিন বেকার সমস্যা বেড়েই চলেছে। কিন্তু আমাদের দেশের বেকারদের জন্য সুখবর হচ্ছে বর্তমান যুগে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বেকারদের জন্য কর্মসংস্থানের নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, ইন্টারনেট, ফেসবুক ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রায় দশ হাজার প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। আর এ সকল প্রতিষ্ঠান প্রায় লক্ষাধিক বেকার যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে।

জনশক্তি উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তি : একটি দেশের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন দক্ষ জনশক্তি। আর সাধারণ জনগণকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করতে প্রয়োজন তথ্যপ্রযুক্তির সমৃদ্ধ জ্ঞান। তথ্যপ্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ হলেই আমাদের জনশক্তি দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত হওয়া সম্ভব। আর জনশক্তি দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত হলেই দেশের আর্থনীতিক উন্নতি সম্ভব। বর্তমান বিশ্বে যে জাতি তথ্যপ্রযুক্তিতে যত বেশি সমৃদ্ধ সে জাতি তত বেশি উন্নত। তথ্যপ্রযুক্তিহীন কোনো জাতিই উন্নতির শিখরে পৌছাতে পারে না। তাই বাংলাদেশের সরকারের উচিত দেশ ও জাতির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলে।

ব্যবসায়-বাণিজ্যে তথ্যপ্রযুক্তি : বর্তমান যুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি এক নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে। এখন ঘরে বসেই ই-মেইল, ই-কমার্স, ই-নেট ইত্যাদি প্রযুক্তির মাধ্যমে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই ব্যবসা-বাণিজ্যের খোঁজ-খবর রাখতে পারছে। আর এটা সম্ভব হচ্ছে শুধু তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে। ঘরে বসে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েই মুহূর্তের মধ্যে দেশ-বিদেশে উৎপাদিত পণ্য এবং বাজার দর সম্পর্কে অবগত হতে পারছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে

পণ্যের অর্ডার দেওয়া-নেওয়া হচ্ছে। তথ্যপ্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ যদি এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারে, তাহলে আমরা আর্থনীতিক দিক থেকে উন্নতির শিখরে পৌঁছতে পারব।

উপসংহার : বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিকদের সবচেয়ে বিপ্লবকর আবিষ্কার তথ্যপ্রযুক্তি। মানুষ ঘরে বসে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় দূরের মানুষের সাথে যোগাযোগ থেকে শুরু করে কেনা-বেচার কাজও করছে। তথ্যপ্রযুক্তি-বিদ্যা কাজে লাগিয়ে মানুষ বেকারত্ব দূর করতে পারছে। অনেকে ঘরে বসেই উপার্জন করতে পারছে। প্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া এক মুহূর্তও চলা সম্ভব নয়। তাই বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশকেও প্রযুক্তিনির্ভর হতে হবে এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে আর্থনীতিক উন্নতিতে অবদান রাখতে হবে। বাংলাদেশের জনগণকে প্রযুক্তিসমৃদ্ধ দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করতে হবে।

(ঘ) তারুণ্যের চোখে আগামীর বাংলাদেশ

উত্তরঃ

তারুণ্যের চোখে আগামীর বাংলাদেশ

ভূমিকা

"তারুণ্য মানেই আলো, তারুণ্য মানেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক অবিনাশী শক্তি।" একটি দেশের সবচেয়ে বড় শক্তি হলো তার তরুণ সমাজ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যমতে, দেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ২৮ শতাংশই তরুণ। এই বিশাল 'জেন-জি' (Gen-Z) ও যুবসমাজই নির্ধারণ করবে আগামীর বাংলাদেশের গতিপথ। ইতিহাস সাক্ষী, ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ২০২৪ সালের ঐতিহাসিক ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান—সবখানেই অগ্রভাগে ছিল তারুণ্য। তাই তরুণদের স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা এবং বৈষম্যহীন নতুন রাষ্ট্র গড়ার ভাবনাই হলো আগামীর বাংলাদেশের মূল ভিত্তি।

বৈষম্যহীন ও সাম্যের বাংলাদেশ

তারুণ্য প্রজন্মের চোখে আগামীর বাংলাদেশ হবে সম্পূর্ণ বৈষম্যহীন এবং সাম্যের প্রতীক। যেখানে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ বা রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে কোনো নাগরিককে পিছিয়ে পড়তে হবে না। সংবিধানে বর্ণিত অধিকারের শতভাগ বাস্তবায়ন দেখতে চায় তরুণরা। সংখ্যালঘু কিংবা নৃগোষ্ঠী—সবাই যেন সমান নাগরিক অধিকার ও নিরাপত্তা ভোগ করতে পারে, তরুণ সমাজ এমন একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক অসাম্প্রদায়িক সমাজ বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখে।

গণতন্ত্র, সুশাসন ও দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র

আগামীর বাংলাদেশ হবে সুশাসিত এবং স্বৈরাচারমুক্ত একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। তরুণরা দেখতে চায় এমন এক শাসনব্যবস্থা যেখানে জবাবদিহিতা থাকবে এবং প্রতিটি নাগরিকের অবাধ ভোটাধিকার নিশ্চিত হবে। প্রশাসন হবে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত। মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে এবং কোনো প্রকার স্বজনপ্রীতি বা অন্যায়ের স্থান সেখানে থাকবে না।

আধুনিক ও কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা

তারুণ্যের চোখে আগামী দিনের শিক্ষাব্যবস্থা হবে বৈশ্বিক চাহিদার সাথে সংগতিপূর্ণ ও যুগোপযোগী। শুধু সনাতন সার্টিফিকেট-সর্বস্ব পড়ালেখা নয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো হয়ে উঠবে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনের কেন্দ্র। তরুণরা চায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), ডেটা সায়েন্স, ব্লকচেইন এবং আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ফ্লিপল্যান্সিং ও কর্মমুখী শিক্ষার বিস্তার। যেখানে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা শেষ করে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে এবং উদ্যোক্তা হওয়ার সমান সুযোগ পাবে।

অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ও নতুন উদ্যোক্তা

তারুণ্য প্রজন্ম শুধু চাকরিপ্রার্থী নয়, বরং চাকরিদাতা বা উদ্যোক্তা (Entrepreneur) হওয়ার স্বপ্ন দেখে। আগামীর বাংলাদেশে কুটির শিল্প থেকে শুরু করে আধুনিক আইটি সেক্টর ও স্মার্ট কৃষির (Smart Farming) বিকাশ ঘটবে। তরুণদের মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশ বিশ্বের দরবারে একটি শক্তিশালী ও আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে।

নারীর ক্ষমতায়ন ও নিরাপদ পরিবেশ

একটি সমৃদ্ধ দেশ গঠনে অর্ধেকেরও বেশি নারীশক্তির অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। তরুণদের ভাবনায় আগামীর বাংলাদেশ হবে নারীদের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ ও বৈষম্যহীন। কর্মক্ষেত্রে, রাজনীতিতে এবং নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে

নারীদের স্বতঃস্ফূর্ত ও সম্মানজনক অবস্থান নিশ্চিত করা হবে। নারীর নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষায় সামাজিক মনস্তত্ত্বের আমূল পরিবর্তন চায় আজকের যুবসমাজ।

পরিবেশবান্ধব ও সবুজ বাংলাদেশ (Green Bangladesh)

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় তরুণরা অত্যন্ত সচেতন। তাদের চোখে আগামী দিনের বাংলাদেশ হবে একটি পরিবেশবান্ধব ও 'গ্রিন বাংলাদেশ'। যেখানে নদীগুলো থাকবে দখল ও দূষণমুক্ত, বাতাস হবে নির্মল এবং বনায়ন বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে। নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে একটি সুস্থ ও সুন্দর বাসস্থান গড়ে তোলাই তরুণদের অন্যতম লক্ষ্য।

সুস্থ মনন ও মাদকমুক্ত সমাজ

আগামীর তরুণ সমাজ হবে হতাশা ও বিষাদমুক্ত। যুবসমাজকে মাদক, অপরাধ ও অন্ধকার থেকে দূরে রাখতে খেলাধুলা, সাহিত্য, সংগীত ও সংস্কৃতির নিয়মিত চর্চা বাড়ানো হবে। প্রতিটি পাড়া-মহল্লায় খেলার মাঠ এবং পাঠাগার থাকবে, যা তরুণদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করবে এবং একটি সুস্থ ও মানবিক প্রজন্ম গড়ে তুলবে।

উপসংহার

তারুণ্যের চোখে আগামীর বাংলাদেশ হলো একটি বৈষম্যহীন, গণতান্ত্রিক, আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর এবং মানবিক রাষ্ট্র। তরুণরা শুধু স্বপ্ন দেখতে জানে না, স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতেও জানে। ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের পর রাস্তায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে পরিচ্ছন্নতা অভিযান এবং বন্যাদুর্গতদের পাশে যেভাবে তরুণরা দাঁড়িয়েছে, তা প্রমাণ করে দেশের দায়িত্ব নিতে তারা প্রস্তুত। সরকার এবং সমাজের দায়িত্ব হলো তরুণদের এই মেধা, দেশপ্রেম ও শক্তিকে সঠিক মূল্যায়ন করা এবং তাদের জন্য উপযুক্ত সুযোগ তৈরি করে দেওয়া। তবেই তারুণ্যের হাত ধরে বাংলাদেশ একদিন বিশ্বমঞ্চে অনন্য উচ্চতায় আসীন হবে।

(ঙ) যুবসমাজের মূল্যবোধের অবক্ষয় ও প্রতিকার

উত্তরঃ

যুবসমাজের মূল্যবোধের অবক্ষয় ও প্রতিকার

ভূমিকা

একটি দেশের অফুরন্ত প্রাণশক্তি ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের মূল চালিকাশক্তি হলো তার যুবসমাজ। যৌবনের অমিত তেজ, ন্যায়পরায়ণতা এবং নৈতিকতার ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে একটি সুস্থ ও সুন্দর সমাজ। কিন্তু বর্তমান সময়ে বিশ্বায়নের নেতিবাচক প্রভাব, আকাশ সংস্কৃতি এবং নৈতিক শিক্ষার অভাবে তরুণ প্রজন্মের বড় একটি অংশ ভুল পথে ধাবিত হচ্ছে। যুবসমাজের এই চারিত্রিক ও সামাজিক অধঃপতনই হলো মূল্যবোধের অবক্ষয়। এই অবক্ষয় ব্যক্তিস্বার্থ থেকে শুরু করে সমগ্র জাতীয় অগ্রগতিকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

মূল্যবোধ কী?

মূল্যবোধ হলো মানুষের ভেতরের সেই মানসিক বোধ বা চালিকাশক্তি, যা ভালো-মন্দ, সত্য-অসত্য এবং উচিত-অনুচিতের পার্থক্য নির্ধারণ করে। সততা, পরোপকার, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা, ছোটদের প্রতি স্নেহ, দেশপ্রেম ও নিয়মানুবর্তিতা মূল্যবোধের অন্যতম উপাদান। এটি কোনো লিখিত আইন নয়, বরং মানুষের অন্তরের এক প্রকার স্বতঃস্ফূর্ত নৈতিক শাসন।

যুবসমাজের অবক্ষয়ের প্রধান কারণসমূহ

বর্তমান যুবসমাজের পথভ্রষ্ট হওয়ার পেছনে কোনো একক কারণ দায়ী নয়; বরং বহুমুখী সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা এর পেছনে কাজ করছে:

- **পারিবারিক শিক্ষার অভাব:** পরিবারই শিশুর প্রথম নৈতিক শিক্ষাকেন্দ্র। আধুনিক একক পরিবারে বাবা-মা দুজনেই ব্যস্ত থাকায় সন্তানদের পর্যাপ্ত সময় ও সঠিক সুকুমার বৃত্তি শেখাতে পারছেন না।
- **মাদকাসক্তি:** অবক্ষয়ের অন্যতম প্রধান কারণ হলো মাদকের নীল দংশন। কৌতূহল বা হতাশা থেকে শুরু করে তরুণরা মাদকে জড়িয়ে পড়ছে এবং অর্থ জোগাতে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হচ্ছে।
- **অপসংস্কৃতি ও প্রযুক্তির অপব্যবহার:** তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ ছোঁয়া ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের উদ্দেশ্যহীন ব্যবহার তরুণদের বাস্তব জীবন থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে। আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবে পশ্চিমা ও ভিনদেশী সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ নৈতিক মূল্যবোধ বিনষ্ট করছে।
- **কর্মসংস্থানের অভাব ও হতাশা:** উচ্চশিক্ষা শেষ করার পরও দেশে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের অভাব থাকায় যুবসমাজের একটি বড় অংশ চরম হতাশায় ভুগছে। এই বেকারত্ব ও হতাশা তাদের অপরাধের দিকে ঠেলে

দেয়.

- **সুস্থ বিনোদনের অভাব:** মাঠের অভাব, খেলাধুলার সুযোগ না থাকা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড কমে যাওয়ায় যুবসমাজ কেবল চার দেয়ালের মাঝে ও ডিজিটাল স্ক্রিনে আসক্ত হয়ে পড়ছে.
- **নৈতিকতাহীন শিক্ষাব্যবস্থা:** আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা অনেকটা জিপিএ বা ফল-সর্বস্ব হয়ে পড়েছে. মানবিক ও চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনের চেয়ে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার মানসিকতা তৈরিতে জোর বেশি দেওয়া হচ্ছে.

সমাজ ও জাতীয় জীবনে অবক্ষয়ের প্রভাব

যুবসমাজের এই চারিত্রিক বিচ্যুতি সমাজ জীবনে মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনছে. সমাজে খুন, ছিনতাই, ইভটিজিং, ধর্ষণ ও সামাজিক অস্থিরতা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে. প্রবীণদের প্রতি সম্মান হারিয়ে যাচ্ছে এবং পারিবারিক বন্ধনগুলো শিথিল হয়ে পড়ছে. যে তরুণদের দেশের অর্থনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রযাত্রায় নেতৃত্ব দেওয়ার কথা ছিল, তারা জাতীয় বোঝা বা ক্ষতিকর উপাদানে পরিণত হচ্ছে.

অবক্ষয় রোধে কার্যকর প্রতিকারসমূহ

তারুণ্যের এই ক্ষয়িষ্ণু স্রোত রুখে দিতে সমাজ ও রাষ্ট্রকে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে:

- **পারিবারিক সচেতনতা বৃদ্ধি:** বাবা-মাকে সন্তানের বন্ধু হতে হবে. তাদের শৈশব থেকেই ধর্মীয় অনুশাসন, সততা ও মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা দিতে হবে.
- **নৈতিক শিক্ষার বিস্তার:** প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় কেবল পুঁথিগত বিদ্যা নয়, বরং নৈতিকতা, মূল্যবোধ এবং জীবনমুখী শিক্ষার ওপর সমান গুরুত্বারোপ করতে হবে.
- **মাদকের বিস্তার রোধ:** রাষ্ট্রকে মাদকের চোরাচালান ও সহজলভ্যতা কঠোর হস্তে দমন করতে হবে. মাদকাসক্ত যুবকদের পুনর্বাসনের মাধ্যমে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে হবে।
- **কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও উদ্যোক্তা তৈরি:** বেকারত্ব দূরীকরণে কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে এবং যুবকদের স্বাবলম্বী করতে সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে হবে.
- **সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা:** এলাকাভিত্তিক খেলার মাঠ, পাঠাগার এবং সুস্থ বিনোদন ও সাংস্কৃতিক চর্চার ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে, যাতে তরুণরা তাদের অলস সময় সৃজনশীল কাজে ব্যয় করতে পারে.
- **আইনের কঠোর প্রয়োগ:** সামাজিক অপরাধ, কিশোর গ্যাং কালচার ও প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে সাইবার আইন ও প্রচলিত আইনের নিরপেক্ষ ও কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে.

উপসংহার

যুবসমাজ একটি দেশের মেরুদণ্ড ও অমিত সম্ভাবনার প্রতীক. তাদের এই নৈতিক স্বলন কোনোভাবেই একটি জাতির জন্য কাম্য নয়. যুবসমাজকে অবক্ষয়ের এই অন্ধকার গহ্বর থেকে টেনে তুলতে পরিবার, সমাজ, শিক্ষক এবং রাষ্ট্র—সকলকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে. তরুণদের সুপ্ত প্রতিভাকে ইতিবাচক ও দেশোন্মুখবোধক কাজে নিয়োজিত করার মাধ্যমেই কেবল একটি সুন্দর, শান্তিপূর্ণ ও উন্নত সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব.



কোন প্রশ্নের বানান বা উত্তর ভুল থাকলে রিপোর্ট করুন | *Thank you for reading!*

আরও দেখুন: sattacademy.com

⚠ Sattacademy -এর সকল কন্টেন্ট কপিরাইট আইন দ্বারা সুরক্ষিত। অনুমতি ব্যতিরেকে যেকোনো মাধ্যমে এর ব্যবহার আইনের লঙ্ঘন ও দণ্ডনীয় অপরাধ

🌐 sattacademy.com | 📞 +880 1306 446390